হুমায়ুন আজাদ

কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ

কবি নামে উপন্যাস লেখা হয়েছে বাঙলা ভাষায়, কিন্তু প্রকৃত কবি নিয়ে কোনো উপন্যাস লেখা হয় নি; ওগুলো লেখা কবিয়ালদের নিয়ে। হুমায়ুন আজাদের কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ-এর নায়ক কবি, প্রকৃত কবি, আধুনিক কবি, যার নাম হাসান রশিদ। একজন আধুনিক কবির জীবন কেমন ? কোন স্বপ্ন কল্পনা আবেগ আনন্দ অসুখ তাকে বাঁচিয়ে রাখে, আর স্বাদ দেয় অন্ধকার মৃত্যুর? জীবনের সাথে সে সম্পর্কিত এবং অসম্পর্কিত কতোখানি? জীবন কি তার কাছে বহুব্যবহৃত নোংরা পোশাক, যা সে অনায়াসে দান ক'রে দিতে পারে ভৃত্যদের? জীবনে কি সবচেয়ে ভালো একেবারে না জন্মানো, এবং দ্বিতীয় ভালো যৌবনেই মৃত্যুকে বরণ করা? একজন আধুনিক কবি কতোখানি পুরুষ, কতোখানি অপুরুষ? কতোখানি দণ্ডিত সে? কবি হাসান রশিদ কৈশোর পেরিয়ে ধীরেধীরে কবিতার দিকে এগিয়ে গেছে, শিল্পকলার জন্য অস্বীকার করেছে ঘৃণ্য অশীল জীবনকে, আবার গভীর বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধ'রে রাখতে চেয়েছে নষ্টভ্রষ্ট পঙ্কিল দূষিত জীবনের সুন্দর মুখ। হাসান রশিদ ইলশে মাছ লাউডগা পেঁয়াজ ধনেপাতার জীবন বেছে না নিয়ে নিয়েছে শিল্পকলার অসমম্ভব জীবন, যেখানে আছে শুধু সৌন্দর্য, নিরন্তর আলোড়ন, বিষের মতো অমৃত; শিল্পকলার প্রতিদ্বন্দ্বী হিংস্র জীবন হাসান রশিদের ওপর চরিতার্থ করেছে তার চরম প্রতিহিংসা, তাকে ক'রে তুলেছে অপুরুষ। হাসান রশিদ অবশেষে মুখোমুখি হয়েছে এমন এক জীবনের, যা মৃত্যুর থেকেও নির্মম, ট্র্যাজেডির থেকেও হাহাকারপূর্ণ। আধুনিক কবির অন্তর্লোক ও বস্তুজগতের প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়েছেন হুমায়ুন আজাদ, যিনি নিজে কবি; এবং চিত্রিত করেছেন এক ভয়াবহ জগত। এক অতুলনীয় যন্ত্রণার কবিতা ও উপন্যাস কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ।

প্রচ্ছদ সমর মজুমদার
ISBN 984 401 507 5

হুমায়ুন আজাদ

কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ

আগামী প্রকাশনী

চতুর্থ মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ নভেম্বর ২০০৮
প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ চৈত্র ১৪০৮ মার্চ ২০০২
তৃতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১১ আগস্ট ২০০৪

স্বত্ব হুমায়ুন আজাদ

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১
প্রচ্ছদ সমর মজুমদার
মুদ্রণে স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য : দুইশত টাকা

ISBN 984 70006 1208 3

Kabi Athaba Dandita Apurush : The Poet or the Condemned Eunuch ::
A Nobel by Humayun Azad.
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka 1100, Bangladesh.
e.mail : E-mail : info @ agameeprakashani-bd.com.
First Published : February 1999
Fourth Printing : November 2008

Price : Tk 200.00 only

উৎসর্গ

বদলেয়ার
দণ্ডিত মহাকবি

আমি সম্ভবত দণ্ডিত মানুষ, আমি কবি।

ভোরের কাজগুলোকে অসহ্য একঘেয়ে বিরক্তিকর লাগে হাসানের; কেনো যে ভোর হয়, গোলগাল লাল সূর্য ওঠে পুব দিকে, এর থেকে চমৎকার হতো এক অন্ধকারে এক দীর্ঘ আলোতে সব কিছু কেটে গেলে;– দিনের পর দিন ঘুম থেকে ওঠো, শক্ত বস্তুটাকে চেপে একটু দ্রুত বাথরুমে যাও, ঝরঝর ঝরঝর করো, ফিরে আসো, তলপেটটাকে মুক্ত করার জন্যে লাল ঝলমলে চা খাও এক কাপ, দু-কাপ হ'লেই জমজমাট হয়, সঙ্গে পর পর দু-তিনটি সিগারেট– এ-দুটো কাজই শুধু বিরক্তি থেকে মুক্তি দেয় তাকে, তারপর গিয়ে প্যানের ওপর নতুন খালের কিনারের সেই মাথায় লাল গামছা চাষীটার মতো বসো, গলগল করো চেপে চেপে মুক্ত হও, বুনো ঘাস আগাছার মতো গজিয়ে ওঠা দাড়ি কাটো, ফ্লাশ টানো, পানি না বেরোলে আবার টানো, বদনা লাগাও, ব্রাশ করো, ওপর থেকে নিচে নিচ থেকে ওপরে, জিভ শানাও খশখশ ক'রে, ভেতর থেকে ইতরের পালের মতো ছুটে আসা বমিটাকে রোধ করো, জিভটার বর্ণ গন্ধ স্বাদ বদলে যাচ্ছে দিন দিন, এক বালতি পানিতে গোশলটা তাড়াতাড়ি সেরে নাও, অত্যন্ত জঘন্য এই সাত শনি রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্কুরে ভরা জীবন নামের ঢলঢলে কাজের মেয়েটি, বিশেষ ক'রে তার ভোরবেলাটি। সবচেয়ে বিশ্রী লাগে দাড়ি কামাতে, গালটা টনটন করে, কোনো কোনো দিন ব্লেডটাকে মনে হয় জংধরা ছুরি, অশীল অশ্লীল আগাছার মতো লোমগুলো রেখে দিতেই ইচ্ছে হয়, কিন্তু লোমগুলোকে ঘেন্না লাগে ব'লে কামানো ছাড়া উপায় নেই। প্যানের ওপর বসলে ঝলমল ক'রে মনে পড়ে ইস্কুলে যাওয়ার পথের ধারের নতুন খালটিকে, সেই চাষীটাকে মনে পড়ে, লুঙ্গি উঠিয়ে যে 'ঙ্গ'র মতো অদ্ভুতভাবে ব'সে ছিলো চোখ বন্ধ ক'রে, খুব কষ্ট খুব সুখ হচ্ছিলো মনে হয় লোকটির, নিজেকে ওই চাষী মনে হয়, হাসি পায় হাসানের, ভালো লাগে। বেশ হতো চাষী হ'লে; আহা, খালের পাড়ে ব'সে প্রসন্ন পর্যাপ্ত প্রকৃতি। প্যানের ওপর ব'সে সে দাড়ি কামানোর কাজটিও করে, এক সঙ্গে দু-কাজ– এ-অভ্যাসের জন্যে সে ধন্যবাদ দেয় নিজেকে, এটা সে কখন যে শুরু করেছিলো আজ আর মনে নেই, এটাকে তার একটা উৎকৃষ্ট পদ্যের পংক্তি মনে হয়; খুব ভালো লাগে তার যে আয়নাটায়না তার লাগে না, চোখ বুজেই সে নিজের মুখটি দেখতে পায়, চোখের ভেতরেই তার একটি আয়না আছে, আর আঙুলগুলোই কাজ করে চোখের, দশটি চোখ দু-হাতে, তার কোনো ক্রিমট্রিম মাখতে হয় না, ধবধবে ফেনা তুলতে হয় না, যদিও শেভিং ক্রিমের দুটি বিজ্ঞাপন সে নিজ হাতে লিখেছে, পানি লাগিয়েই সে রেজর চালাতে পারে– মসৃণ বিরক্তিকর।

আজ প্যানের ওপর ব'সে গালটাকে ভিজিয়ে রেজর টান দিতেই ব্লেডের একটা দুরন্ত কোনা গালের ডান পাশে গেঁথে যায়, একটু কেঁপে ওঠে হাসান, এবং গালের পাশ

দিয়ে গড়িয়ে পড়া সরু লাল রক্তধারার মতোই গড়িয়ে গড়িয়ে তার মনে আসে ভাবনাটি– আমি সম্ভবত দণ্ডিত মানুষ, আমি কবি।

গাল টিপতে টিপতে একবার সে মনে মনে হেসে ওঠে হো হো করে; কোনো শব্দ হয় না, তবে তার মনে হয় সে হো হো ক'রে হাসছে; এবং তার সাথে হাসছে শহরের সবাই। খালের পাড়ের সেই মাথায় লাল গামছা চাষীটাও।

বেশ লাগছে হাসানের, আজ ভোরবেলা গালে লাল সরু রক্তধারার মতো চুইয়ে চুইয়ে একটির পর একটি ভাবনা আসছে, ভাবনাগুলো তাকে সঙ্গ দিচ্ছে। ভাবনার সঙ্গও রক্তমাংসময়।

আমি মানুষ? তাহলে আমি এমন কেনো? আমি কেমন?

ওই ঠেলাগাড়িঅলার মতো নই কেনো? আমি কি নই? করিমউদ্দিন ব্যাপারীর মতো নই কেনো? আমি কি নই? নই কেনো ভেড়ামারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাগল ছাগল ভিসিটার মতো? আমি কি নই? গাভী গাভী পাটখেতের চাকর চাকর গাধা গাধা মাননীয়টার মতো নই কেনো? আমি কি নই? নিচের তলার ওই ভদ্র আর অভদ্রলোকটির মতো নই কেনো, যে আরো নিচের তলার কাজের মেয়েটিকে সিঁড়িতে দেখলেই একটা সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়ায়, হাসে, পকেট থেকে পাঁচ টাকা বের ক'রে মেয়েটার ব্লাউজের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে হাতটা কিছুক্ষণ চেপে রাখে, যার লিকলিকে বউটি বিয়োয় বছর বছর?

আবার হেসে ওঠে হাসান নিঃশব্দে হো হো ক'রে।

তাহলে আমি মানুষ নই? আমার কি মনে হয় আমি মানুষ নই? স্বাভাবিক মানুষ নই আমি? নিজেকে জিজ্ঞেস করে হাসান।

তুমি কি মানুষ নও? তুমি কি স্বাভাবিক মানুষ নও?

তুমি কি সকালে উঠে ঝরঝর করার জন্যে বাথরুমে ঢোকো না? প্যানের ওপর বসো না সেই চাষীটার মতো, শুধু তোমার অভাব তোমার কোনো নতুন কাটা খাল নেই? পেয়ালা ভ'রে চা খাও না? দু-তিনটি সিগারেট খাও না? একটু কাশো না? ব্রাশ করো না? শেভ করো না? চুল আঁচড়াও না? ভাত খাও না? কাম বোধ করো না? ওই কাজের মেয়েটার দিকে তাকাও না? ধনেপাতার গন্ধে তুমি এলোমেলো হও না? বিলে গিয়ে আজো কি জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টিতে তোমার বোয়াল মাছ ধরতে ইচ্ছে করে না? লিফটে আটকে যাওয়ার ভয়ে তোমার কি দম বন্ধ হয়ে আসে না? ইচ্ছে করে না লাফিয়ে পড়তে? মুহূর্তের জন্যে কি পৃথিবীটাকে তোমার একটা বন্ধ ঘর মনে হয় না, এবং আধমিনিট ধ'রে তুমি কি ভোগো না ক্লস্ট্রফোবিয়ায়? বেবিঅলার কথায় মাঝেমাঝে রেগে ওঠো না তুমি? তুমি তো সবই করো।

কিন্তু তুমি কবি?

ভীষণ হাসি পাচ্ছে তার নিজেকে কবি ভেবে, খুব বিব্রত বোধ করছে, দাড়িঅলা জোব্বাপরা একটি বুড়ো হয়তো মিটিমিটি কিটিকিটি হাসছে সব দেয়ালে; হাসান তাড়াতাড়ি ভাবনাটি খুব গভীর গর্তে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে, যাতে কেউ দেখতে না পায়, শুনতে না পায়, গন্ধও না পায়।

নিজেকে কবি ভাবা খুব হাস্যকর, না? হাসান জিজ্ঞেস করে নিজেকে।

হাস্যকর, খুবই হাস্যকর, এবং খুবই ভয়ঙ্কর। নিজেকে সে বোঝায়।

অন্য সব কিছু স্বাভাবিক– ঠিকাদার হও, কালোবাজারি, আমলা, বেশ্যার দালাল, জোব্বা জজ মেজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার হাবিলদার দফাদার চাটনদার হও, ইস্কুল মাস্টার হও, দারোগা হও, ইভেন্ট গার্মেন্টস ব্যাংক এনজিও দালাল হও; কিন্তু না, কবি না। সমাজ (চমৎকার নর্দমা, মলের স্তূপ, সতী বেশ্যা, অসতী সাধ্বী) কবি চায় না, কবির কোনো দরকার নেই সমাজে।

হাসান সমাজের চুনকামকরা মুখে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিতে চায়; তারপর থুতু আটকে রাখে, এমন নর্দমার ওপর সে থুতু ফেলতে পারবে না।

কবি? কী ক'রে কবি হ'তে পারি আমি? কবি কাকে বলে? গালে পাঁচটি আঙুল বোলাতে বোলাতে হাসানের মনে হয়।

বেশ কয়েকবার ডান হাতের আঙুলগুলো নরমভাবে সে বোলায় তার গালে, একটু একটু রক্ত এখনো বেরিয়ে আসছে বাল্যস্মৃতির মতো, বেরোক। রক্ত, তুমিই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, বেরোও; তুমি শরীরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ছন্দ, নাচো; তুমি হাহাকার, ধ্বনিত হও।

কারো পক্ষেই কবি হওয়া সম্ভব নয়, মানুষের পক্ষে কবি হওয়া সম্ভব নয়। যার লিঙ্গ অণ্ড পাকস্থলি তলপেট আছে, তার পক্ষে কবি হওয়া অসম্ভব। রেজর চালাতে চালাতে আবার মনে হয় হাসানের।

কবি হ'তে পারি আমি, শুধু যদি আমি মানুষ না হই।

হাসানের আবার মনে হয়, মানুষের পক্ষে কবি হওয়া অসম্ভব।

কটি পদ্য লিখেছি? কটি কবিতা? একশো আশিটি হবে?

ঠিক মনে পড়ছে না তার, আবার মনের ভেতরে হো হো ক'রে হাসে হাসান। কোনো শব্দ হয় না, কিন্তু তার মনে হয় সে খুব উচ্চকণ্ঠে হাসছে; তার হাসি শুনতে পাচ্ছে সবাই।

কবি হ'তে হ'লে এই গরিব দেশে সাড়ে পাঁচ হাজার কবিতা লিখতে হয় না? ঈদে আর কোরবানিতে কবিতা লিখতে হয় না?

ওর খালাশ হওয়ার দিনে তার ইন্তেকালের দিনে কবিতা লিখতে হয় না?

এই মাসের দশ তারিখে সেই মাসের চোদ্দো তারিখে কবিতা লিখতে হয় না?

হা হা ক'রে হাসে হাসান।

একাশিটা কাইব্য থাকতে হয় না?

হাসান নিজেকে বলে, তোমার তা কখনো হবে না।

এখন তোমার চারটি, সারাজীবনে হয়তো দশটি, যদি বেঁচে থাকো। তুমি কি বেঁচে থাকবে? বেঁচে থাকা কি খুবই দরকার?

প্যানের কাজ সেরে হাসান সিংকের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাশে পেস্ট লাগায়, সবুজ রঙের পেস্টটাকে তার ঘেন্না লাগে, আসলেই ঘেন্না লাগে? না, হয়তো তার ভালোই

লাগছে পেস্টটাকে; বেশ টিপতে হয় টিউবটাকে, নইলে বেরোয় না। তার মনে হয় সে টিউবটাকে ভাঙছে; সে মনে মনে বলে, ভাঙতে হয় ভাঙতে হয়, কবিতার জন্যে শুধু অনবরত ভাঙতে হয়।

আমি কি নিজেকে যথেষ্ট ভেঙেছি, নইলে কবি হবো কীভাবে?

ব্রাশ করতে করতে নিজের নামটা মনে পড়ে হাসানের।

মোহাম্মদ আবুল হোসেন তালুকদার। নিঃশব্দে হো হো ক'রে হাসে হাসান, বেশ নাম রেখেছিলেন শ্রদ্ধেয় আব্বাজান, দারোগার ছেলের জন্যে ফাসক্যালাস নাম। এই নামটাই আছে নোংরা সার্টিফিকেটে, যদিও সার্টিফিকেটগুলো কোথায় আছে তার মনে নেই; মোহাম্মদ আবুল হোসেন তালুকদার, পিতা মোহাম্মদ রশিদ আলি তালুকদার। দারোগার পোলার নাম হিশেবে অনবদ্য। সে যদি দারোগা হতো, আর তার নাম যদি হতো মোহাম্মদ রশিদ আলি তালুকদার, তাহলে সে নিজের পুত্রের এই নামই রাখতো।

কিন্তু এই নামে কি কেউ কবি হ'তে পারে? কবি মোহাম্মদ আবুল হোসেন তালুকদার? আবার হেসে ওঠে হাসান।

নিজের নামটিকেই সে প্রথম ভেঙেছে, প্রথম ভাঙতে হয়েছে; এবং দিন দিন নিজেকে ভাঙছে, আরো যে কতো ভাঙতে হবে– আর কিছু নয়, শুধু কবি হওয়ার জন্যে, দণ্ডিত মানুষ হওয়ার জন্যে ভেঙে ভেঙে চলা। নিজেকে ভাঙো, শব্দ ভাঙো, বাক্য ভাঙো, বাঙলা ভাষাকে ভাঙো, এবং নিরন্তর ভেঙে ভেঙে চলো। ভেঙে ভেঙে সৃষ্টি করো না, ভাঙলে কী সৃষ্টি করবে তুমি, হাসান রশিদ?

কিন্তু কবি আমি হ'তে পারবো না? হাসানের মনে হয়।

তখন সে এক গাছে ঢাকা পানিঘেরা গর্দভ মফস্বল শহর থেকে পাশ ক'রে ঢাকা এসেছে, খুব ভীরু পায়ে হাঁটছে সিংহ শহরে, শহর বুঝতে পারছে এক আগন্তুক এসেছে। দারোগা মোহাম্মদ রশিদ আলি তালুকদার চেয়েছিলেন তাঁর স্টার পাওয়া মেধাবী ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে, দশ হাতে টাকা বানাবে, দালানের পর দালান তুলবে, কিন্তু সে ঢাকা এসে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলায় ভর্তি হয়ে যায়। প্রথম দু-তিন মাস বাড়ির কাউকেই জানায় নি কোথায় সে ভর্তি হয়েছে। সে জানতো বাঙলা কে পছন্দ করে? দারোগারাও বাঙলা পছন্দ করে না, বেশ্যারাও করে না, রাজনীতিবিদেরাও পছন্দ করে না, বাঙলা হচ্ছে শ্লোগান। বাঙলায় ভর্তি– এটা এক ভাঙাভাঙি; তালুকদার সাহেব বছর তিনেক তার মুখও দেখেন নি, ইঞ্জিনিয়ার ছেলের বাপ হ'তে না পারার দুঃখে পিতা দারোগা সাহেব মালপানি খাওয়া বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, পনেরো বছরের কাজের মেয়েটিকে, যে-মেয়েটির বুকে সে নিজেও একবার হাত দিয়েছিলো যে-মেয়েটির বুক খুবই নরম ছিলো যে-মেয়েটি তার কাছে একবার কবিতা শুনতে চেয়েছিলো, সেই মেয়েটিকে বিবাহেরও উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

হাসানের মনে হয়, আমরা কেউ একা নিজেকে ভাঙতে পারি না, নিজেকে ভাঙার সময় প্রিয়দেরও ভাঙি। সেই ভাঙা চলছে, চলবে চিরকাল, চলবে।

দু-তিনটি পদ্য ছাপা হওয়ার পর আলাউদ্দিন রেহমান, যে আর কবিতা লেখে না, যে এখন অ্যাড ইভেন্টিং গার্মেন্টস, হো হো ক'রে হেসে বলেছিলো, দোস্ত তাইলে তুমি

হইতে যাইতাছো কবি মোহাম্মদ আবুল হোসেন তালুকদার। কবিতা না লেইখ্যা একটা একতারা লইয়া বাজারে গিয়া ওঠ, গলা ছাইরা উত্তর দক্ষিণ বন্দনা কর, এই নামে ভাল কবিয়াল হইতে পারবা, দোস্ত; একটা লালন ফকিরও হইয়া যাইতে পার।

আলাউদ্দিন আরো বলেছিলো, ভালোই হইব দোস্ত, বাঙলায় কবির দরকার নাই, বাঙলায় কবিয়ালই দরকার, এইটা কবিয়ালের দ্যাশ।

খুব লজ্জা পেয়েছিলো হাসান, সত্যিই তো, এই নামে কবি হওয়া যায় না। অতলে ডুবতে হবে অন্ধকারে হাঁটতে হবে যাকে আশ্চর্য সৌরভের জ্যোৎস্নায় অন্ধকারে আলোতে যে দেখবে অন্য আলো অন্ধ অন্ধকার, তার এমন নাম হ'তে পারে না। সেই শুরু হয় ভাঙাচোরা;– প্রথম সে তালুকদার বাদ দিয়ে নামটি লিখে দেখে– মোহাম্মদ আবুল হোসেন। ভালো লাগে না, তখন মোহাম্মদ বাদ দিয়ে লেখে– আবুল হোসেন। না, আবুল আর হোসেন দিয়ে চলবে না; আবুলটিকে বাদ দেয় সে, হোসেনটিকে করে হাসান, এবং হঠাৎ দারোগা মোহাম্মদ রশিদ আলি তালুকদারের নামটি তার মনে পড়ে। হাসান এবং রশিদ পাশাপাশি বসিয়ে দেখে বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে, বেশ চমৎকার শোনাচ্ছে। হাসান রশিদ।

এক মধ্যরাতে একলা সে হয়ে ওঠে হাসান রশিদ। নিজেকে মনে হয় স্বয়ম্ভূ; কেউ তাকে জন্ম দেয় নি, নিজের ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছে সে নিজে।

নিজের নামের ভেতর থেকে আরেকটি নাম সে উঠতে দেখে, যার আছে একটি নিজস্ব সত্তা; নিজের ভেতর থেকে সে দেখে আরেকজনের উত্থান। একটা বিপুল ভূমিকম্প ভাঙাভাঙি প্লাবন সে টের পায় নিজের ভেতরে, ঠাণ্ডা একটা দীর্ঘ কষ্ট তাকে চেপে ধরে, ধীরেধীরে তার মনে হয় তার জন্মান্তর হচ্ছে, সে কবি হ'তে যাচ্ছে, হ'তে যাচ্ছে দণ্ডিত মানুষ। এক সময় মোহাম্মদ আবুল হোসেন তালুকদার নামটি সে প্রাণের সমান ভালোবাসতো, কতোভাবে সে এই নামটি লিখেছে খাতায় আর বইয়ের পাতায়, বাঙলায় ইংরেজিতে, সংক্ষেপে স্বাক্ষর দিতে শিখেছে; কবিতা লিখতে এসে সেই নামটিকেই তার প্রথম বাদ দিতে হলো? এ কি এক নিজেকে বর্জন ক'রে আরেক নিজেকে অর্জন করা; এক নিজেকে ভেঙে আরেক নিজেকে সৃষ্টি করা; এক নিজেকে মৃত্যুর অন্ধকারে সমাহিত ক'রে আরেক নিজেকে লেজারুসের মতো তুলে আনা? কয়েক রাত ঘুমোতে পারে নি হাসান, বারবার ঘুম ভেঙে গেছে, দেখেছে একটা নাম একটা কিশোর হিজল গাছের নিচে একলা দাঁড়িয়ে আছে। আজ কেউ মোহাম্মদ আবুল হোসেন তালুকদার বললে সে সহজে মনেও করতে পারে না এটা কার নাম, এই নামে কে ছিলো একদিন মাটিতে জলে আগুনে জ্বলজ্বল ক'রে।

তাড়াতাড়ি গোশলটা সেরে নেয় হাসান। এ-কাজটি সে দ্রুত করতে পারে।

একটা শাওয়ার আছে মাথার ওপরে, হাসান জানে না সেটি দিয়ে পানি পড়ে কি না; কোনো দিন খুলে দেখে নি, মাথায় শরীরে ঝরঝর ক'রে পানি পড়া সে সহ্য করতে পারে না। শাওয়ারের পানির কোনো আদর নেই, শরীরে ওই পানি প্লাবনের মতো নামে না জোয়ারের মতো নামে না, মগের পানিতে অনেকটা দিঘির আর জোয়ারের স্বাদ

আছে। বালতি থেকে মগ দিয়ে পানি ঢেলে গোশল শেষ ক'রে বেরিয়ে এসে চুল মুছতে মুছতে হাসান দেখে কাজের মেয়েটি যায় নি, বারান্দার গ্রিলের শিক ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে একটি মডেলের মতো।

মেয়েটির তো এর মাঝে চ'লে যাওয়ার কথা। নিচের তলার বিবিসাব এই ছুটা ঝিটিকে ঠিক ক'রে দিয়েছেন; হাসান বিবিসাবকে উঠতে নামতে সব সময়ই মনে মনে ধন্যবাদ জানায়, এবং সে বিব্রত বোধ করে যে বিবিসাব তাকে কবি ব'লে একটু সম্মানও করেন, দেখা হ'লে কথা বলতে চান তার সাথে– কবি হিশেবে এর থেকে বেশি সম্মান সে আর পাবে না ব'লেই তার মনে হয়। মেয়েটি সকালে এসে চা আর খাবারটাবার বানায়, ঘর পরিষ্কার করে, আর সন্ধ্যের পর এসে রেঁধে রেখে যায়। একটা চাবি তার কাছে আছে। হাসানের সাথে মেয়েটির দেখাই হয় না সকালে কিছুক্ষণ ছাড়া; বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে প্রত্যেক দিনই দেখে মেয়েটি দরোজা টেনে চ'লে গেছে, এই দিন দশেক হলো। এর আগে একটা খটখটে বুড়ী ছিলো, পাঁচতলার ছাদে উঠতে তার কষ্ট হতো, তাকে দেখেও বেশ কষ্ট হতো হাসানের; কিন্তু এই মেয়েটাকে কিছুক্ষণ ধ'রে দেখা যায়, যদিও তাকে বেশি দেখতে পায় না হাসান। আজই একটু ভালো ক'রে দেখলো, মেয়েটি বারান্দার গ্রিলের শিক ধ'রে শ্যাম্পুর মডেলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বেশ মেয়েটি।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কী হে, তুমি যে এখনো যাও নি?

মেয়েটি বলে, হাতে কাম নাই আর যাইতেও ইচ্ছা লাগতাছিল না, ভাইজান।

চমৎকার সে মেয়েটির ভাইজান; এতো দিন বিশেষ কোনো কথা হয় নি ব'লে সে এটা জানতে পারে নি। হাসানের ভালো লাগে।

মেয়েটি আরো বলে, ভাইজানের লগে আইজ পর্যন্ত কোন কতাবার্তা হইল না, আইজ মনে হইল ভাইজানের লগে একটু কথা কই।

হাসান বলে, ঠিক আছে বলো কী কথা।

মেয়েটি বলে, ভাইজান যে কি কন, অন্য সব বাসার খালুরা আমার লগে কতা কওনের লিগা কত ছুতা বিচরায়, খালাগো ফাঁকি দিয়া কত কতা কয়, আর আপনে কতা না কইয়া আমারে কথা কইতে কন।

হাসান বলে, কোনো কথা তো আমার নেই।

মেয়েটি খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে, কি যে কন ভাইজান, পুরুষপোলাগো কওনের কতার অভাব আছে নি দুনিয়ায়? কতা না পাইলে খালুরা আমার ঠোডের আর মোখের শোভা লইয়া কত কতা কয়।

হাসান বলে, তোমার কেমন লাগে?

মেয়েটি বলে, শোনতে আমার ভালই লাগে। খালুগো মোখে বড় রস, আমারে খালুরা রসগোল্লার মতন গিলতে থাকে।

হাসান বলে, আমি তো খালু নই।

মেয়েটি বলে, হ, হেই কথা আমি জানি, আপনে বিয়াশাদি করেন নাই, হেই লিগাই ভাইজান কইলাম, বিয়াশাদি না হইলে ত রস আরও বেশি হওনের কতা।

হাসান বলে, তোমার কি টাকাপয়সা লাগবে?

মেয়েটি বলে, হ, ভাইজান, পঞ্চাশটা ট্যাকার খুব দরকার।

বেশ ঝলমলে মেয়েটি, হাসান তাকে একটা একশো টাকার নোট দেয়।

মেয়েটি টাকাটা নিতে নিতে চোখ বড়ো ক'রে বলে, ভাইজান আপনে আমার কাছে যা চাইবেন তাঅই পাইবেন, আপনেরে আমি না করুম না।

হাসান বলে, ঠিক আছে, দরকার হ'লে চাইবো।

মেয়েটি বলে, রাইতে থাকতে কইলেও থাকুম।

মেয়েটি একটি তীব্র হাসি দিয়ে বেরিয়ে যায়, মেয়েটিকে বেশ চমৎকার লাগে হাসানের; কিন্তু কোনো দিন কি কিছু তার চাইতে হবে মেয়েটির কাছে?

এই বাসায় সে উঠেছে বছর দশেক আগে; এবং এই বাসা ও এলাকাটির সাথে সে জড়িয়ে গেছে এক অবর্ণনীয় সম্পর্কে। সে এখানে থাকে কিন্তু তার মনে হয় সে এখানে থাকে না, আবার এখানে ছাড়া অন্য কোথাও থাকার কথাও সে ভাবতে পারে না, কখনো তার মনেই হয় না অন্য কোথাও সে থাকবে। শহরের একপাশে এই এলাকাটি, এখানে ঢোকার অনেক আগেই এর জীবনের গনগনে তাপ বাঘের মতো শরীরের সবখানে থাবা দেয়; এটি কখনো ঘুমোয় না, দুপুরে যেমন উত্তেজিত জেগে থাকে রাত চারটায়ও জেগে থাকে তীব্রভাবে, বড়ো রাস্তাটি ও গলিগুলোতে কখনো সঙ্গমে সঙ্গমে জন্মপাওয়া মানুষের অভাব হয় না, এই এলাকায় হয়তো প্রতিরাতে শ-দুয়েক নারী গর্ভবতী হয়, দোকানগুলো কখনো বন্ধ হয় না, সব সময় কেনাবেচা চলছেই। এতো কেনার আছে, এতো বেচার আছে? রিকশা, বেবি, ট্রাক, ঠেলা, ভ্যান, অন্ধ, পঙ্গু, কুষ্ঠরোগী, আর সুস্থ মানুষ সব সময় ঠেলাঠেলি করছে; এটা এক চিরজাগ্রত এলাকা। এর প্রচণ্ড হৃৎপিণ্ড অজস্র ট্রাকের ইঞ্জিনের মতো সব সময় গর্জন করছে। এই বাড়িটার যিনি মালিক, তিনি এটি তৈরি করতে করতে এই পাঁচতলাটির মতোই নিজেকে অসম্পূর্ণ রেখে চ'লে গেছে; তার মনে হয় এমন অসম্পূর্ণ কিছুই সে খুঁজছিলো। পাঁচতলায় একটিমাত্র বিরাট ঘর, সাথে একটা বাথরুম, সামনে বারান্দা; আর পশ্চিমে প'ড়ে আছে শূন্য ছাদ, যেখানে দুটি বড়ো ঘর উঠতে পারতো, কিন্তু ওঠে নি। এই শূন্যতাটাকে হাসানের ভালো লাগে; এবং ভালো লাগে সে অনেক উঁচুতে একলা আছে, তার ঘর আর ছাদ থেকে সে যেমন আকাশ দেখতে পায়– আকাশ সে বেশি দেখে না, তেমনি দেখতে পায় দূরে স্তূপ স্তূপ আবর্জনা, পৌর আবর্জনার তেতলা পাহাড়, একদিন এই আবর্জনা আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে, সেদিন সে মন ভ'রে আকাশ দেখবে, দিকে দিকে বিবর্ণ তেতলা চারতলা বিকলাঙ্গ বাড়ি, তার মনে হয় সে এক নিরন্তরতরঙ্গিত মলসমুদ্রের ওপর এক উঁচু নিঃসঙ্গ একান্ত বিজন মিনারে বাস করছে। এই পাঁচতলার ঘরটি তার টাওয়ার; কবিকে টাওয়ারেই থাকা দরকার, তাতে ডানা না থাকার অভাব পূরণ হয় অনেকখানি; কবির পায়ে মল মাটি কাদা লেগে থাকবে, কিন্তু তার চুল মেঘ আর নীলের ছোঁয়ায় মেঘ হবে নীল হবে। যদি সে একটা চুপচাপ এলাকায় এমন উচ্চ নিঃসঙ্গতায় থাকতো, যদি এই এলাকাটি হতো চার বর্গমাইলের একটি নিবিড় উদ্যান,

তাহলে হয়তো কোনো এক অদ্ভুত আঁধারে সে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তো, কিন্তু এখানে তার লাফিয়ে পড়ার কথা মনে আসে না, সে জানে নিচে বয়ে চলছে প্রাণবন্ত জীবন, অশ্লীল অসুন্দর জীর্ণ পংকিল সুন্দর; ওই জীবন তাকে গলগল ক'রে বলছে, তুমি কখনো লাফিয়ে পড়বে না, মলস্তূপের মধ্যে ফুটে উঠবে তুমি, জীবন লাফিয়ে পড়ার জন্যে নয়, একদিন জীবন নিজেই প'চে গ'লে আবর্জনা হয়ে উঠবে।

দিঘির কালো জলে নয়, সে দেখতে পায় অনন্ত মলের স্থির প্লাবনের ওপর ফুটে আছে আদিগন্ত শুভ্র পদ্ম; সে দেখে ডাস্টবিনে ঝলমল করছে সূর্যের থেকে বড়ো সূর্যমুখি। জীবন হচ্ছে বিপরীতের শিল্পকলা, কবিতাও তাই, সুন্দর অসুন্দরের অভাবিত অনিন্দ্য সঙ্গম।

হাসানের মনে হয়, বৃষ্টির হরিণের ধানখেতের মেঘের সৌন্দর্যের থেকে অনেক সুন্দর পথ জুড়ে যানজট, ট্রাকে ট্রাকে মুখোমুখি সংঘর্ষ; বাসস্টপে প'ড়ে থাকা কুষ্ঠরোগীটি চমৎকার কবিতার জন্যে, কবিতা ওকে রজনীগন্ধার পাপড়িতে পরিণত করবো, কবিতা রূপান্তরের আশ্চর্য রসায়ন।

গোলাপ রজনীগন্ধা আর এ-সময়ের ফুল নয়, আজকের ফুল আবর্জনায় গঠিত অভাবিত অপূর্ব, সুন্দর, যার কথা কেউ আগে ভাবতে পারে নি।

তার মনে হয়, কবিতা এখন সুশীল বিনীত পবিত্র পূজারী চায় না, চায় নষ্টভ্রষ্ট বদমাশ প্রচণ্ড দণ্ডিত প্রতিভা; সে নষ্টভ্রষ্ট হবে কিন্তু তার মতো সৎ কেউ হবে না, সে বদমাশ হবে কিন্তু তার মতো মহৎ কেউ হবে না, আর সে বইবে সকলের পাপ সকলের অপরাধ, সে হবে কবি।

হাসানের মনে হয় কবিতার জন্যে এই এলাকাটিই শ্রেষ্ঠ; এই মলস্তূপ থেকে একটি একটি ক'রে উঠে এসেছে তার অনেক কবিতা, আরো আসবে। কবিতা হচ্ছে পঙ্কজ মলজ; সেই কবিতা সে লিখবে।

পাশ করার পর সে কয়েক বছর কাটিয়ে এসেছে সম্পূর্ণ বিপরীত এক এলাকায়, যেখানে থাকলে গাধা গরু গাড়লদেরও কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে, দু-একটি গাড়ল তাকে কবিতা লিখে দেখিয়েছেও, ওরা যে কেনো কবিতার কামড় বোধ করে, কিন্তু ওই তিন বছর সে কোনো কবিতা লেখে নি, কোনো পংক্তি এসে তাকে ধাক্কা দেয় নি। একটা চাকুরি তার দরকার হয়েছিলো– কবিরও চাকুরির দরকার হয়!; ঢাকায় কিছুতেই পাচ্ছিলো না; তখন তাকে চাকুরি নিয়ে যেতে হয়েছিলো একটা প্রায় গ্রামের কলেজে।

ইন্টারভিউর পর লিকলিকে থুতুঝরা প্রিন্সিপালটি তাকে বলেছিলো, আপনেরেই সবচাইতে কম্পিটেন্ট মনে হইতেছে, আপনেই সবচাইতে ভাল করছেন, কিন্তু একটা প্রব্লেম হইতেছে আপনে কবিতা লেখেন।

নিজেকে খুবই দণ্ডিত মনে হয়েছিলো তখন, ঘেন্না লাগছিলো নিজেকে, কেনো যে সে আবেদনপত্রে উল্লেখ করেছিলো তার দুটি প্রবন্ধ আর কিছু কবিতা ছাপা হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়।

হাসান জিজ্ঞেস করেছিলো, কবিতা লিখি, তাতে কী সমস্যা?

প্রিন্সিপালটি বলেছিলো, কবিরা ক্যারেক্টারলেস অয়, খালি মাইয়ালোক লইয়া ফষ্টিনষ্টি করে। আমার কলেজে আবার মাইয়ারা পড়ে।

হাসান বলেছিলো, রবীন্দ্রনাথ নজরুলও কবি ছিলেন।

প্রিন্সিপালটি বলেছিলো, অই তাগোও ক্যারেক্টার আছিল না, তারাও খালি মাইয়ালোকের কথা বলছে, খালি প্রেমলীলার কথা।

হাসান বলেছিলো, কিন্তু তাঁরা তো মহাপুরুষ ব'লে গণ্য।

প্রিন্সিপালটি বলেছিলো, হ, মহাপুরুষ, মরণের পর এই কবিগুলি মহাপুরুষ হয়, বাচনের সময় অইগুলি ক্যারেক্টারলেস মানুষ। আমাদের ধর্মে বলে কবিরা মরণের পর দোজগে যাইবো।

হাসান কোনো উত্তর দেয় নি, লোকটিকে দেখছিলো; সে দেখেছে এই নোংরা লোকটিই চারপাশে ছড়িয়ে আছে।

প্রিন্সিপালটি আরো বলেছিলো, আপনেরে লইতে পারি, ইন্টারভিউ আপনে সব চাইতে ভালই দিছেন, তয় কথা দিতে হইবো কবিতা লেখতে পারবেন না, আর মাইয়া স্টুডেন্টগো লগে ফষ্টিনষ্টি করতে পারবেন না। মাইয়ালোকও যেমুন, কবি শোনলে কাইত হইয়া পড়ে, আর আপনে দেখতেও খারাপ না।

ওই তিন বছর তার বুকে কেঁপে ওঠে নি কোনো পংক্তি, রক্তে গুঞ্জন করে নি কোনো রঙিন শব্দ, রোদ মেঘ অন্ধকার জ্যোৎস্নালাগা দৃশ্য চোখে ঝলমল ক'রে ওঠে নি, মাংসকোষকে উত্তেজিত করে নি কোনো অভাবিত আকস্মিক তুলনা, কোনো চিত্রকল্প তাকে মত্ত প্রমত্ত উন্মত্ত করে নি ধ্বনিগন্ধস্বাদস্পর্শরূপে, সে কোনো কবিতা লিখতে পারে নি, লেখে নি; গাড়ল মোষের মতো প্রিন্সিপালটির আদেশ মানার জন্যে নয়, ওই প্রথাগত সুন্দর চারপাশ তার ভেতরে কোনো কবিতা সৃষ্টি করে নি। হাসান বিস্মিত হয়ে দেখেছে চারপাশ অত্যন্ত সুন্দর; দিঘি ধানখেত তালগাছ আছে, নিবিড় সবুজ ঘন গাছে ঢাকা কয়েকটি পরিত্যক্ত হিন্দুবাড়িও আছে, নীল আকাশ, মেঘ, নিবিড় বৃষ্টি, শিশির, সরষে ফুলের হলুদ বিস্তারও আছে, কিন্তু তার ভেতর নেই কোনো কবিতা। বইপত্র পড়েছে, ছাত্রদের পড়িয়েছে যদিও ছাত্ররা পড়তে চায় নি, গদ্যপদ্য বই নিরর্থক তাদের কাছে, আড্ডা দিয়েছে, মাঝেমধ্যে ঢাকা এসেছে সে, কিন্তু কবিতা লেখে নি; তার মনে হয়েছে হাসান রশিদ থেকে সে আবার মোহাম্মদ আবুল হোসেন তালুকদার হয়ে গেছে। এক ম্লান বিকেলে তার ভেতরে হাসান রশিদ কথা ব'লে ওঠে– যদি কবিতাই না হয়, কবিতাই না সৃষ্টি করো, তাহলে কী দরকার ছিলো তোমার হাসান রশিদ হওয়া, নিজেকে ভাঙা, কী দরকার ছিলো ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে গ্রামের তুচ্ছ কলেজে তুচ্ছতর বাঙলার মাস্টার হওয়া? তুমি কি এই গ্রামের কলেজে সাতটা কায়কোবাদ এমদাদ আলি পাঁচটা শহিদুল্লাহ বরকতুল্লাহ পড়ানোর জন্যে নিজেকে ভাঙা শুরু করেছিলে? তুমি না হ'তে চেয়েছিলে এমন কিছু যা গুডবয়রা কলেজের মাস্টাররা কখনো হ'তে চায় না? তুমি এখান থেকে কেটে পড়ো হাসান, ভাগো, তুমি নষ্ট হচ্ছো,

কবিতা সৃষ্টি না করাই তোমার জন্যে নষ্ট হওয়া; তুমি নষ্ট হও, সম্পূর্ণ নষ্ট হও, কবিতার জন্যে, চিত্রকল্পের জন্যে; কুষ্ঠরোগী হও, দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগী হও, কবিতার জন্যে; পাপী হও, অমোচনীয় পাপী হও, কবিতার জন্যে; তুমি দণ্ডিত হও, চিরদণ্ডিত হও, ধ্বংস হও, কবিতার জন্যে; আর কিছু নয়, তুমি শুধু কবিতার জন্যে, তুমি বিকশিত হবে শুধু কবিতার জন্যে, নষ্ট হবে শুধু কবিতার জন্যে। কবিতা তোমার জীবন, কবিতা তোমার তিলে তিলে ভয়াবহ মৃত্যু।

পর দিনই সে কলেজকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে, গাড়ল প্রিন্সিপালটি আর তার সুস্থ স্বাস্থ্যবান সহকর্মীরা খুবই অবাক হয়।

ঢাকা, কবিতার জন্যে নষ্ট হওয়ার এই একটিই শহর রয়েছে, একটিই স্বর্গ একটিই নরক রয়েছে, এই একটিই অশেষ অন্ধকার একটিই অনন্ত জ্যোতি রয়েছে, একটিই সুস্থতা একটিই অসুস্থতা রয়েছে।

হাসান অনেক দিন পর এই অন্ধকারে এই জ্যোতিতে এসে ওঠে।

প্রথম একটি শস্তা হোটেলে ওঠে, এবং শিউরে ওঠে হাসান যে ট্রেন থেকে নামতেই একটি পংক্তি একটি দ্রুত ট্রেনের মতো গমগম ক'রে তার ভেতরে ঢুকে যায়, পংক্তিটিকে মাথায় আর বুকে আর রক্তে নিয়ে সে তিন চার দিন ধ'রে শহরের পথে পথে ঘোরে, বন্ধুদের অফিসে বিব্রতভাবে প্রবেশ করে, আড্ডা দেয়, দু-একটি পত্রিকার অফিসে যায়, এবং এক রাতে পংক্তিটি একটি সম্পূর্ণ কবিতা হয়ে কাগজে আত্মপ্রকাশ করে। তার মনে হয় এই প্রথম সে শব্দ আর বাক্য লিখলো, এই প্রথম সে শব্দকে বাক্যকে এমন রূপ দিলো, যাকে কবিতা বলা যায়।

ধন্যবাদ, ঢাকা, ধন্যবাদ তোমাকে; তুমি বদমাশের, তুমি কবির।

অনেক বছর পর একটি কবিতা লিখে সে শারীরিক পুলক বোধ করে। তার মনে হয় অনেক বছর পর সে একটি পরিতৃপ্ত সঙ্গমের স্বাদ পেলো, দীর্ঘ সর্বাঙ্গ বহুতল বহুপ্রকোষ্ঠময়।

কবিতা কি আমার শরীরের সাথেও জড়িত? জড়িত অণ্ডকোষের সাথেও? হাসান নিজের ভেতরে তাকায়। কবিতাটি আমাকে কেনো ক্ষরণের সুখ দিলো, যেমন ক্ষরণের সুখ আমি অনেক দিন পাই নি? কবিতা কি আমার মগজ থেকে দূরে? কবিতা কি আমার অণ্ডকোষ আর শিশ্নের সন্তান?

কবিতা তুমি এভাবেই এসো, আমাকে কাঁপিয়ে এসো, শিউরে দিয়ে এসো, ভেঙে এসো, আমাকে পুলকিত নিস্তেজ মৃত্যুর স্বাদ দিয়ে রচিত হয়ো। আমার চোখ রক্ত মাংসের ভেতর দিয়ে এসো, আমার শরীরকে শুষে তুমি নির্গত হয়ো। কবিতা, মৃত্যু হয়ে এসো, আমার, জীবন হয়ে এসো।

আরেকটি পংক্তি তার মাথায় ঢোকে একটি ট্রাক তার রিকশার পেছনে শহর কাঁপিয়ে ব্রেক কষতেই, ব্রেকের শব্দে চাকার নিচে পড়া অজস্র রিকশার চিৎকারের মতো এইবার কবিতাটি বেজে ওঠে তার ভেতরে।

সে পেছনে ট্রাকটির দিকে তাকিয়ে বলে, ধন্যবাদ, ট্রাক, তুমি আমাকে একটি পংক্তি দিয়েছো; তুমি মৃত্যুর থেকেও সুন্দর, জীবনের থেকেও অপরূপ।

ট্রাকটি যেনো বলে, ধন্যবাদের কথা বলো না, কবিতা লেখো।

সে-রাতেই কবিতাটিকে সে কাগজে জন্ম দেয়।

কিন্তু এই শহর অন্যের হয়ে গেছে, এককালে এই রূপসী তারও দখলে ছিলো; তারও স্যান্ডলের শব্দে এই পংকিল তিলোত্তমা বুঝতো সে হাঁটছে; এখন অন্যদের দখলে, অভিচারিণী তাকে চিনতে পারছে না, তার স্যান্ডলের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু শহর, মায়াবিনী, সুন্দরী রূপসী, অপূর্ব পংকিলা, আমার স্যান্ডলের শব্দ তোমাকে শুনতেই হবে, যেমন শুনতে একদিন, তুমি শুনবে, শুনতেই হবে, পৃথক দুরূহ গভীর অন্তরঙ্গ নির্মম স্যান্ডলের শব্দ– হাসান শহরের কানে কানে নিঃশব্দে বলে। একদা বন্ধু কবিদের আড্ডায় গিয়ে দেখছে একটি ক'রে কবিতার বই বেরিয়েছে অনেকের, আর তাদের মাথা আকাশে ঠেকে গেছে; তারা কবি, সে কেউ নয়; তাদের পায়ের নিচে প'ড়ে আছে বাঙলা কবিতা, দয়া ক'রে তারা তাদের ছেঁড়া জুতো দিয়ে কবিতা মাড়াচ্ছে, ধন্য হচ্ছে কবিতা।

আড্ডায় গেলেই হাসানের মনে হয় সে একদল দণ্ডিত ছিন্নভিন্ন মানুষ দেখছে, যারা বুঝতে পারছে না যে তারা দণ্ডিত ছিন্নভিন্ন। কাদের আবদুল, বিভূতিভূষণ মণ্ডল, সালেহ ফরিদউদ্দিন, আহমেদ মোস্তফা হায়দার খুবই দাপটের সাথে আছে; তারাই কবিতার যুবরাজ; একেকটি লিটল ম্যাগাজিন দুই হাতে আঁকড়ে তারা ভাগ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দলে, নিজেদের লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা ছাপছে– ছাপছে দৈনিকের সাময়িকীতেও, বন্ধুদের দিয়ে নিজেদের কবিতা সম্পর্কে তিরিশ পাতার প্রবন্ধ লেখাচ্ছে, প্রশংসা লেখাচ্ছে শহরের জীবাশ্ম বুড়োদের দিয়ে, কেউ কেউ লিখছে না, সম্পাদনা করছে লিটল ম্যাগাজিন, পালন করছে গুরুর ভূমিকা, হয়ে উঠছে কবিতার পৃষ্ঠপোষক সন্ত। কবিতার শহর এখন তিন চারটি যুবরাজের, আর দুটি একটি কবিতার সন্তের।

এক সন্ধ্যায় গুলিস্থানের উত্তরের এক রেস্তোরাঁয় খুব জমজমাট ঘোলাটে তীব্র আড্ডা জমে। আড্ডায় মহাবীর সন্ত রহমত আলি মাহমুদ আছে, আর আছে কবিতার যুবরাজগণ– কাদের আবদুল, সালেহ ফরিদউদ্দিন, বিভূতিভূষণ মণ্ডল, আহমেদ মোস্তফা হায়দার, এবং আরো কয়েকটি তরুণ কবি, যারা হয়তো বই পুড়িয়ে ফেলা ছাত্র, যাদের হাসান চেনে না, কিন্তু তাদের চোখে মুখে ভাঙা চোয়ালে চুলে গালে পাঞ্জাবিতে ঝুলছে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা।

আড্ডায় যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে কবি নয়, সে এক মাংসল ভনিতা; সে কবিতার সন্ত রহমত আলি মাহমুদ। এই বিপুল হা হা সন্তকে হাসান আগেও দেখেছে, জন্মসূত্রেই মহাপুরুষের মতো ভাব, কিন্তু হাসানের মনে হয়েছে সে আপাদমস্তক শূন্য, শুধু ঠোঁট শুধু গলা, শুধু প্রচ্ছদপট, শুধু হা হা হাস্য, তাই তার কাছে কখনো যায় নি। সে কোনো লিটল ম্যাগাজিনের নিজস্ব কবি হ'তে পারে নি। এবার দেখছে সন্ত আরো প্রতিষ্ঠিত, কবিতার মহাগুরু, সেই ঠিক ক'রে দিচ্ছে সে কবি আর কে কবি নয়, কে কবি হবে আর কে হবে না।

কবিতার অভিভাবকেরা চিরকালই আস্ত অকবি, হাসান মনে মনে বলে, রহমত আলি মাহমুদ তুমি কখনো কিছু হবে না, তুমি একটা শূন্য।

সন্ত রহমত আলি মাহমুদ বলে, বাঙলা কবিতা এখন তাকিয়ে আছে আমাদের লিটল ম্যাগাজিন *চর্যাপদ*-এর দিকে,– আমাদের লিটল ম্যাগাজিন ছাড়া বাঙলা কবিতার আর কোনো পথ নেই। আমাদের ম্যাগাজিনের অ্যাভেনিউ দিয়েই বাঙলা কবিতাকে ইটারনিটির দিকে যেতে হবে।

হা হা ক'রে হাসে সন্ত রহমত আলি মাহমুদ।

টেবিলের চারদিকে গাঁজাভরা সিগারেটের ধুঁয়ো, ঘোলাটে চায়ের কাপে খুব দ্রুত জ'মে উঠছে ম্রিয়মাণ ছাঁই, আর অনন্ত অপচয়।

কাদের আবদুল বলে, মাহমুদ ভাই, আপনি আছেন ব'লেই আমরা কবি, আপনি সৃষ্টি করছেন কবি, যা কবিতা লেখার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলা কবিতার ইতিহাসে কেউ আর এভাবে কবি তৈরি করে নি।

হাসান ব'লে ওঠে, বুদ্ধদেব বসু?

কাদের আবদুল বলে, বুদ্ধদেব বসুকে ভুলে যান, সে ছিলো ডাকযোগে কবি করার সম্পাদক, মাহমুদ ভাই তার থেকে অনেক বড়ো, মাহমুদ ভাই আমাদের কবিতার প্রফেট।

সন্ত রহমত আলি মাহমুদ হা হা ক'রে হাসে আর বলে, হাসান সাহেব মফস্বল থেকে এসেছে, সব বুঝতে তার সময় লাগবে, মফস্বলে থাকলে মানুষ চাষা হয়।

কাদের আবদুল বলে, বলুন আপনি মাহমুদ ভাই, আপনার কথা ধ্রুবতারার শিখার মতো এসে পড়ুক আমাদের এই আবর্জনার ওপর।

সন্ত রহমত আলি মাহমুদ বলে, লিটল ম্যাগাজিনের সাক্সেস নির্ভর করে দুটি ব্যাপারের ওপর; ম্যাগাজিনটি কটি কবি ক্রিয়েট করলো আর কটি তরুণ কবিকে আত্মহত্যায় ইন্সপায়ার করলো, তার ওপর। আত্মহত্যার ওপরই বেশি নির্ভর করে লিটল ম্যাগাজিনের সাফল্য; আত্মহত্যা মানে সুইসাইড।

হা হা ক'রে হাসে সন্ত রহমত আলি মাহমুদ।

সন্ত রহমত আলি মাহমুদ বলে, যদি আমার *চর্যাপদ* একটি কবি সৃষ্টি করতে পারে, বেশি নয় দশটি নয় বারোটি নয়, মাত্র একটি কবি, আর অন্তত একটি তরুণ কবিকে পবিত্র উজ্জ্বল অবিনশ্বর বিশুদ্ধ আত্মহত্যায় ইন্সপায়ার করতে পারে তাহলেই মনে করবো আমার ম্যাগাজিন সাক্সেসফুল। বাঙলা কবিতার ইতিহাস থেকে এর নাম কেউ বাদ দিতে পারবে না; হা হা হা হা।

সন্ত রহমত আলি মাহমুদ চারদিকে তাকায়; হাসান দেখে কয়েকটি তরুণ নির্বই নির্গ্রন্থ ছাত্র কবি খুবই অনুপ্রাণিত উদ্বেলিত হচ্ছে তার কথায়; চোখ বুজে টেনে চলছে গাঁজাভরা সিগারেটপরম্পরা, আর বলছে, কবিতা, কবিতা, আত্মহত্যা, আত্মহত্যা, অমরতা, অমরতা।

সন্ত রহমত আলি মাহমুদ বলে আপনাদের বুঝতে হবে, বিংশ শতাব্দীর

টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরির এই অভিনব কবিতার দশকে যে কবিতা লিখবে, তাকে বুঝতে হবে কবিতা। আজ আর ডিভাইন গডেজ না, কয়েক হাজার বছরের কন্টিনিউয়াস চোষাচুষিতে টানাটানিতে দেবীদের স্তন ঝুলে গেছে পচা কাঁঠালের মতো, নাভির কাছে নেমে এসেছে, বোঁটা খ'সে গেছে, থকথক করছে, ঠোঁট ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, তাতে ভনভন ক'রে মাছি বসছে, তলপেট ঢিলে গোস্তে ভ'রে গেছে, আরো নিম্নে প্রবাহিত হচ্ছে শুধু পৌর আবর্জনা, দেবী সিফিলিসে গনোরিয়ায় ভুগছে, কবিতা আজ বাদামতলি টানবাজারের গ্রাম থেকে আসা পনেরো বছরের টাটকা বেশ্যা, ওইটা যাকে ঘরে বসায় সে-ই কবি হয়, তরুণ কবির কাজ হচ্ছে টাটকা ভার্জিন বেশ্যাকে বলাৎকার করা।

কাদের আবদুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলে, দেবীর থেকে বেশ্যাই পরমোত্তম, তার স্তব করতে হয় না, তার দেহ আছে, স্তন আছে, ত্রিভুজ আছে, লোমে সুগন্ধ আছে, থুতুতে মাদকতা আছে, ট্রাউজার খুলে সায়া তুলে তাকে বলাৎকার করলেই চলে। আমি তাকে বলাৎকার করি, তাই আমি কবি।

একটি প্রচণ্ড উত্তেজনার ঝড় বয়ে যায় টেবিলের ওপর দিয়ে।

কাদের আবদুল তখন খুব বাহবা পাচ্ছে, এক বুড়ো তার সম্পর্কে দশ পাতার একটা প্রবন্ধ লিখেছেন, সেই প্রবন্ধটি বগলে বইয়ে বেড়াচ্ছে কাদের আবদুল; বলছে, আমি কবিতার যুবরাজ।

কাদের আবদুল এখন আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা, সে কুকুরীর বুকে তিন চারটি স্তন দেখে বেড়াচ্ছে; কিন্তু হাসান দেখেছে তার ভেতর লুকিয়ে আছে ইসলাম; বুড়ো হ'লে এটা হামদ্ নাত লিখবে।

বেশ কবির মতো চেহারা, চুল, আর পোশাকও হয়েছে কাদের আবদুলের। হাসানের থেকে সে কয়েক বছরের বড়ো।

চারদিকে গাঁজাভরা সিগারেটের উৎকট কাব্যিক ধুঁয়ো, ময়লা চায়ের কাপে সিগারেটের বিষণ্ন ম্রিয়মাণ ছাই।

বিভুতিভূষণ মণ্ডল এতোক্ষণ গাঁজাভরা সিগারেট টানছিলো চোখ বন্ধ ক'রে বিলি কাটছিলো নিজের লম্বা জটিল চুলে, জটা ছাড়াচ্ছিলো টেনে টেনে, একগুচ্ছ চুল এতোটা আটকে গেছে যে সহজে ছাড়াতে পারছিলো না, কিন্তু সাধনা ক'রে চলছিলো, আর মাথা নাড়ছিলো ডানে বাঁয়ে, মাঝে মাঝে থুতু ফেলছিলো।

বিভুতিভূষণ মণ্ডল এবার চিৎকার ক'রে ওঠে, মাহমুদ ভাই, কাদের ভাই, আপনেরা খুব বেশ্যা, বেশ্যা করতেছেন, বেশ্যার চিনেন কি আপনেরা, কয়টা বেশ্যার লগে শুইছেন, আমি দেড় বছর ধ'রে বেশ্যাবাড়িতে আছি, আমি বেশ্যারটা খাই, বেশ্যার বিছনায় শুই, আমি জানি ওইগুলিতে কোনো কবিতা নাই।

বিভুতিভূষণ মণ্ডল আবার সিগারেট পাকাতে থাকে, সবাই ভয় পেয়ে তার দিকে বিনীতভাবে তাকায়। সে ভীতিকর, আধুনিকতাকে সে ছিঁড়েফেড়ে ফেলতে পারে।

বিভুতিভূষণ মণ্ডল বলে, কবিতা বেশ্যা না, বেশ্যা কবিতা না, কবিতা হইছে সমাজতন্ত্র। আধুনিকতার মুখে আমি মুতি, কবিতা হইল সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ছাড়া

কবিতা নাই। মার্ক্স লেনিন স্ট্যালিন হইছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি, চিরকালের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের নাম হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন।

বিভুতিভূষণ মণ্ডল সিগারেটে টান দিয়ে টেবিলের নিচে একদলা থুতু ফেলে অনেকক্ষণ থুতুর দলার সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সন্ত রহমত আলি মাহমুদ একটু বিব্রত হয়, নিজের কাব্যতত্ত্বকে বিস্তৃত করার তার সাহস হয় না। বিভূতিভূষণের দুটি কাব্য বেরিয়েছে, এবং সে খুবই জনপ্রিয়, ছেলেপেলেরা তার বই কিনছে, আবৃত্তি করছে; তরুণ কবিদের মধ্যে সে একনম্বরে আছে, আর সমাজতন্ত্রের ওপর কোনো কথা নেই, কোনো কাব্যতত্ত্ব নেই।

সালেহ্ ফরিদউদ্দিন পরিবেশটাকে একটু রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে।

সালেহ্ ফরিদউদ্দিন বলে, মাহমুদ ভাই, *চর্যাপদ*-এর আগামী সংখ্যায় আমাগো কবিতা সম্পর্কে একটা বড়ো লেখা থাকা দরকার, আমাদের প্রতিভার ক্যারেক্টারটা তাতে ধরিয়ে দেয়া দরকার, যাতে লোকজন বুঝতে পারে আমরা কি লিখতেছি, কেনো লিখতেছি, আমাদের কবিতা কিভাবে নতুন, কিভাবে অসাধারণ, কিভাবে মর্ডান (সালেহ ফরিদউদ্দিন 'মডার্ন'কে 'মর্ডান'ই বলে)।

সন্ত রহমত আলি মাহমুদ বলে, আমি তো একটা বড়ো আর্টিকেল ছাপতে চাই আপনাদের প্রতিভা সম্বন্ধে, কিন্তু লেখাটা লিখবে কে?

সালেহ্ ফরিদউদ্দিন বলে, হাসান রশিদ লেখাটা লেখতে পারে বইল্যা আমার মনে হয়, গদ্য লেখায় হাসানের হাত আছে; ও আগেও আমাগো লইয়া লেখছিলো।

নিজের নাম শুনে চমকে ওঠে হাসান, এবং খুবই বিব্রত বোধ করে।

সালেহ্ ফরিদউদ্দিন হাসানকে বলে, দোস, তুমি ত কবিতা লেখা ছাইরাই দিছো, চাইর বছর আগে তুমিই আমাগো লইয়া একটা প্রবন্ধ লিখছিলা, আমাগো কবি বলছিলা, তারপর থিকাই ত আমরা কবি, আবার আমাগো লইয়া একটা প্রবন্ধ লেখো, তুমি ক্রিটিক হইয়া যাও। আমাগো একজন ক্রিটিক দরকার।

হাসান বলে, না, না, সমালোচক হওয়ার আমার ইচ্ছে নেই, তোমাদের কবিতা নিয়ে আমি এখন লিখে উঠতে পারবো ব'লে মনে হচ্ছে না।

বিভুতিভূষণ মণ্ডল সিগারেটে টান দিতে দিতে জট ছাড়াতে ছাড়াতে একদলা থুতু ফেলতে ফেলতে চোখ বন্ধ ক'রে বলে, ল্যাখো ল্যাখো দোস্ত, আমাগো লইয়া ল্যাখো, আমাগো মইধ্যে তুমিই একটু-আধটু লেখাপড়া জানো, আমরা কোন গুমুত লিখতাছি তুমিই তা ভাল বোঝতে পারছো, তোমার চাইর বছর আগের প্রবন্ধটায়ই ত আমার নাম প্রথম ক্রিটিসিজম লিটারেচারে স্থান পায়, আমি সেই কথা ভুলি নাই। আর্টিকেলের ভিতরে নিজের নাম দেখতে আমার সুখ লাগে। আমাগো লইয়া ল্যাখো, আমি তোমার নামে একটা বই ডেডিকেট কইর‍্যা দিমু, একটা খানকিরে কথা দিছিলাম, তার বদলে তোমার নামেই ডেডিকেট করুম।

হাসান বলে, আমি ঠিক এখন লিখে উঠতে পারবো না, বিভূতি, গদ্য লেখার জন্যে আমি ঠিক প্রস্তুত নই।

কাদের আবদুল বলে, কেনো পারবেন না হাসান সাহেব? আপনি লিখুন, আমাদের কবিতা সম্পর্কে লিখে আপনিও ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন; কবিদের সঙ্গে থেকে অনেক ক্রিটিকও ইম্মরটাল হয়েছে।

হাসান এবার একটু উত্তেজিত হয়, এবং বলে, বন্ধুদের কবিতা সম্পর্কে কোনো কবির সমালোচনা লেখা ঠিক নয়, এটা আত্মহত্যা।

আহমেদ মোস্তফা হায়দার জিজ্ঞেস করে, কেনো ঠিক নয়?

হাসান বলে, বন্ধুদের কবিতা সম্পর্কে লিখলে নিজের ক্ষতি হয়।

আহমেদ মোস্তফা হায়দার বলে, কেনো ক্ষতি হয়?

হাসান বলে, দেখেন নি কেমন ক্ষতি হয়েছে, বুদ্ধদেব বসুর? তিনি বন্ধুদের নিয়ে লিখেছেন, আর বন্ধুরা মনে করেছেন তাঁরাই কবি, বুদ্ধদেব বসু কবি নন। নির্বোধ নির্বোধ বোকাসোজা জীবনানন্দও প্রবন্ধে কবিতা উদ্ধৃত ক'রে কবির নাম দেন নি, বলেছেন 'এক আধুনিক কবি লিখেছেন', 'এক কবির কবিতায় পাই' ধরনের কথা, বন্ধু কবির নামটি তিনি উল্লেখ করেন নি। বোকা বোকা লাগলেও জীবনানন্দ চালাক ছিলেন বুদ্ধদেবের থেকে। কবি হয়ে কবিবন্ধুদের কবিতা আলোচনা করতে নেই, তাতে বন্ধুরা মনে করে তারাই কবি, আর মূর্খ পাঠকেরা ভুলে যায় যে আলোচকও কবি, গুরুত্বপূর্ণ কবি।

কাদের আবদুল বলে, আপনাকে খুব কৃপণ মনে হচ্ছে।

হাসান বলে, আপনারাও কিন্তু অন্যের কবিতা সম্পর্কে লেখেন না, দু-চার পংক্তি গদ্য লিখলে বন্ধুদের নাম নেন না, সেখানে হেল্ডার্লিন হাইনে র‍্যাবোর নাম নেন। আমিও এখন আপনাদের সম্পর্কে লিখতে পারবো না। আমি এখন কবি হ'তে চাই, সমালোচক নয়, কবি, শুধুই কবি।

আড্ডা ভাঙলে বিভূতিভূষণ মণ্ডল হাসানকে বলে, দোস্ত, যাইবা নি আমার লগে, বাদামতলির পাড়ায়, আমি ত সেইখানেই আছি।

হাসান জিজ্ঞেস করে, পাড়ায় কী ক'রে তুমি থাকো?

বিভুতিভূষণ মণ্ডল বলে, কবির লিগা পাড়া আর নিজের বাড়ির তফাৎ কি? কবির আবার ঘরবাড়ি কি? কবি যেখানে থাকে, সেইটাই তার বাড়ি। আমার লগে লও, দেখবা মাইয়া তিনটা ভাল, আমারে বাপ ডাকে গুরু ডাকে, আবার বিছনায়ও শোয়, ট্যাকাপয়সা অরাই দ্যায়।

হাসান জিজ্ঞেস করে, তুমি এটা পারো কীভাবে, বিভূতি?

বিভূতি বলে, কবিগো সব পারতে হয়, হাসান, কবি হইলে সব পারতে হয়। কবি হইলে এমন মানুষ যার ফাঁসি হইয়া গেছে। বছরখানেক আমি গুলশানে একটা বিলাতফেরত মাইয়ালোকের লগে আছিলাম, তার গাড়িবাড়ি সব আছিল, সমাজতন্ত্র তার প্রিয় জিনিশ, কিন্তু তার লগে থাকতে আর ভাল লাগল না, এখন মালতিগো লগে আছি, অগোই আমার ভাল লাগে, এডুকেটেড মাইয়ালোকের লগে শুইয়া আমি সুখ

পাই না। এডুকেটেড মাইয়ালোকেরা কবিতা বোঝে না, বেশ্যারা তাগো থিকা কবিতা অনেক ভাল বোঝে।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কতো দিন ওদের তোমার ভালো লাগবে?

বিভূতি বলে, তা জানি না, ভাল না লাগলে বাইর হইয়া পরুম, হাইকোর্টের মাজার ত আছেই, ওইখানে থাকতেও আমার খারাপ লাগবো না। হিজড়াগো লগেও আমি আছিলাম ছয় মাস, খারাপ লাগে নাই।

বিভূতি গাঁজাভরা সিগারেট টানতে টানতে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে থাকে।

হাসান একটি রিকশা নিয়ে তার হোটেলের দিকে রওনা হয়, কিছু দূর গিয়েই তার মনে হয় বিভূতির সাথে বাদামতলির পাড়ায় গেলেই আজ রাতে সে সুখ পেতো, হোটেলে সে অগ্নিগিরির মতো শূন্যতায় পড়বে, পুড়তে থাকবে লেলিহান আগুনে। শূন্যতার আগুনকে সে ভয় পায়, কিন্তু সে স্থির করতে পারে না হোটেলের শূন্যতার অগ্নিগিরিতে যাবে, না বাদামতলির পূর্ণতার দিকে রিকশাটাকে ফেরাবে, ভেতরে ঢুকে পূর্ণতার ভিতর দিয়ে বিভূতিকে খুঁজবে। সে তো বাদামতলি কখনো যায় নি, কী ক'রে সে খুঁজে পাবে বিভূতিকে?

হাসান বলে, রিকশা, বাদামতলি চলো।

রিকশাঅলা জিজ্ঞেস করে, পাড়ায় যাইবেন, ছার?

হাসান বলে, হ্যাঁ।

রিকশাঅলা বলে, তার চাইতে একটা ভাল জায়গা আছে, মাইয়াটাও নতুন গেরাম থিকা আসছে, আমি লইয়া যাইতে পারি, ছার।

হাসান বলে, না বাদামতলিই চলো।

রিকশাঅলা রিকশা ঘুরিয়ে বাদামতলির দিকে চালাতে থাকে; কিছুক্ষণ পর হাসান রিকশাঅলাকে বলে, রিকশা, থামো।

রিকশাঅলা রিকশা থামিয়ে বলে, পাড়ায় যাইবেন না ছার?

হাসান রিকশা থেকে নামতে নামতে বলে, না।

রিকশাঅলা বিস্মিত হয়ে বলে, আপনে পাগল নি, ছার?

হাসান বলে, শুধু আমিই পাগল নই, দশ হাজার বছর ধ'রে আমার বংশের সবাই পাগল, আমার বাপ পাগল, দাদা পাগল, তার বাপ পাগল...

রিকশাঅলা বলে, কন কি, ছার, এমন পাগলের বংশে আপনে হইছেন?

হাসান বলে, হ্যাঁ, আমি পাগলের বংশের শেষ পাগল, তবে আমার পরও আরো পাগল আসবে, পাগল ছাড়া পৃথিবী সুন্দর হয় না।

রিকশাঅলা ভীষণ বিস্মিত হয়ে বলে, আপনের বংশের নাম কি, ছার?

হাসান বলে, কবি, কিন্তু তুমি তা বুঝবে না।

রিকশাঅলা বলে, বুঝুম না, কন কি ছার? আপনে হইলেন কবিয়াল, আমাগো গেরামের দবিরদ্দি ফকিরও কবিয়াল, আপনের মতনই পাগল, বউ পোলাপান ফেইল্যা খালি একতারা লইয়া দ্যাশে দ্যাশে ঘুইর‍্যা বেরায়।

হাসান হোটেলের দিকে হাঁটতে থাকে।

দূরে একটা দশতলা দালান যেনো হাসানের সাথে কথা বলতে চায়।

হাসান বলে, তুমি একটি অশ্রুবিন্দু; তুমি চোখে টলমল ক'রে কাঁপছো, তোমার বুকের গভীরে অজস্র দুঃখ।

তোমাকে আমি শিশিরের মতো মুঠোতে ধরতে চাই।

তুমি প্রজাপতি, সরষে খেতে উড়ে যাও, দশতলা, তুমি কদম ডালে ফুটে ওঠো আষাঢ়ের তুমুল বৃষ্টিতে।

দশতলা, তুমি প্রজাপতি হয়ে হারিয়ে গেছো, তোমার প্রত্যেক তলায়, নিজেকে তুমি খুঁজে পাচ্ছো না, তুমি জানো না তুমি খুঁজছো কাকে।

হাসানের মনে হয় দালানটিকে সে মুঠোতে ক'রে হাঁটছে, আর দালানটি তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরঝর ঝ'রে পড়ছে ঝরনাধারার মতো।

হোটেলে ঢোকার সময় ম্যানেজার উঠে তাকে একটা মস্ত সালাম দেয়। হাসান থমকে দাঁড়ায়; কলেজটা ছেড়ে আসার পর এমন সালাম সে অনেক দিন পায় নি। তার বেশ ভালো লাগে, মানুষের মাঝেমধ্যে সালামটালাম পাওয়াও দরকার। তাহলে সেও মানুষ, সালাম পেয়ে তার ভালো লাগছে?

ম্যানেজার বলে, ছার, আপনে পারমিশন দিলে আপনের ঘরে আধঘণ্টা পর আমি একটু আসুম।

হাসান বলে, আমি কি কোনো অপরাধ করেছি?

ম্যানেজার বলে, কন কি, কন কি ছার, আপনে অপরাধ করবেন ক্যান, আমিই অপরাধ করছি, দুই একদিন আগেই আমার যাওন উচিত আছিল।

আধঘণ্টা পর ম্যানেজার তার ঘরের দরোজায় বেশ জোরে কড়া নাড়ে। হাসান দরোজা খুলে তাকে চেয়ারে বসতে বলে, আধশোয়াভাবে সে বিছানায় বসে।

ম্যানেজার বলে, ছার, আপনের বিছানায় দেহি খালি বই আর বই, এত বইপত্র পইর‍্যা আপনে কি করেন?

হাসান বলে, পড়ি, বই প'ড়ে কিছুই করি না।

ম্যানেজার জিজ্ঞেস করে, চাকরিবাকরি করেন কই?

হাসান বলে, আগে একটা কলেজে পড়াতাম, এখন কিছু করি না।

ম্যানেজার বলে, সারাদিন বইয়া আমি খুডাইয়া খুডাইয়া প্যাপার পরি, আইজ প্যাপারে একটা কবিতার নিচে আপনের নাম দেখলাম। আমার মনে লয় অই কবিতাডা আপনেই লেখছেন।

হোটেলের ম্যানেজারও কবিতা পড়ে, কবিতা কি বিচিত্র পথ পেরিয়ে এখন সর্বত্রগামী হয়ে উঠেছে?

হাসান বলে, হ্যাঁ, আমিই লিখেছি।

ম্যানেজার বলে, তাইলে ত আপনে কবি।

হাসান বলে, এখনো কবি হই নি, তবে হ'তে চাই।

ম্যানেজার বলে, আমার কি ভাইগ্য, আমার হোটেলে একজন কবি ওঠছেন, আমি একজন কবির দেখা পাইলাম; বুড়া অইলে কইতে পারুম অই কবিরে আমি চিনি, আমার হোটেলে সে আছিল।

হাসান বলে, ততোদিন আপনি আমাকে ভুলে যাবেন।

ম্যানেজার এবার একটু চুপ ক'রে থাকে, হাসানের দিকে ভালো ক'রে তাকায়, এবং বলে, ছার, কবিরা ত মাইয়ালোক পছন্দ করে?

হাসান বলে, সবাই মেয়েলোক পছন্দ করে।

ম্যানেজার বলে, হ, হ, সবাই করে, আমিও করি, রাইতে একবার মাইয়ালোক ছারা আমারও চলে না।

হাসান বলে, আপনার স্বাস্থ্য দেখে তো মনে হয় একবার কেনো, দু-তিনবারই আপনার দরকার। আপনার বউ কটি?

ম্যানেজার বলে, বউয়ের দরকার কি ছার, বউ ত একটাই আছে গ্যারামে, হে পোলাপান লইয়া থাকে, আমার মাইয়ালোক লাগে বউ লাগে না, বিনাপয়সায়ই আমি মাইয়ালোক পাই।

হাসান বলে, আপনাকে আমার মহাপুরুষ মনে হচ্ছে।

ম্যানেজার বলে, আমার হোটেলে ভাল ভাল মাইয়া আছে, রেটও বেশি না, ছার, পুলিশরেও ট্যাকাপয়সা দেওয়া আছে, ডর নাই, আপনের কি লাগবো?

হাসান জিজ্ঞেস করে, কাগজে আমার কবিতাটি কি আপনি পড়েছেন?

ম্যানেজার হা হা ক'রে হাসে, ছার, একবার পরছি, তয় অই কবিতা বোঝনের কি আমার সাইধ্য আছে, তয় একটা কথা মনে হইল।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কথাটি কী?

ম্যানেজার বলে, কবিতাটায় মাইয়ালোকের দেহর কথা আছে, দুখের কথা আছে, লজ্জার জায়গার কথাও আছে, মনে হইল অনেক দিন আপনে মাইয়ালোকের লগে শোন নাই, কিন্তু শোঅনের লিগা আপনের শরিল ফাইট্যা যাইতেছে।

হাসান বলে, ম্যানেজার সাহেব, আপনি কবিতা বেশ বোঝেন, ইউনিভার্সিটির প্রফেসরগুলোও এতোটা বোঝে না।

ম্যানেজার বলে, কি যে কন ছার, কি যে কন।

হাসান বলে, চলুন, মেয়েগুলোকে দেখি।

ম্যানেজার হাসানকে নিয়ে তেতলার একটি ঘরে যায়; হাসান দেখে মেয়ে কলকল খলখল করছে, ওদের কণ্ঠের শব্দ ওদের মুখের রঙের মতোই শস্তা ও তীব্র।

ম্যানেজার বলে, ছার, দেখেন কোনডারে আপনের পছন্দ হয়। সবগুলিই মাল ভাল, ইচ্ছা লইলে ধইর‍্যাও দেখতে পারেন।

হাসান মেয়েগুলোর দিকে বিব্রতভাবে তাকায়; মেয়েগুলোকে কি সে টিপে টিপে পরীক্ষা ক'রে দেখবে, ওদের জিভ টেনে বের ক'রে দেখবে, ওদের শরীরের ওপরের কটকটে রঙিন বস্তুগুলো ছিঁড়ে ওদের খুলে দেখবে, অন্ধকার সুড়ঙ্গগুলোতে উঁকি দিয়ে দেখবে?

একটি মেয়ে বলে, চোখ-মেইল্যা ভাল কইর‍্যা দেখেন, সাব, কোনডারে আপনের পছন্দ। আমাগো সবারই শরিল আর বুক ভাল; আমাগো অসুক নাই, আমরা গিরস্ত ঘরের মাইয়া, আমরা বেশ্যা না।

হাসান দুটি মেয়েকে দেখিয়ে ম্যানেজারকে বলে, এই মেয়ে দুটি আমার পছন্দ।

ম্যানেজার বলে, কন কি, ছার, আপনের দুইডা মাইয়া লাগবো?

হাসান বলে, হ্যাঁ।

ম্যানেজার বলে, সারারাত ধইর‍্যা লাগবো, ছার?

হাসান বলে, হ্যাঁ।

ম্যানেজার বলে, দইজনের দুইশ ট্যাকা লাগবো, ছার।

হাসান বলে, তাতে অসুবিধা নেই।

ম্যানেজার বলে, একটা কেরু লাগবো না, ছার?

হাসান বলে, হ্যাঁ, তাও লাগবে।

হাসান চ'লে আসে, কিছুক্ষণ পর মেয়ে দুটি খলখল ক'রে তার ঘরে ঢোকে। ঢুকেই একটি মেয়ে বলে, আপনের দেখি বিছনা ভরা বই, আমাগো লইয়া শুইবেন কই?

খিলখিল ক'রে হাসে মেয়েটি।

আরেকটি মেয়ে বলে, বইই বোধয় সাবের বউ, সাবের আবার মাইয়ালোকের দরকার কি?

হাসান বলে, দেখছো তো আমার দুটি মেয়েলোক লাগে, একটিতে হয় না।

প্রথম মেয়েটি বলে, এইটা ভাইব্যাই আমরা তাজ্জব হই, দুইটা মাইয়া দিয়া আপনে কি করবেন? একটা লইয়া লোকজন পারে না, সারারাইতের জইন্যে নিয়া একঘণ্টা পরই বাইর কইর‍্যা দেঅনের লিগা অস্থির হইয়া ওঠে।

হাসান কেরুটা খোলে, একটা তীব্র দুর্গন্ধ এসে তার রক্তে ধাক্কা দেয়; তবু সে তিনটি সবুজ-শাদা শস্তা গেলাশে কেরু ঢালে, পানি মেশায়।

নিজে একটু চুমুক দিয়ে বলে, তোমরা নাও।

মেয়ে দুটি বিছানার ওপর ব'সে গেলাশে চুমুক দেয়।

হাসান এক চুমুকে গেলাশটি শেষ ক'রে আবার গেলাশ ভরে, চুমুক দেয়; এবং মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে বলে, তোমাদের নাম আমি জানি না।

একটি মেয়ে বলে, আমার নাম সুন্দরী।

হাসান বলে, তোমার আমি নাম দিলাম কংকাবতী।

মেয়েটি বলে, কি নাম দিলেন, নামটা ত সোন্দর।

হাসান বলে, কংকাবতী।

মেয়েটি বলে, আইজ থিকা আমি কংকাবতী, নামটা ভুলুম না, নামটা আমার সোন্দর লাগতেছে।

হাসান আরেকটি মেয়েকে বলে, তোমার আমি নাম দিলাম আফ্রোদিতি।

মেয়েটি বলে, কি নাম কইলেন? খুব কঠিন আর সোন্দর লাগতেছে ত।

হাসান বলে, আফ্রোদিতি।

মেয়েটি বলে, তাইলে আমিও আইজ থিকা আফরদিতি।

হাসান জিজ্ঞেস করে, আমাকে কেমন লাগছে তোমাদের?

কংকাবতী বলে, খুব ভাল মনে হইতাছে; অন্য পুরুষগো মতন লাগতেছে না। তারা ত ঘরে ঢুকাইয়াই ছিইর‍্যাফাইর‍্যা শুরু কইর‍্যা দেয়।

হাসান বলে, তোমরা কি জানো একধরনের মানুষ আছে, যারা কোনো অপরাধ করে নি, তবু তারা অপরাধী, তারা সবচেয়ে সুস্থ, তবু তারা সবচেয়ে বড়ো পাগল, এতোবড়ো পাগল আর নেই?

কংকাবতী আর আফ্রোদিতি গেলাশে চুমুক দিতে দিতে বলে, না ত, এমুন মাইনষের কথা আমরা শুনি নাই। অপরাধ না করলে আবার অপরাধী হইব কেন, পাগল না হইলে আবার পাগল হইব কেন?

হাসান বলে, আমাকে দেখো, আমি সেই মানুষ।

তারা চমকে ওঠে, অ্যা, আপনে পাগল? আপনেরে দেইখ্যা ত পাগল মনে হইতেছে না, আপনেরে ত ভাল মানুষ মনে হইতেছে।

হাসান বলে, যাদের দেখে পাগল মনে হয়, তারা গভীর পাগল নয় পবিত্র পাগল নয় বিশুদ্ধ পাগল নয়; তারা পাগলদের নকল, গভীর বিশুদ্ধ পবিত্র পাগল দেখে কখনো পাগল মনে হয় না।

কংকাবতী বলে, আমারে আরেক গেলাশ দেন, সাব, জিনিশটা টানতে আমার ভাল লাগতেছে। আপনে পাগল হইলে আমিও পাগল; আইজ রাইতে আমার পাগল হইতে ইচ্ছা লাগতেছে।

আফ্রোদিতিও বলে, আমারেও আরেক গেলাশ দেন, সাব, এমুন রাইত আর পামু না এমুন রাইত আর আইব না, এত ভাল পাগল আর পামু না; দুনিয়াতে একটাও খাঁটি পাগল দ্যাখলাম না।

হাসান তাদের গেলাশে কেরু ঢালতে ঢালতে বলে, আমি তোমাদের সাথে আজ রাতে কবিতা দিয়ে করবো, সেইটা দিয়ে না; কবিতা দিয়ে তোমাদের স্তন ছোঁবো ঠোঁট ছোঁবো কবিতা দিয়ে তোমাদের ভেতরে নামবো, এতো ভেতরে নামবো যেখানে কখনো কেউ নামে নি।

আফ্রোদিতি গেলাশে চুমুক দিতে দিতে বলে, যা দিয়া ইচ্ছা আপনের তা দিয়াই করেন, আমাগো ভালই লাগতেছে, তয় দেইখ্যেন আমাগো যেন কোনো ক্ষতি না হয়, ছিররাফাইররা না যায়।

হাসান তার পোশাক খুলে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

মেয়ে দুটি একবার চমকে ওঠে; তার শিশ্নের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হাসান বলে, তোমরাও হও, আমার মতো নগ্ন পবিত্র শুদ্ধ আদিম, আমার মতো কবি।

কংকাবতী বলে, বাত্তি জ্বালাইয়া এমন হইতে আমাগো শরম লাগে, সাব।

হাসান বলে, নগ্নতা সুন্দর, নগ্ন না হ'লে মানুষ পবিত্র হয় না, নগ্নতায় লজ্জা নেই, তোমরা কবিতার বোন, কবিতার মতো নগ্ন কবিতার মতো শুদ্ধ, কবিরা চিরকাল তোমাদের বন্দনা করেছে, আলোঅন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য নেই তোমাদের রক্তে, আলোই অন্ধকার, আলোর অন্ধকারেই তোমাদের আমি নগ্ন পবিত্র বিশুদ্ধ সুন্দর দেখতে চাই। আমি তোমাদের দেখতে চাই, তোমাদের কেউ দেখতে চায় না, তোমাদের স্তনবৃন্তের দিকে কেউ তাকায় না, তোমাদের গ্রীবার জ্যোৎস্নার দিকে কেউ তাকায় না, সবাই তোমাদের মাংস খেতে চায়।

মেয়ে দুটি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে মাথা নিচু ক'রে বিছানায় ব'সে থাকে।

হাসান বলে, নগ্নতা মাথা নিচু ক'রে থাকার জন্যে নয়, কংকাবতী; নগ্নতা লজ্জা পাওয়ার জন্যে নয়, আফ্রোদিতি।

হাসান একটি বস্তু দেখিয়ে বলে, এ হচ্ছে পবিত্র ভ্রাতা।

কংকাবতী আফ্রোদিতি সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

হাসান একটি বস্তু দেখিয়ে বলে, এ হচ্ছে বিশুদ্ধ ভগিনী।

কংকাবতী আফ্রোদিতি কেঁপে ওঠে।

হাসান তাদের প্রসারিত অঞ্চলে হাত বুলিয়ে বলে, এ হলো সবুজ তৃণভূমি; এখানে তৃণ ঘাস থাকার কথা ছিলো, কেনো নেই?

মেয়ে দুটি হাসে, তাদের হাসিতে ঘাস গজিয়ে ওঠে।

হাসান মন্দিরের দরোজায় হাত রেখে বলে, এটা হচ্ছে দেবীমন্দির, এই মন্দিরে সবাই পুজো দেয়, সবাই মাথা নত ক'রে। আমি পূজারী।

মেয়ে দুটি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

হাসান বিছানায় উঠে তাদের মাঝখানে ব'সে বই খুলে জীবনানন্দের 'অন্ধকার' কবিতাটি পড়তে থাকে, তার স্বরে মেয়ে দুটি মুখ তুলে হাসানের দিকে তাকায়।

হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি, অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি। কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি। হে নর, হে নারী, তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনোদিন; আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।

কংকাবতী গেলাশে চুমুক দিতে দিতে জড়ানো স্বরে বলে, আপনে কি পরতেছেন বোঝতে পারতেছি না, তয় মনে হইতেছে আমি পুকইরের কালা পানির ভিতর সাতর কাটতাছি, ডুবাইতে ডুবাইতে পুকইরের মইদ্যে গিয়া শাপলাফুল তোলতাছি, আমার উপর মেঘ পরতেছে, আমার চুল ভাইস্যা যাইতাছে। সাব আপনে পরেন, রাইত ভইর‍্যা পরেন।

কংকাবতী একটি হাত দিয়ে জড়ায় হাসানকে; ওর শরীর থেকে ধূমায়িত একটি গন্ধ না সুগন্ধ না রঙ এসে ঢাকতে থাকে হাসানকে।

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত; আমাকে কেন জাগাতে চাও? হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া, আমাকে জাগাতে চাও কেন।

আফ্রোদিতি কাঁপা কাঁপা হাতে হাসানের ঠোঁট ছোঁয়, হাসানের স্বর্গীয় অরণ্যের তলদেশে সোনালি সাপের ফণায় গিয়ে যেনো ওর আঙুল লতাগুল্মজালে জড়িয়ে পড়ে, সে জড়ানো গলিত স্বরে বলে, আমার মনে হইতেছে গোস্তের ভিতর আগুন জ্বলতেছে, আমার দেহে আর গোস্ত নাই, সব পুইর‍্যা আগুন হইয়া জ্বলতেছে, সাবরে জরাইয়া ধইর‍্যা আমার পদ্মানদীর ঢেউয়ের লগে ভাইস্যা যাইতে ইচ্ছা হইতাছে, সাব, আপনে আমারে ধরেন, আমার সবখানে আপনের হাত দেন, গলায় কামড় দেন, শিনায় কামড় দেন, সবখানে আপনের দাত বসাইয়া দেন।

অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠব না আর; তাকিয়ে দেখব না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে কীর্তিনাশার দিকে। ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব– ধীরে– পউষের রাতে– কোনোদিন জাগব না জেনে– কোনোদিন জাগব না আমি– কোনোদিন আর।

কংকাবতী বলে, আরও পরেন, সাব, মেঘ হইতাছে বাজ ডাকতাছে, ঘরের চাল উইর‍্যা যাইতাছে।

হাসান বলে, কংকাবতী আফ্রোদিতি, তোমাদের পূর্ণিমাজ্বলা স্তনের দিকে তাকিয়ে দেখো, তোমাদের স্তন পদ্মার নৌকোর পালের মতো ফুঠে উঠছে, পালে আষাঢ় শ্রাবণের ঝড় ঢুকছে বৃষ্টি ঢুকছে।

হাসান বিপর্যস্ত মাঝির মতো পালগুলো স্পর্শ করে, দড়ি টেনে টেনে যেনো মাস্তুলের শীর্ষে তুলতে থাকে; একটি পাল থেকে আরেকটি পালে যেতে থাকে, তার আঙুল আর ওষ্ঠ শ্রাবণ হয়ে বয়ে যেতে থাকে– পাল থেকে নৌকোয়, ছইয়ে, গলুইয়ে, সমস্ত বাঁকে, এবং সে দেখে তার নোঙর কোনো গভীর অতলে ডুবে যাওয়ার জন্যে অনন্ত কাল ধ'রে যেনো অপেক্ষা ক'রে আছে।

কংকাবতী জিজ্ঞেস করে, পাল কারে কয়?

হাসান বলে, নৌকোর বাদাম, এই যে দুটি বাদাম।

আফ্রোদিতি বলে, এমুন কইর‍্যা বাদাম আগে কোনোদিন ফোলে নাই।

কংকাবতী বলে, আমার বাদাম থরথর কইর‍্যা কাঁপতেছে, গাঙে তুফান আসছে, এমুন তুফান আর আসে নাই।

হাসান বলে, তোমাদের শরীর সোনার গাছের মতো ঝলমল করছে। তোমরা সোনার গাছ, তোমাদের ভেতর দিয়ে বয়ে চলছে আঙুরের লাল কামনা। মানুষ হচ্ছে সোনার গাছ, তার শিরায় শিরায় রক্ত নয় বয়ে চলে আঙুর।

আফ্রোদিতি বলে, প্রত্যেক রাইতে আপনেরে লইয়া আমার থাকনের ইচ্ছা হইতেছে, তয় আপনেরে ত পামু না। আপনে বলছিলেন আপনে পাগল, নিজেরে আমার মনে হইতেছে পাগলি। আমি পাগলি, আমারে ধইর‍্যা যা ইচ্ছা করেন, ছিইর‍্যা ফালান, ভাইঙ্গা ফালান, আমি জ্বইল্যা যাইতেছি।

কংকাবতী বলে, রাইত য্যান না ফুরায়, আমার য্যান ঘোম না আসে।

হাসান ঘুমের ঘোরে নোঙর ফেলতে থাকে, সে এক সোনার নৌকো থেকে আরেক সোনার নৌকোয় গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে, নৌকোর ছইয়ে উঠতে থাকে, গলুইয়ে

গিয়ে বৈঠা বাইতে থাকে, এক নদী থেকে যেতে থাকে আরেক নদীতে হাজার বছর ধ'রে অনন্ত বৃষ্টিতে অনন্ত অন্ধকারে অনন্ত চাঁদের তলে, সে গ'লে যেতে থাকে জলের মতো, আবার নোঙর হয়ে উঠতে থাকে, নোঙর ফেলতে থাকে, তীর ভেঙে পড়তে থাকে নদী তোলপাড় ক'রে।

আলোটাকে এক সময় হাসানের কাছে মনে হয় অশ্লীল অসভ্য অন্ধকার, কেঁপে কেঁপে উঠে সে আলোটা নিভিয়ে দেয়, অন্য আলো ছড়িয়ে পড়ে।

দুটি নদীর মিলনস্থলের মতো সে আবার প্রবেশ করে, তার মনে হ'তে থাকে সে কখনো মানুষ ছিলো না, ছিলো হয়তো কোনো বন্যপ্রাণী, সবুজ জঙ্গলের পাতার আদরে সে হাজার হাজার বছর ধ'রে বেড়েছে, গুহায় বাস করেছে, কাদায় গড়িয়েছে অনন্ত কাল; হয়তো সে ছিলো নদী, বা পুকুর, বা ধানখেত, বন্যশুয়োর বা মত্ত হাতি বা ক্ষুধার্ত বাঘ।

ভোর হয়ে এলে কংকাবতী বলে, যাইতে ইচ্ছা করতেছে না, এই দিকে ভোর হইয়া আসতেছে।

আফ্রোদিতি বলে, এমুন রাইত আর আসব না, যত দিন বাচুম এই রাইতরে মনে করুম।

হাসান বলে, আমার জীবনেও আসবে না; তোমরা আবার এলেও এ-রাত আর আসবে না। তোমাদেরও আমি আর কোনো রাতে চাই না।

মেয়ে দুটি একটু আহত বোধ করে।

আফ্রোদিতি বলে, আমাগো আপনে ঘিন্না করতেছেন, সাব?

হাসান বলে, না, না, ঘেন্না নয়। তোমাদের নিয়ে আজ রাতে আমি একটি শরীরের কবিতা লিখেছি, পবিত্র অপরাধ করেছি, যা আমি আর কোনোদিন লিখতে পারবো না কোনোদিন করতে পারবো না।

কংকাবতী আফ্রোদিতি বেরিয়ে যায়, হাসান বিছানায় গড়াতে থাকে।

রাতভর কি তুমি অন্ধকার অপবিত্র অপরাধ করেছো, হাসান? নিজেকে সে জিজ্ঞেস করে। তোমার কি মনে হচ্ছে অপরাধ করেছো তুমি? অপবিত্র দূষিত পাপী তুমি? না, আমার তা মনে হয় না; হাসান, তুমি যা করেছো, তা পবিত্র শুদ্ধ, সন্তরা ওই শুদ্ধতার ছোঁয়া পাবে না কখনো। তুমি কি ক্লান্তি বোধ করছো? না। ক্লান্তি আর কিছু নয়, অন্ধকার অপরাধবোধ; যদি তুমি ক্লান্তি বোধ করতে, এই আশ্চর্য নদী নৌকো পাল নোঙর শ্রাবণের রাতটি যদি ভোরবেলা চেপে ধরতো তোমাকে, তাহলে বুঝতে হবে তুমি সারারাত পবিত্র শুদ্ধতায় ছিলে না, ছিলে অপবিত্র অপরাধবোধের মধ্যে; মাংস তাহলে হতো তোমার কাছে পুরোনো গ্রন্থের পাপ, রক্ত হতো তোমার কাছে আদিম অপরাধ; মানুষের মাংস রক্ত কখনো অশুদ্ধ হয় না অপবিত্র হয় না। মাংস রক্ত নিয়ত পবিত্র নিয়ত বিশুদ্ধ।

কয়েক দিন সে আর আড্ডায় যায় না, মনে হয় বাচালতায় আবর্জনায় গিয়ে সে ডুবে যাবে, মাথা আর বুকে পঙ্ক জমবে; সে ঘর থেকে বেরোয় শুধুই বিকেলে, একা

একা পথে পথে হাঁটে, মানুষের মুখের দিকে তাকায়, পথে পথে একটি-দুটি কবিতার পংক্তি পায়, ঘরে ফিরে আসে, এবং পংক্তিগুলোকে কবিতায় পরিণত ক'রে ক'রে মধ্যরাত পেরিয়ে যায়।

কবিতাগুলো তার কাছে বিস্ময়কর আসতে থাকে।

একটি পংক্তি হয়তো সে পেয়েছে গুলিস্থানের মোড়ে দাঁড়িয়ে, পংক্তিটি মাথায় নিয়ে হাঁটছে, আর কোনো পংক্তি আসছে না, আটকে গেছে মাথায়।

ঘরে ফিরে এসে পংক্তিটিকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েও সে কবিতায় পরিণত করতে পারছে না; কিন্তু তখন অন্য একটি পংক্তি আসছে, অবলীলায় কবিতা হয়ে উঠছে, খাতার পাতাটির দিকে তাকিয়ে থাকছে সে অনেকক্ষণ।

কবিতা কি এলোমেলো পাগল পংক্তির সমষ্টি, নিরর্থ প্রলাপ? হঠাৎ গুনগুনিয়ে উঠলো যে-পংক্তিটি, যেটি মুগ্ধ করলো আমাকে, সেটির সাথে আরো কয়েকটি ময়লা পংক্তি জুড়ে দেবো আমি?

না। কবিতা এলোমেলো পাগল পংক্তির সমষ্টি নয়। কবি পাগল হ'তে পারে, বদ্ধ পাগল, কিন্তু কবিতা পাগল হবো না, কবিতা ধাঁধা নয়।

কবিতা হবে সম্পূর্ণ কবিতা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কবিতা, আমি সম্পূর্ণ কবিতা চাই, সম্পূর্ণ কবিতা লিখতে চাই।

কবিতা হবে অভাবিত প্রগাঢ় চিত্রকল্পমালা, চিত্রকল্পের অগ্নোৎসব।

একটি একটি ক'রে অবলীলায় ও সংশোধন ও সংশোধন ক'রে এবং অবলীলায় কয়েক দিনের মধ্যে সে একগুচ্ছ সম্পূর্ণ কবিতা লিখে ফেলে।

তোমাদের কোনো মূল্য নেই, তোমরা সাবান টুথপেস্ট নও চটি জুতো আন্ডারওয়ার নও কয়লার টুকরো পাউরুটি নও ধানের গুচ্ছ নও, তোমাদের কোনো দাম নেই, তবে আমার কাছে তোমরা মূল্যবান। হাসান মনে মনে বলে।

কয়েক দিনে ধ'রেই হাসানের মনে পড়ছে আলাউদ্দিন রেহমানকে, যে তাকে প্রথম অনুপ্রাণিত করেছিলো নিজেকে ভাঙতে, সে মোহাম্মদ আবুল হোসেন তালুকদার থেকে হয়ে উঠেছিলো হাসান রশিদ। আলাউদ্দিন রেহমান, যে ঝকঝকে কথা বলতো সিগারেট টানতে টানতে চায়ের কাপ ঠোঁটে লাগাতে লাগাতে, দু-একটি ঝকঝকে কবিতাও– কবিতার পংক্তিও লিখেছিলো, অধ্যাপক আহমদ আলির সাথে গোলমালের ফলে যে তৃতীয় শ্রেণী পেয়েছিলো, তাকে আর কবিতার আড্ডায় পাওয়া যায় না, মাঝেমাঝে শুধু তার নাম ওঠে ঝ'রে পড়া পাতার মতো; সে এখন অ্যাড গার্মেন্টস ইন্ডেন্টিং, সে আর কবিতা লেখে না। তার ঝকঝকে কালো রঙ আর থলথলে স্বাস্থ্য ঝিলিক দেয় হাসানের চোখে। তার টেলিফোন নম্বরটিও জোগাড় করেছে হাসান, কিন্তু টেলিফোন করা হয় নি; টেলিফোন করার কথা মনে হ'লেই কষ্ট লাগে, আলাউদ্দিন আর কবিতা লেখে না, কবিতার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই, তাকে আর টেলিফোন করা হয় না।

একদিন হাসান তাকে টেলিফোন করে।

আলাউদ্দিনকে পেতে বেশ কষ্ট হয়– প্রথম একটি মেয়ে টেলিফোন ধরে, তাকে নিজের নাম বলতে হয়;– টেলিফোনে কেউ তার নাম জিজ্ঞেস করলেই সে অস্বস্তি বোধ করে, নিজের নামটা বলার সময় তার মনে হয় সে যেনো সকলের পায়ের নিচে প'ড়ে গেছে, হঠাৎ তুচ্ছতম হয়ে গেছে, তার কোনো নামপরিচয় নেই, অনেকক্ষণ ঠিক করতে পারে না সে কী বলবে– সে কি বলবে 'আমি হাসান রশিদ', নাকি বলবে 'আমার নাম হাসান রশিদ', ঠিক করতে পারে না সে; এক সময় সে বলে, 'আমার নাম হাসান রশিদ', তারপর তাকে পাঁচ মিনিট ধ'রে শুনতে হয় গানবাদ্য, তারপর জানতে হয় স্যার আরেকটি টেলিফোনে কথা বলছেন, এবং শেষে সে আলাউদ্দিনকে পায়। এভাবে পেয়ে হাসান বুঝতে পারে আলাউদ্দিন রেহমান কেনো কবিতার থেকে দূরে আছে।

কিন্তু না, আলাউদ্দিন আগের মতোই আছে; তার কণ্ঠস্বর তাই বলে। তার থেকে আলাউদ্দিন পাঁচ ছ বছরের বড়ো হবে, কিন্তু সে যেভাবে 'দোস্ত' বলে তাতে মনে হয় তাদের একই বয়স।

টেলিফোনেই আলাউদ্দিন হৈহৈ ক'রে ওঠে, আরো দোস্ত, এতকাল পর, কই থিকা কইতে আছো, তাড়াতাড়ি আইসা পড়ো।

হাসান আধঘণ্টার মধ্যেই গিয়ে উপস্থিত হয় আলাউদ্দিন রেহমানের অফিসে। আলাউদ্দিন তাকে জড়িয়ে ধ'রে পাগল হয়ে ওঠে। হাসানের মনে হয় তার অচেনা হয়ে যাওয়া স্যান্ডলের শব্দ যেনো চিনতে শুরু করছে শহর।

আলাউদ্দিন বলে, আরে দোস্ত অনেক দিন তোমারে দেখি নাই। কোন জঙ্গলে পলাইয়া আছিলা এতদিন?

হাসান বলে, ছিলাম এক গভীর সুন্দরবনে।

আলাউদ্দিন বলে, আমি আগেই বুঝছিলাম, কবিতাটবিতা আমার হইব না, অইসব চালাকি কবিতা না; সেইজন্য অ্যাড গার্মেন্টস ইন্ডেন্টিং হইয়া গেলাম। বাপেরও পয়সা আছিলো, আর দেখলাম কবিতায় না লাগলেও ব্যবসায় আমার চালাকি কামে লাগে; আর ট্যাকাপয়সাও একধরনের কবিতাই, মহাকাইব্যও কইতে পারো।

হাসান বলে, না, কবিতা লেখা ছেড়ে তুমি ভালো করো নি।

আলাউদ্দিন বলে, কবিতা লেখন ছাইর‍্যা দিছি, কিন্তু পড়ন ছাড়ি নাই। তোমাগো কবিতা মন দিয়া পড়ি, সুধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ বুদ্ধদেবের কবিতা আইজও আবৃত্তি করি– আমি বিংশশতাব্দীর সমান বয়সী, মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে, বীর নই, যুদ্ধে যুদ্ধে। তোমার কয়টা কবিতা পড়লাম কাগজে, পইড়্যা মন ভইর‍্যা উঠলো। জানোই ত তোমার লগেরগুলির মইধ্যে তোমারেই আমি খাঁটি কবি মনে করি, তোমারেই খাঁটি আধুনিক মনে করি।

হাসান বলে, আমিও অনেক দিন কবিতা লিখি নি, তবে এখন লিখছি, আরো লিখবো, কবিতা আবার ফিরে আসছে।

আলাউদ্দিন বলে, তোমার মইধ্যে খাঁটি কবি আছে, তোমারে কবিতা লেখতেই হইবো, তুমি কবিতা না লেখলে বড় লস হইবো। কবিয়ালে পাগলা কানাইয়ে দ্যাশ ভইর‍্যা যাইতেছে।

সে কবিতা না লিখলে ক্ষতি হবে? কার ক্ষতি হবে? কী ক্ষতি হতো জীবনানন্দ জন্ম না নিলে? তাহলে কি অ্যাড গার্মেন্টস্ ইন্ডেন্টিং বাঙলাদেশ দারোগা পুলিশ মন্ত্রী জজ সাবজজ হতো না? কী লাভ হয়েছে জীবনানন্দ কবিতা লিখেছে ব'লে? কী ক্ষতি হয়েছে কেরামত আলি চাকলাদার কবিতা লেখে নি ব'লে?

হাসান বলে, তুমি কবিতা লিখছো না কেনো? তুমি ভালো লিখতে, তোমার ঝকঝকে পংক্তি আমার ভালো লাগতো। বাঙলায় কিছু ঝকঝকে কবিতাও দরকার, পানসে ম্যাদা পান্তা পদ্যে বাঙলা কবিতা ভ'রে আছে।

হৈহৈ ক'রে চারপাশ কাঁপিয়ে তোলে আলাউদ্দিন; চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে এসে একবার হাসানকে জড়িয়ে ধরে। আলাউদ্দিন আরো মাংসল হয়েছে।

আলাউদ্দিন বলে, আরো দোস্ত, আমি যে কবিতা লেখা ছাইর‍্যা দিছি, এইতেই বোঝতে হইবো আমি কবিতাটবিতা বুঝি, যার হইবো না তার ঠিক সময়ে ছাইর‍্যাা দেওনই প্রতিভার লক্ষণ। বাজে কবিতা লেখনের থিকা অ্যাড গার্মেন্টস ইন্ডেন্টিং করন অনেক ভাল, বাঙলার কবিগুলি এইকথা বোঝে না। সুধীন্দ্রনাথ ছাইর‍্যা দেয় নাই? সমর সেন ছাইর‍্যা দেয় নাই? তারা বোঝছে আর কবিতা হইবো না, তাই ছাইর‍্যা দেওনই ভাল; কিন্তু এইকথা বিষ্ণু দে থিকা জসীমদ্দিন বোঝে নাই। আর দ্যাখো না দ্যাশে ষাইট সত্তরটা মূর্খ চিকনচাকন লাইন লেইখ্যাই চলছে, বোঝতে পারছে না অইগুলি ড্রেনের ময়লার থেইক্যা বেশি ময়লা।

হাসান বলে, তুমি তো ভালো ক'রে শুরুই করো নি।

আলাউদ্দিন বলে, এইখানেই ত আমার উইজডম ধরা পড়ে, শুরুতেই বুজছি হইবো না। তুমি আড্ডায় গিয়া দ্যাখো, পোলাপানগুলিন দাড়ি রাখতেছে, ময়লা কাপড় পরতেছে, গাজা টানতেছে, বেশ্যাবাড়ি যাইতেছে, বইপড়া ছাইর‍্যা দিছে, ভুল বাঙলায় লম্বাচিকন লাইন লেখতেছে, মাইয়ালোকের দুই চাইরটা উচানিচা জায়গার নাম লইতেছে, ছাপাইতেছে, ভাবতেছে কবি হইতাছে। কিন্তু অইগুলির একশোটার মইধ্যে দুইটাও কবি হইবো না এইকথা বোঝতে পারতেছে না।

হাসান বলে, একশোটির মধ্যে একটি বা দুটি কবি হবে, তার জন্যে ওই আটানব্বই নিরানব্বইটাও দরকার; অনেকে নষ্ট না হ'লে একটি দুটি কবি হ'তে পারে না। এটা মাছের ডিমের মতোই, পশুর বাচ্চার মতোই।

আলাউদ্দিন ঘণ্টা বাজাতেই একটি মেয়ে হাঁসের বাচ্চার মতো ঘরে ঢোকে।

আলাউদ্দিন বলে, ম্যাডাম মরিয়ম, আইজ আমার আনন্দের দিন বার্থ ডের মতন, অনেক বছর পর আমার পয়েট ফ্রেন্ড আসছে, তারে একটু মালটাল ঢাইল্যা দিয়া খুশি করো। চাইয়া দেখো এই কবির দিকে, দ্যাশের বড়ো পয়েট হইবো বিশ বচ্ছর পর, তখন বলতে পারবা তার গেলাশে তুমি মাল ঢাইল্যা দিছিলা।

মরিয়ম বেশ ঝলমলে, তার সব কিছু দোলে; হাসানকে সালাম দেয়ার সময় তার বাহু আর বিভিন্ন অঙ্গ ঢেউয়ের মতো দুলে ওঠে, সব কিছু দুলিয়ে সে আলমারি থেকে ব্ল্যাক লেবেলের বোতল বের করে; ধবধবে শাদা গেলাশে সোনালি পানীয় ঢেলে

তাদের সামনে রাখে। কেরুর থেকে এটা কতোই ভিন্ন কতোই উজ্জ্বল। হাসানের চোখে একবার দুলে ওঠে কংকাবতী আফ্রোদিতি।

আলাউদ্দিন মরিয়মকে বলে, ম্যাডাম অইদিকে জানাই দেও আমি বিজি আছি, এখন কোনো লোক না কোনো ফোন না।

মরিয়ম ফোনে সংবাদটি ঠিক জায়গায় পৌছে দিয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে থাকে।

আলাউদ্দিন বলে, ম্যাডাম, চাইলে তুমিও একটু খাও।

মরিয়ম ঢেউ তুলে বলে, আমি রাইতে খাব।

তারা দুজন পান শুরু করে, হাসান পানীয়র সাথে একটি ব্যাপক দোলনও পান করতে থাকে।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, তুমি বলছিলা মাছের আন্ডার মতন কুত্তার বাচ্চার মতন অনেকগুলি নষ্ট হইয়া একটা দুইটা কবি হইয়া বাইর হয়, ঠিক কথাই কইছো, কিন্তু আমি অই পাঁচটা কুত্তার বাচ্চার চাইরটার মইধ্যে পড়তে চাই নাই। তাতে কি হইতো? কবিও হইতাম না, এইদিকে না খাইয়া মরতাম, ব্ল্যাক লেবেলের বতলের কাছেও যাইতে পারতাম না।

না খেয়ে মরার কথায় নিজের দিকে তাকায় হাসান। সেও কি মরবে না খেয়ে? আলাউদ্দিন খুবই চমৎকার আছে, এমন চমৎকার থাকলে কবিতার কোনো দরকার পড়ে না হয়তো; বা কবিতা থেকে খুবই দূরে থাকলে মানুষ এমন চমৎকার থাকে। ঝকঝকে পংক্তি লিখতে থাকলে আলাউদ্দিনের সব কিছু আজ এমন ঝকঝক করতো না, কোনো মরিয়ম দোলা ছড়াতো না; সে হয়তো কোনো দোস্তের অফিসে গিয়ে নিজের ভেতরের ময়লা খুঁটতে খুঁটতে পানটান করতো।

কবি, হায়, কুঁড়েঘরে বাস ক'রে শিল্পের বড়াই!

হাসান বলে, আমাকেও না খেয়ে থাকতে হবে, আলাউদ্দিন।

আলাউদ্দিন জিজ্ঞেস করে, তুমি কি করছো আইজকাইল, দোস্ত?

হাসান বলে, কিছুই করি না, একটা কলেজে ছিলাম, ছেড়ে দিয়েছি।

আলাউদ্দিন বলে, আরো দোস্ত, তুমি দেখি লাইফেও পয়েট হইয়া ওঠতেছো, এইটা কবিতার জইন্যে ভাল না। এইটা অনাহারী কবিগো টাইম না, ছিঁড়া পাঞ্জাবি পরা কবিগো এইজ এইটা না; টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরির এই ডিকেডের কবি হইবো মডার্ন, তার লাইফস্টাইলও হইবো মডার্ন। তার গাড়ি থাকতে হইবো, তাকে ব্ল্যাক লেবেল খাইতে হইবো, রাইতে বাড়ি ফিরার সময় তাকে দেখতে হইবো শোনতে হইবো এভরি স্ট্রিট-ল্যাম্প: দ্যাট আই পাস বিট্‌স্ লাইক এ ফ্যাটালিস্টিক ড্রাম। বোঝলা ল্যাম্পপোস্টের বাইদ্য শোনতে হইবো, ট্রাকরে ফুলের মালার মতন দেখতে হইবো, সন্ধ্যাটারে ইথারে অজ্ঞান রোগীর মতন আকাশে ছরাইন্যা দেখতে হইবো। দাড়িমুখে সারিগান লাশরিকাল্লা, পাল তুলে দাও ঝাণ্ডা উড়াও, এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কাল কালর যুগ আর নাই, দোস্ত।

হাসান বলে, গ্রামের কলেজে আমি ম'রে যাচ্ছিলাম, তিন বছর আমি কবিতা লিখি নি, একটি পংক্তিও মাথায় আসে নি। ঢাকা থেকে দূরে ছিলাম, তাই কবিতা থেকেও দূরে ছিলাম।

আলাউদ্দিন বলে, তুমি ত পল্লীকবি হইতে যাইতেছ না যে অই গাছপালা সোনাই রুপাইর মধ্যে কবিতা পাইবা। ঢাকার বাইরে আইজ কবিতা নাই।

হাসান বলে, তুমি তো জানোই আমার ওসব হবে না, আমি ওই মহান অক্সফোর্ডের উপযুক্ত নই।

আলাউদ্দিন বলে, তোমার লগে যেইটা সেকেন্ড হইলো সেইটা ত অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর হইয়া ফাল ফারতেছে, মওলবি নজিবর রহমান আর কায়কোবাদরে লইয়া একাডেমিতে পরবন্ধ পরতেছে, বলতেছে তাগো মতন মহৎ ঐপন্যাসিক আর মহাকবি নাকি নাই। অইটারে তুমি অক্সফোর্ড বলতেছ? ফোর্ড আর নাই, খালি অক্সগুলি আণ্ডা দুলাইয়া শিং উচাইয়া গুতাগুতি করতেছে।

হাসান বলে, ইউনিভার্সিটি ওই নজিবর রহমান কায়কোবাদঅলাদের জন্যেই, আমার জন্যে নয়। কবি ঔপন্যাসিকের জন্যে ওই দুর্গ নয়, ওটা সংঘবদ্ধদের জন্যে।

আলাউদ্দিন বলে, তোমার হইবো ক্যান? তুমি ত জমিরালি পরাগালির বাসায় বাজার কইর‍্যা দেও নাই, তাগো পোলামাইয়ারে চুয়িংগাম কিন্না খাওয়াও নাই, তাগো পায়ের ধুলা মাথায় মাখো নাই, তাগো লইয়া তিনখানা ভাঙাচুরা পরবন্ধ লেখো নাই। তুমি কবি হইছো, তুমি বলি হইয়া গেছো।

হাসান বলে, কিন্তু আমি হয়তো কবি হবো না, কুকুরবাচ্চার মতোই নষ্ট হবো, আমি হয়তো কিছুই হবো না।

আলাউদ্দিন বলে, চলো দোস্ত, তোমারে একটু ভালমন্দ খাওয়াই আনি। লাঞ্চটা আমি অই চাইরতারাই করি। কবিতা ছাইর‍্যা ট্যাকা করতেছি ত চাইরতারা পাচতারায় যাওনের লিগাই, এইতে কবিতা ছারনের কষ্টটা একটু কমে– কি বুঝিতে চাই আর জানি না কি আহা, সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের।

আলাউদ্দিন রেহমানের শীততাপমেঘবৃষ্টিকুয়াশাশিশিরকবিতাচিত্রকল্পনিয়ন্ত্রিত পাজেরোতে ওঠার সাথে সাথে একটা অদ্ভুত অপরিচিত অনামা আরাম ধাক্কা দেয় হাসানকে; যে-ট্রাকটি তার রিকশার পেছনে এসে গোঁ গোঁ ক'রে থেমেছিলো, তার মতো নয়, সেই দয়াময় ট্রাক একটি পংক্তি তাকে উপহার দিয়ে কবিতা লিখতে বলেছিলো, আর এই স্বপ্নকল্পনাআবেগসৌন্দর্যনিয়ন্ত্রিত পাজেরো তার ভেতর থেকে সব পংক্তি টেনে বের ক'রে নিয়ে নর্দমায় ফেলে দিতে চায়, বলে কবিতাঠবিতা ভুইল্যা যাও ভালো থাকবা। হাসান অনভ্যাসবশত একটু কাত হয়ে বসেছিলো, কাত হওয়ার সাথে সাথে অভাবিত আরামটা একগুচ্ছ ছুরির মতো গেঁথে যায়, তার মাংসে পাছার ভেতরে; সে পিঠটা টেনে নেয়, তার মনে হয় পিঠ পেছনে ঠেকিয়ে বসলেই গুচ্ছ গুচ্ছ ছুরিকার আক্রমণে কবিতার কথা তার মনে থাকবে না, ছন্দ আর চিত্রকল্প সে ভুলে যাবে, সে

অপরূপ অ্যাড গার্মেন্টস ইন্ডেন্টিং হয়ে উঠবে। সে শক্ত হয়ে ইস্কুলের বেঞ্চে ক্লাশ ফোরের ছাত্রের মতো বসে।

হাসান বাইরে তাকিয়ে একটি ভাঙাচোরা রিকশা দেখতে পায়, রিকশাটাকে তার বদলেয়ার র‍্যাবো মালার্মে রবীন্দ্রনাথের মতো মহানুভব মনে হয়, রিকশাকে সে গোপনে বলে, বিষণ্ন রিকশা, করুণ রিকশা, অনির্বচনীয় রিকশা, ডানাভাঙা রিকশা আমাকে একটি চিত্রকল্প দাও, অন্তত একটা ছেঁড়াফাড়া কবিতা দাও। আমার মানসসুন্দরী নেই, ধর্ষিত বিপন্ন ব্যথিত রিকশা, তুমি হও আমার ক্ষণিক মানসসুন্দরী।

পাজেরো শাই শাই ক'রে চলতে থাকে, আটকে যেতে থাকে, বলতে থাকে, অ্যাড গার্মেন্টস্ ইন্ডেন্টিং চারতারা পাঁচতারা ব্ল্যাক লেবেল অ্যাড গার্মেন্টস্ ইন্ডেন্টিং চারতারা পাঁচতারা ব্ল্যাক লেবেল মরিয়ম মরিয়ম মরিয়ম।

রিকশা বলে, আমি শিক আর টায়ার আর প্যাডেল, আমি বদলেয়ার র‍্যাবো মালার্মে রবীন্দ্রনাথ নই, এমনকি আমি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মানকুমারী বসুও নই, মানসসুন্দরী নই, আমার ভেতরে কোনো কবিতা নেই, আমি তোমাকে কবিতা দিতে পারবো না।

বাঁ পাশের সিনেমা হলটি নাভি খুলে মাজা বাঁকিয়ে হাসানের কানে কানে বলে, আমি তোমাকে কবিতা দিতে পারবো না, আমি ব্যানার, জোড়া জোড়া নগ্ন স্তন, স্থূল উরু, স্তনবাঁক, চিজ বাড়ি হায় মস্ত্ মস্ত্।

ডান পাশের ভিডিওর দোকানটি ন্যাংটো হয়ে যায়, ঝনক ঝনক ক'রে বুক দাপাতে থাকে, অট্টরোলে বলে, হা হা হা হা, কবিতা কারে বলে মিয়া? অইটা আবার কি জিনিশ, কি মাল? পিরথিমিতে অইটার কি দরকার? অইটায় কয় কেজি সেক্স? তু চিজ বড়ি হায় মস্ত মস্ত।

মুক্তি ক্লিনিকটি দুই পা ফাঁক ক'রে দু-দিকে ছড়িয়ে দিয়ে গোঙাতে থাকে, এমআর এমআর এমআর, এমআর দিতে পারি, তোমারে কবিতা দিতে পারি না। তুমি কি এমআর করাইবা? আসো, চিৎ হইয়া শোও, তিন মিনিটে ভিতরের কবিতার সব ফিটাস ফালাইয়া দিমু, আধঘণ্টায় বাড়িতে হাইট্যা চইল্যা যাইবা।

হাসান দেখতে পায় ঝাঁকে ঝাঁকে দলবেঁধে সবাই এসে বলছে, তারা তাকে কবিতা দিতে পারবে না।

নৌকো ছেঁড়া পাল উড়িয়ে এসে তার সামনে থামে, বলে, তুমি কোথায় যাচ্ছো, হাসান? তোমাকে আমি কবিতা দিতে পারবো না। যাও, তুমি অপরূপ অ্যাড গার্মেন্টস্ ইন্ডেন্টিং হইয়া যাও, সেইখানে চাইরতারা পাঁচতারা ব্ল্যাক লেবেল মরিয়ম মরিয়ম মরিয়ম।

একঝাঁক কাক উড়ে যেতে যেতে বলে, তোমাকে আমরা কবিতা দিতে পারবো না, হাসান, তুমি যেখানে যাচ্ছো সেখানে অনেক মাল আছে, কবিতা নেই, সেইখানে আমাগো মতো কাউয়ারাই আছে।

নদী বয়ে যাচ্ছে, তার ঢেউ বলছে, তোমাকে কবিতা দিতে পারবো না; তোমার ভেতর থেকে আমি কবিতা টেনে বের ক'রে আনবো, তোমার ভেতরে আমি চর পড়াবো, ধুধু বালুচর।

হাসান কি চিৎকার ক'রে উঠবে? সে চিৎকার ক'রে উঠতে যাচ্ছিলো, একটা চিৎকার তার গলায় এসে গমগম শুরু করতে যাচ্ছে, এমন সময় পাজেরো গিয়ে ঝলমলে চারতারার সামনে মসৃণভাবে থামে।

হাসান পাজেরো থেকে নেমে সালাম স্যালুট লাল কার্পেটে অদ্ভুতভাবে অসুস্থ বোধ করে, ভেতরে গেলে রোগটা নোংরা ঢলের মতো তার শরীর উপচে বইতে থাকবে ব'লে মনে হয়; সে ফিরে দাঁড়ায়, বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায়।

আলাউদ্দিন বলে, আরে দোস্ত, কোন দিকে যাইতাছো, অইটা ত রাস্তার দিক।

হাসান একটু লজ্জা পেয়ে ঘুরে আলাউদ্দিনের পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকে।

আলাউদ্দিনের অ্যাড ২০০০-এ হাসানের একটি কাজ হয়ে যায়।

হাসান এ-কাজের এবং কোনো কাজের কথাই ভাবে নি; কবিতা ছাড়া কিছুই ভাবছিলো না সে, কিন্তু ভেতরে কী একটা যেনো খচখচ করছিলো, হয়তো সেটা কাজ, তবে কীভাবে সেটা পেতে হয় তার মাথায় আসছিলো না।

আলাউদ্দিনই প্রস্তাব করে, দোস্ত, থাকন থাওন কবিতা লেখনের লিগা তোমার একটা কাম দরকার; আমার অ্যাড ২০০০-এ একটা কাম খালি আছে, তুমি সেইখানে লাইগ্যা যাও।

হাসান বলে, আমি তো অ্যাডের কিছু জানি না।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, আইজকাইল কোনো কামই আগে থিকা জানতে হয় না; কাম শুরু করলেই জানা হইয়া যায়, তখন তার থিকা আর কেউ বেশি জানে না। আমিই কি আগে থিকা এইসব, এই অ্যাড ইন্ডেন্টিং গার্মেন্টস্ জানতাম? আইজ দ্যাখো আমার থিকা আর কে বেশি জানে?

হাসান বলে, আমাকে কী করতে হবে?

আলাউদ্দিন বলে, তোমারে দোস্ত স্ক্রিপ্ট ল্যাখতে হইবো, নানা রকম অ্যাডের স্ক্রিপ্ট। তুমি পারবা, তোমার আঙুলে কবিতার লাইনও আসবো, আর গদ্যটাও তুমি ভালই ল্যাখো। ভাল ব্যাতন পাইবা, লগে আরও নানান মজাও আছে।

হাসান বলে, অ্যাডের কাজ তো জিনিশপত্রের বিক্রি বাড়ানো, কিন্তু জিনিশপত্র দেখলেই যে আমার ঘেন্না লাগে বমি আসে। ফ্রিজ টেলিভিশন ব্রা টুথপেস্ট এসি টয়োটা দেখলেই যে ওগুলোতে আমার আগুন ধরিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়, কমলাপুরের ভাগাড়ে নিয়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়।

হা হা হা ক'রে উল্লাসে ফেটে পড়ে আলাউদ্দিন, যেনো সে এমন আনন্দ অনেক বছর পায় নি; যেনো হাসানের সাথে সেও আগুন ধরাবে, ভাগাড়ে গিয়ে সম্পূর্ণ স্টেডিয়াম বায়তুল মোকাররম গাউছিয়া মৌচাক ও আর যা আছে, সব কিছুকে কমলাপুরে ফেলে দিয়ে আসবে এক্ষুনি।

আলাউদ্দিন বলে, ঠিক কথা বলছো দোস্ত। ফ্রিজ দেখলেই অইটার ভিতর ভড়ভড় কইর‍্যা হাগতে ইচ্ছা করে, মনে মনে আমি ফ্রিজ ডিপফ্রিজে রেগুলার হাগি, কমোড হিশাবে অইগুলি খুবই ভাল, টেলিভিশন, দেখলে মনে মনে দিনরাত মুতি; কিন্তু কথা হইছে ব্যাচাকিনাই হইছে লাইফ, লাইফে ব্যাচাকিনাই আসল কথা।

আলাউদ্দিন আরো কিছুক্ষণ হা হা হাসে; এবং বলে, এই দুনিয়ায় অনলি দি সেলার সারভাইভস্, আইজ দি সেলার ইজ দি ফিটেস্ট পার্সন, ডারউইন সাবের রুলে আইজ বাচবো খালি দোকানদার, প্রোডিউসার, যার মাল মাইনষে কিনে সেই বাইচ্যা থাকে, যারটা কিনে না সে মরে। পয়েটের মাল কোনো হারামজাদা কিনে না, কিন্তু গার্মেন্টসের মাল আমরিকা জারমানি কিনে; মাইনষে টুথপেস্ট কিনে জুতা কিনে রাজা কিনে মায়া কিনে ব্ল্যাক লেবেল কিনে, কবিতা কিনে না। এইর লিগা জীবনানন্দরা ট্রামের নিচে পরে।

হাসান হেসে বলে, আলাউদ্দিন, আমি ট্রাম রেলগাড়ি বাস ট্রাকের নিচে পড়তে চাই না, উটের গ্রীবার ডাকে সাড়া দিতে চাই না, ভূত দেখতে চাই না, দু-একটা ইঁদুর ধ'রেই বেঁচে থাকতে চাই।

আলাউদ্দিন বলে, তাইলে তোমারে অ্যাড ল্যাখতেই হইবো, অ্যাডে আডে আশমানজমিন ঢাইক্যা দিতে হইবো, দোস্ত; আইজকাল ভগবান ঈশ্বর জিহোভা গডরাও অ্যাড ছাড়া টিকতে পারে না, গডরাও আমাগো দিয়া আইজকাইল সেক্সি অ্যাড ছারে। আইজ অ্যাড ইজ গড, মৌর পাওয়ারফুল দ্যান অল দি ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন গড্স্। দোস্ত, লোকে বিজ্ঞান বিজ্ঞান করে, তয় এইটা বিজ্ঞানের যুগ না, এইটা হইল বিজ্ঞাপনের যুগ মনে রাখবা।

হাসান বলে, আমার মনে হয় আমি কোনো কাজেরই উপযুক্ত নই, অ্যাড পারবো কি না আমি জানি না। আমাকে ভাবতে হবে।

পাত্রটি শেষ ক'রে নিজের ও হাসানের জন্যে আরো দুটি ফরাশি ওয়াইনের আদেশ দেয় আলাউদ্দিন।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, তুমি পারবা, তোমার কবিতায় দুইটা কোয়ালিটি আছে, একটা হইছে গোপনে বালির ভিতর দিয়া বিসুভিয়াসের লাভার মতন বইয়াচলা ভাইওলেন্ট সেক্স, মনে হয় সাওতালগো মতন আকাশ ফাটাইয়া নাচতেছে, আর শরিলের রগ ছিররা ফেলনের মতন ফ্যান্টাসি; গদ্যও তুমি ল্যাখতে পারো, আমাগো মডার্নিজমের টিচার বু ব-র থিকাও অ্যাট্রাক্টিভ। দোস্ত, বাঙালি মুসলমান আইজও গদ্য ল্যাখতে শিখে নাই।

হাসানের খুব সুখ লাগে আলাউদ্দিনের কথা শুনে; তাহলে তার কবিতা, তার গদ্য, এবং তাকেও কেউ কেউ বুঝতে পারছে।

হাসান বলে, সেক্স হচ্ছে প্রতিভার রক্তধারা, নদীর স্রোতের সাথেও এটা বয়ে চলে মেঘেও বয়ে চলে, *গীতাঞ্জলি* আর নভোযান সেক্স থেকেই জন্মেছে; বাঙালি মুসলমান

শোয়া বোঝে, সেক্স বোঝে না কাম বোঝে না; তাই ওরা এখনো হাম্‌দ্‌ নাত চায়, ওরা কখনো 'শাশ্বতী' আর 'অবসরের গান' লিখতে পারবে না।

আলাউদ্দিন বলে, আমরা অ্যাডআলারা এইটা বুজছি; অ্যাডে কোনো হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইহুদি ক্যাথলিক প্রোসেস্ট্যান্ট নাই, অ্যাডের একটাই ধর্ম–ব্যাচো ব্যাচো ব্যাচো, সব ব্যাইচা দেও, গাড়ি ব্যাচো শাড়ি ব্যাচো লাভারের পাছা ব্যাচো আকাশ ব্যাচো বাতাস ব্যাচো। তয় মানুষ আইজকাল জিনিশ কিনতে চায় না, চায় সেক্স কিনতে; সেইজন্য আমরা জামাকাপড় গাড়িবাড়ি ফ্রিজ টেলিভিশন কম্পিউটার টুথপেস্ট সেন্ট পাউডার আলকাতরা বেচি না, বেচি সেক্স; সেক্স ছাড়া আর কিছুর দাম নাই। সেক্স ইজ অলপাওয়ারফুল, অমনিপোটেন্ট; সেক্সে ফুল ফোটে, সেক্সে পাজেরো ঘণ্টায় একশো মাইল দৌরায়; সেক্সে ভোটের বাক্সে ভোট পরে। তোমার কবিতা যে আমি লাইক করি, তার একটা কারণ অই দুর্দান্ত সেক্স।

হাসান বলে, আমার ভালো লাগছে যে তুমি আমার কবিতার ভেতরটা বুঝতে পেরেছো; তবে আমি কিন্তু অন্যদের মতো নারীর কয়েকটি বাঁক নিয়ে মাতামাতি করি না, কথায় কথায় স্তন যোনি উরু সঙ্গম উচ্চারণ করি না।

আলাউদ্দিন বলে, এইখানেই ত তোমার প্রতিভা; তুমি অইসব উচানিচা জায়গাগুলি নিয়া ডলাড্‌লি চাপাচাপি খোদাখুদি কর না, কিন্তু সব কিছুর ভিতর ভিতর কাম ঢুকাইয়া দেও গোপন রাঙা লাভার মতন, তাতে আসমান ফাইট্যা পরতে চায় জমিন ফাক হইয়া যায়। অ্যাডেও তোমার তাই করতে হইবো। হুন্ডার ভিতরে তোমার কাম ঢুকাই দিতে হইবো, সাবানের মইধ্যে সেক্স ঢুকাই দিতে হইবো, ব্যাটারির মইধ্যে সেক্স ভইর‍্যা দিতে হইবো। আইজকাইল ত্যালে হুন্ডা পাজেরো টয়োটা চলে না, চলে সেক্সে; সাবানে কাপড় সাফ হয় না, সাফ হয় সেক্সে; ইলেকট্রিসিটিতে লাইট জ্বলে না, জ্বলে সেক্সে। সেক্সই হইল আইজকাইলকার অ্যাটমিক এনার্জি। দোস্ত, লাভার মতন সেক্সি অ্যাড লেখতে হইবো তোমারে; তুমি পারবা, আমি বইল্যা দিলাম কবিতায় তুমি শাইন করবা, অ্যাডেও শাইন করবা।

হাসান বলে, আমি তো শাইন করতে চাই না, নিজেকে আমি ধ্বংস করতে চাই কবিতার জন্যে।

আলাউদ্দিন বলে, তুমি দোস্ত অ্যাডের লিগাও নিজেরে কিছুটা ধ্বংস কর, তোমার কাছে যা ধ্বংস আমাগো কাছে তা ক্রিয়েশন মনে হইবো, কবিরা ডেস্ট্রাকশনের মইধ্যেও ক্রিয়েটিভ।

দু-দিন পর হাসান অ্যাড-২০০০-এ যোগ দেয়।

নিয়োগপত্রে একটি জিনিশই দর্শনীয় মনে হয় হাসানের কাছে, সেটি বেতন। একটা মোটা অংশ দেখে সে বিস্মিত হয়। সে মুঠোয় একগুচ্ছ চকচকে টাকা দেখতে পায়, খুব ভারি লাগে, পরমুহূর্তেই এক আকাশ নক্ষত্রের মতো ঝলমল ক'রে ওঠে কাগজগুলো, সে শিউরে ওঠে, এবং তীব্র একটা কাম বোধ করে। এতো টাকার কথা সে ভাবে নি, এতো টাকা দিয়ে কী করবে সে বুঝতে পারে না, একটু পরেই মনে হয়

টাকা বোঝার বস্তু নয়, ভোগের বস্তু, যেমন ফুল বোঝার বস্তু নয়, রঙধনু বোঝার বস্তু নয়। টাকা সে বোঝে না, কোনো দিন বুঝবে না; এটা এক রহস্যময় বস্তু, রহস্য হয়েই থাক।

আলাউদ্দিন তাকে অফিসে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয় সবার সাথে, বুঝিয়ে দেয় তারা কাজও; এবং হাসান সুখ পায় অ্যাড ২০০০-এর কেউ কেউ তার নাম আগে থেকেই জানে– শুধু এটুকুর জন্যেই সে নিজেকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অন্যরা কেউ কেউ তার নাম জানবে, শুধু এটুকুর জন্যে?-দু-একজন তার কবিতারও অনুরাগী। অফিসটি তাকে বিব্রত ও সুখী করে একই সাথে;– সব কিছুই ঝলমলে ঝকঝকে; যে-কয়েকটি তরুণীকে সে দেখতে পায়, তাদের মতোই অত্যন্ত নিবিড় সুন্দর ঢলঢলে আবেদনময়ী অফিস।

হাসান কাচ দিয়ে ঘেরা একটি ডেস্ক্ পায়, চেয়ারটি খুবই রূপসী আরামদায়ক, একটি মডেলের মতোই ক্যামেরার সামনে স্থির পোজ দিয়ে আছে– ব'সেই মনে মনে সে বলে, কবিতা, প্রিয় কবিতা; তারপর মনে পড়ে– অ্যাড, আবেদনময়ী রঙিন সেক্সি অ্যাড, সমকালের ঈশ্বর না ঈশ্বরী; সাথে সাথে চেয়ারটি এদিকে সেদিকে যেনো ঘুরতে থাকে। হাসানকে তার অ্যাঙ্গেল দেখায়।

সামনের দিকে তাকিয়ে একটি থরোথরো তরুণীর রঙিন দিগন্তজোড়া ছবি দেখতে পায় হাসান। এ কি তরুণী, না বাঁক? এ কি তরুণী, না ওষ্ঠ? এ কি তরুণী, না যুগল বক্ষ? ছবিটির দিকে সে তাকিয়ে থাকে।

সে কি এমন সেক্সি কবিতা লিখতে পেরেছে আজো? ছবির এই তরুণীটিকে কি কবিতায় রূপান্তরিত করা সম্ভব?

আমি অ্যাড হয়ে গেলাম, কবিতা আমাকে ক্ষমা কোরো। সে মনে মনে বলে।

কিন্তু তোমার আমার মধ্যে কোনো ছাড়াছাড়ি নেই। সে মনে মনে বলে।

আমি অ্যাডকে কবিতা ক'রে তুলবো, কিন্তু কবিতা, তোমাকে অ্যাড করবো না। তুমি অ্যাড নও, সেক্স নও, তুমি লোকোত্তর শিল্পকলা। সে মনে মনে বলে।

সামনের দিকে তাকিয়ে আবার সে তরুণীকে দেখে।

তুমি সুন্দর, কিন্তু তুমি কবিতা নও, তুমি আশ্চর্য শরীর, তুমি বিস্ময়কর টাকা। সে মনে মনে বলে। তুমি শাশ্বত পণ্য, তুমি এই সময়ের উর্বশী।

উর্বশী হাসানকে জিজ্ঞেস করছে, আমাকে কি তুমি ঘৃণা করছো?

একটা অপরাধবোধ তার রক্তের ভেতর ঢুকে যায়, সে ক্ষমা চায়।

না, তোমাকে ঘৃণা করছি না, তুমি সুন্দর, তোমাকে ঘৃণা করি না; ঘৃণা করার আমার অধিকার নেই, তুমি সুন্দর।

আমি কি বেশ্যা? আমাকে কি বেশ্যা মনে করছো তুমি?

বেশ্যা কাকে বলে? কেউ বেশ্যা নয়, বা সবাই বেশ্যা। আসলে বেশ্যা কাকে বলে আমি জানি না।

অ্যাড কী, তুমি কি জানো হাসান?

অ্যাড হচ্ছে নিরন্তর বেচা বেচা বেচা, অবিনাশী টাকা টাকা টাকা।

অ্যাড আর কী হাসান?

অ্যাড হচ্ছে আধমিনিটের জন্যে অমরতা দান, বিশ্ববিখ্যাত করা।

এখন কি সবাই বিশ্ববিখ্যাত?

এই অসামান্য সময়ে প্রত্যেকের নিয়তি অন্তত আধমিনিটের জন্যে বিশ্ববিখ্যাত হওয়া। বিখ্যাত না হয়ে আর উপায় নেই, বিখ্যাত না হয়ে আমাদের মৃত্যু নেই।

আধমিনিট বিখ্যাত হওয়ার জন্যে দণ্ডিত আমরা।

আমি তোমার থেকে বিখ্যাত, রাস্তায় তোমাকে কেউ চেনে না, তোমাকে দেখে কেউ রিকশা থেকে লাফিয়ে নামার উত্তেজনা বোধ করে না, আমাকে দেখে করে; আমি সাবানের অ্যাড ছিলাম, এখন আমি রাস্তায় বেরোতে পারি না।

সবাই তোমার পায়ে পড়তে চায়?

না, সবাই আমাকে রেস্টহাউজে মোটেলে নিতে চায়, অন্তত একরাতের জন্যে পুলক অনুভব করতে চায়, এক রাত এক রাত।

তুমি একরাতের বিলোল হিল্লোল উর্বশী?

আমরা এখন সবাই একরাতের উর্বশী, সবাই আধমিনিটের সেলিব্রেটি।

তুমি কি বাস্তব, তুমি কি বাস্তবতা, হে তরুণী?

না, আমি বাস্তব নই, আমি ফ্যান্টাসি। এটা বাস্তবতার কাল নয়, এখন কেউ বাস্তবতা সহ্য করে না, এখন সব কিছু ভেঙেচুরে ফ্যান্টাসি তৈরি করতে হয়, এটা ফ্যান্টাসির যুগ। আমি ফ্যান্টাসির কন্যা।

হাসান তরুণীটির সাথে কথা বন্ধ ক'রে একটি সিগারেট ধরায়।

আমি যতো দিন এখানে আছি তুমি আমার সামনে থাকবে, হাসান মনে মনে বলে, তাহলে আমি পারবো।

দেয়ালে আমরা কেউ বেশি দিন থাকি না, আমাকে সরিয়ে অন্য কেউ আসবে। প্রতিদিন আমার জন্ম হচ্ছে, প্রতিদিন আমি নতুন তরুণী হয়ে দেয়ালে আসি।

একটি পংক্তি জলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে হাসানের মাথায়। সে কি এখনই ওটাকে কবিতা বানাতে বসবে, কাটতে ছিঁড়তে থাকবে? সে কি রামপ্রসাদ? হিশেবের খাতায় লিখবে শ্যামা কালির স্তব? না, এখন আর কেউ কালি নেই, সবাই রঙিনা; সে পংক্তিটিকে মাথার ভেতর রেখে দেয়, তুমি আমার মাথার ভেতর থাকো, পংক্তি, এটা অ্যাডের টেবিল, এখানে আমি তোমাকে নিয়ে খেলতে পারি না। এখানে আমার অন্য দেবীর স্তব লিখতে হবে, যার নাম স্ক্রিপ্ট, কবিতা নয়।

দুটি অ্যাডের স্ক্রিপ্ট লেখার দায়িত্ব পরের দিনই লাফিয়ে পড়ে হাসানের ওপর।

অ্যাড ১ : মাতৃদুগ্ধের গুণকীর্তন ক'রে অ্যাড লিখতে হবে, চোখে খোঁচা দিয়ে দেখাতে হবে মাতৃদুগ্ধের কোনো বিকল্প নেই।

অ্যাড ২ : 'রাধিকা' নামের একটি অস্ট্রেলীয় গুঁড়োদুধের অ্যাড লিখতে হবে, চোখে মায়াজাল ছড়িয়ে দেখাতে হবে এটা মাতৃদুগ্ধের থেকেও পুষ্টিকর, আর মায়ের দুধ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু রাধিকার ধারা অফুরন্ত।

অ্যাড দুটির বৈপরীত্যে মুগ্ধ হয় হাসান, সুখীও বোধ করে; এটা তার কবিতার মতোই, সে তো কবিতায় ভয়াবহ বৈপরীত্যকেই বিন্যস্ত ক'রে দিতে পছন্দ করে। সে কি অগ্নিগিরি আর অশ্রুবিন্দুকে পাশাপাশি বসায় না? তার ওপর এই বৈপরীত্য এসে কি পড়লো সে-জন্যেই?

প্রথম অ্যাডটা সরকারি, জাতিসংঘফংঘ হয়তো বিশ্বমায়েদের ঝোলা স্তনের দিকে তাকিয়েছে দয়া ক'রে, ফোলা স্তন দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, এবং বিশ্বের কোনো সম্পদকেই নষ্ট হ'তে দেবে না ব'লে মায়ের দুধের গুণকীর্তনের শ্লোগান তৈরি ক'রে ফেলেছে।

হাসানকে তার অ্যাড লিখতে হবে। বেশ, সে লিখবে।

দ্বিতীয়টা প্রাইভেট; 'রাধিকা'র পিতৃপুরুষেরা মায়ের স্তনকে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পুষ্টিকর খাদ্য মনে করে, শিশুর নয়, শিশুকালের স্তন নিয়ে টানাটানি ইত্যাদিতে কোমলমতি শিশুদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে, দুধ খাওয়া ছেড়ে চোষাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে, যা জাতির জন্যে শুভ নয়; তাছাড়া মায়ের দুধ বিনেপয়সায় পাওয়া যায়, কিন্তু বিনেপয়সার জিনিশে বিশ্ব চললে বিশ্ব চলতো না। ব্যবসা থেমে যেতো, ধস নামতো বাজারে। অন্য দিকে মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন ব্যয়বহুল, আধলিটার মাতৃদুগ্ধের পেছনে খরচ হয়, একশো টাকা, সেখানে এক লিটার রাধিকা পাওয়া যায় পাঁচ টাকায়।

হাসানকে তার অ্যাড লিখতে হবে। বেশ, সে লিখবে।

প্রথম অ্যাডটি নিয়েই প্রথম বসে হাসান, সে মাতৃদুগ্ধ পান করাবে সবাইকে।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মহাপতি উপপতি অতিপতি যুগ্মপতি বিচারপতি আমলা মামলা অধ্যাপক পুলিশক এনজিওক গার্মেন্টস্‌ক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টক ধর্ষক ধর্মক কর্মক চর্মক সবাইকে। মাতৃদুগ্ধ পান ক'রে তারা সুস্থ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠবে, তাদের অকল বিকল মাথাগুলো ঠিকভাবে কাজ করবে, রাস্তাঘাট ধানক্ষেত পাটক্ষেতে তার বিকাশ দেখা যাবে। ওহ্, তারা এখন আর মাতৃদুগ্ধ পান করে না? ওই দুধের গন্ধে তাদের বমি আসে? তারা স্তন্য পান করতে পছন্দ করে না? তারা পছন্দ করে শুধু স্তন পান করতে? মায়ের না, অন্য কারো?

তাহলে শুধু শিশুদেরই পান করাতে হবে মাতৃদুগ্ধ?

কিন্তু কেনো শুধু শিশুদেরই পান করাতে হবে মাতৃদুগ্ধ?

হাসান একবার চোখ বুজে দেশ জুড়ে গোয়ালঘর দেখতে পায়, তাতে রাশিরাশি দুগ্ধবতী গাভী দেখতে পায়, তাদের বাঁট ফেটে পড়তে চাচ্ছে। পরমুহূর্তে সে রাশিরাশি দুগ্ধবতী মাতাদের দেখতে পায়, তাদের বাঁট ফেটে পড়তে চাচ্ছে। মাতাদের জন্যে অমন গোয়ালঘর দরকার।

মাতৃদুগ্ধ বিশ্বের সম্পদ, তার এক ফোঁটাও নষ্ট করা চলবে না, এর প্রতি ফোঁটা সম্মিলিতভাবে চুষে খেতে হবে; ফুরিয়ে আসছে গরিব বিশ্বের সম্পদ, নিশ্চিত করতে হবে তার সম্পদের চূড়ান্ত ব্যবহার।

সে মাতৃদুগ্ধ পান করাবে সবাইকে, দারোগা থেকে জেনারেল সবাইকে।

মাতৃদুগ্ধের কোনো বিকল্প নেই, এর পুষ্টিকরতার সীমা নেই।

এটা বিনিয়োগের শতাব্দী, মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানো হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ।

এটা এক আশ্চর্য ঔষধ। এতে সারাক্ষণ লাফালাফি দৌড়োদৌড়ি কুচকাওয়াজ গোলাগুলি করছে এমন এক জীবন্ত কোষ, যা দেশরক্ষী বাহিনীর মতোই অতন্দ্র–এটা কোনো বিদেশি বাহিনীকে ঢুকতে দেয় না ত্রিসীমার মধ্যে; এটা খেলে ঘনঘন হাগু হয় না, বাতাসের নালি জ্বালাপোড়া ক'রে না, দাঁতগণ আর মাড়ি হিমালয়ের পাথরের মতো শক্ত থাকে, মাথাটা মগজটা থাকে ঝকঝকে, যে খাবে সে নিউটন আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথ না হয়ে যাবে না।

বেশি ক'রে মাতৃদুগ্ধ খাও, জাতিসংঘ ব'লে দিয়েছে খাও, মাতৃদুগ্ধ খাও, এমন বিনিয়োগ আর হয় না।

হাসান দেশের প্রধান নারীবাদীটির সাথে একটু কথা বলতে চায়। ইচ্ছে করে এখনি তাঁকে ফোন করে; তবে ফোন না ক'রে মনে মনে ফোনে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে থাকে। এর নাম সে দেয় মানসিক সাক্ষাৎকার।

হাসান জিজ্ঞেস করে, একটু বলুন তো মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা কী?

এভাবে প্রশ্ন করা কি ঠিক হলো বিখ্যাত নারীবাদীকে?

সে ভাষা বদলে আবার জিজ্ঞেস করে, দয়া ক'রে মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা কী সে-সম্পর্কে আপনার মতামত জানালে খুশি হবো।

নারীবাদী হা হা হা হা হা হা ক'রে হেসে উঠে বলেন, জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলটির প্রতিদিন এক লিটার মাতৃদুগ্ধ খাওয়া উচিত, তাহলে তার মাথা সুস্থ থাকবে, পাগলামো করবে না।

হাসান জিজ্ঞেস করে, আপনি কি তাহলে মাতৃদুগ্ধ খাওয়া বা খাওয়ানো পছন্দ করেন না?

নারীবাদী হা হা হা ক'রে বলেন, ওরা মনে করে নারীরা দুগ্ধবতী গাভী, নারীদের ওলানের দিকে এবার ওদের চোখ পড়েছে; আগামী বছর হয়তো ওরা উন্নত জাতের দুগ্ধবতী নারী উৎপাদনের জন্যে উন্নত মানের গোয়ালঘর বানানোর পরিকল্পনা নেবে, নারীদের উন্নত মানের ফিড দেবে, যাতে দেশে বেশি পরিমাণে নারীদুগ্ধ মাতৃদুগ্ধ উৎপাদিত হয়।

হাসান জিজ্ঞেস করে, মাতৃদুগ্ধ থেকে কি আমরা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবো?

নারীবাদী বলেন, হ্যাঁ, তা খুবই পারা যাবে। বছরে যদি আমরা কয়েক কোটি লিটার মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন করি, তাহলে তা পলিথিনের ব্যাগে ভ'রে বেচা যাবে, ওই দুগ্ধ থেকে বাটার চিজ ঘি কন্ডেন্সড্ মিল্ক আইস ক্রিম উৎপাদন করা যাবে, হা হা হা, হা, বিদেশে রপ্তানি করা যাবে, তখন নিজেরা অবশ্য খেতে পাবো না।

হাসান বলে, আপনার কথা বেশ নেগেটিভ ব'লে মনে হচ্ছে।

নারীবাদী বলেন, কোথায় নেগেটিভ? আমি তো খুবই পজিটিভ কথা বলছি। ব্যাপারটি হচ্ছে ওরা নারীদের ঘরে আটকে রাখার নতুন নতুন ফর্মুলা বের করছে। ওরা নারীর মগজ চায় না ওলান চায়, মেধা চায় না দুগ্ধ চায়, আর নারীর ঐতিহাসিক দেহখানা তো আছেই। মাতৃদুগ্ধ পান করানো হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে নতুন সুন্দর ফর্মুলা নতুন সুন্দর চক্রান্ত।

হাসান জিজ্ঞেস করে, মাতৃদুগ্ধ পানে কি কোনোই উপকার হয় না?

নারীবাদী বলেন, দেশে কোটি কোটি বাচ্চা মায়ের দুধ খাচ্ছে, তাতে কি তাদের স্বাস্থ্য মেধা অতুলনীয় হচ্ছে? আর মায়ের দুধে প্রতিভা? মায়ের দুধে নৈতিকতা? রবীন্দ্রনাথ তো মায়ের দুধ না খেয়েই প্রতিভাবান হয়েছেন, আর বস্তির বাচ্চাগুলো মায়ের দুধ খেতে খেতে ম'রে যাচ্ছে। ওই দারোগা পুলিশ মাস্তানগুলো তো মায়ের দুধ খেয়েছে, ওই জেনারেলগুলোও মায়ের দুধ খেয়েছিলো। তাতে কি তারা নৈতিক হয়েছে? হা হা হা হা।

হাসান জিজ্ঞেস করে, বুড়োদের মাতৃদুগ্ধ খাওয়ালে উপকার হ'তে পারে?

নারীবাদী বলে, হ্যাঁ ওই বদমাশ বুড়োগুলোকে মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানো দরকার; তাহলে হয়তো বদমাশি কিছুটা কমবে।

হাসান নারীবাদীটির সাথে কথা বন্ধ ক'রে তার সামনের একগুচ্ছ দৈনিক পত্রিকার একটির পাতা উল্টোতে শুরু করে; দ্বিতীয় পাতায় একটি সংবাদ তাকে যারপরনাই স্বস্তি দেয়। বাক্স ক'রে সংবাদটি ছাপা হয়েছে, যার শিরোনাম 'স্ত্রীর স্তন্য পান ক'রে বেঁচে আছেন মোহাম্মদ ফজর আলি'। সংবাদে বলা হয়েছে মোহাম্মদ ফজর আলি বছর বছর বিয়ে ক'রে চলছেন, তাঁর ঘরে সব সময়ই কমপক্ষে একটি ক'রে গর্ভবতী স্ত্রী থাকে, এবং থাকে একটি নতুন সন্তানবতী স্ত্রী। মোহাম্মদ ফজর আলি তাঁর শিশু সন্তানকে মায়ের স্তন্য পান করতে দেন না, তিনি নিজেই স্ত্রীকে চেপে ধ'রে সকাল দুপুর বিকেলে রাতে চারবেলা স্ত্রীর দুগ্ধ পান করেন। স্ত্রীর পুষ্টিকর দুগ্ধ পান না করলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁর গর্দান সরু হয়ে যায়; তাই এই কাজ তিনি ক'রে আসছেন তিরিশ বছর ধ'রে। এবার তিনি গোলমালে পড়েছেন, তিনি নতুন বউটির স্তন্য পান করতে গেলে বউটি তাকে বাধা দেয়, তিনি জোর ক'রে তিন মাস ধ'রে স্ত্রীর স্তন্য পান করেন, শিশু কন্যাটিকে স্তন্য পান করতে দেন না। মোহাম্মদ ফজর আলি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠলেও শিশুটি দিন দিন রোগাপটকা হয়ে পড়তে থাকে। স্বামীর স্তন্যপাননেশা বন্ধ করতে না পেরে অবশেষে বউটি গিয়ে থানায় মামলা দায়ের করে; এবং নীতিপরায়ণ পুলিশ ফজর আলিকে গ্রেফতার করে।

হাসান সংবাদটি প'ড়ে অভিবাদন জানায় মোহাম্মদ ফজর আলিকে।

হাসান এবার আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করে যে নারীদের স্তন্য জাতীয় সম্পদ, তা নষ্ট হ'তে দেয়া যায় না। গরিব দেশে প্রতি বছর নষ্ট হচ্ছে কোটি কোটি লিটার মাতৃদুগ্ধ; কিন্তু ওই মূল্যবান জাতীয় সম্পদ নষ্ট হ'তে দেয়া যায় না। মোহাম্মদ ফজর

আলিকে হাসানের পথপ্রদর্শক ব'লে মনে হয়– আবার অভিনন্দন জানায় সে মোহাম্মদ ফজর আলিকে। জাতিসংঘ কি তাঁকে নেবে?

আহমেদ মাওলা, বিজ্ঞাপন নির্বাহী, তাকে ডেকে পাঠায় অ্যাড দুটির মেসেজ বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে।

আহমেদ মাওলা বলে, বোঝতেই পারছেন অ্যাড দুইটা ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট্টি ডিগ্রি অপজিট, একটায় আমাগো নীতিকথা শুনাইতে হইবো, কোনো মাল ব্যাচতে হইবো না, মেসেজ ব্যাচতে হইবো ফিলসফি ব্যাচতে হইবো এথিক্স ব্যাচতে হইবো মরালিটি ব্যাচতে হইবো; আরেকটায় মাল ব্যাচতে হইবো, খাটি মাল যা গরুর বান থিকা বাইর হয়, তা গুড়া কইর‍্যা ব্যাচতে হইবো, ফিলসফি মরালিটি এথিক্স কয়েক মাসেই ফুরাই যাইবো, কিন্তু মাল থাকবো। এই কথা মনে রাইখ্যা স্ক্রিপ্ট ল্যাখবেন।

হাসান বলে, দুটিকেই আমার শয়তানদের কাজ মনে হচ্ছে।

আহমেদ মাওলা বলে, আরে পয়েট ভাই, শয়তানরাই দুনিয়া চালাইতেছে, আমাগো কাম হইতেছে শয়তানগো গ্রেট গড বাগান। আইচ্ছা কইর‍্যা স্ক্রিপ্ট লেইখ্যেন। কবিতা ত আইচ্ছা, কইর‍্যাই লেখেন, দেখি এইবার স্ক্রিপ্ট লেখনের ট্যালেন্ট আছে কেমন। দুই এক দিনের মইধ্যেই লেখন শ্যাষ করতে হইবো।

হাসান দুটি অ্যাডের স্ক্রিপ্টই বিস্তৃতভাবে লিখে ফেলে। মাতৃদুগ্ধ অ্যাডের জন্যে সে দুটি ক'রে স্ক্রিপ্ট তৈরি করে– প্রিন্ট মিডিয়ার জন্যে দুটি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার জন্যে দুটি, তার বেশ মজা লাগে; আর 'রাধিকা'র জন্যে তৈরি করে তিনটি ক'রে স্ক্রিপ্ট– প্রিন্ট মিডিয়ার জন্যে তিনটি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার জন্যে তিনটি, অসাধারণ মজা লাগে তার। হাসানের মনে হয় সে নতুন ধরনের পদ্য লিখছে, শয়তানের পদ্য, মহান শয়তান ক্ষমা কোরো মোর সীমাহীন দুঃখে, যে-পদ্য সক্রিয়, সে-পদ্য কাজ করবে, যে-পদ্য বস্তু বিক্রি করবে, যে-পদ্য অর্জন করবে মহাজগতের শ্রেষ্ঠ সাফল্য– টাকা-অমর উজ্জ্বল মেধাবী প্রতিভাবান।

বেশ ভেবেচিন্তে কেটে ছিঁড়ে পাতার পর পাতা নিউজপ্রিন্ট ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে সে শিরোনাম, উপশিরোনাম, পাঠ, অডিও, ভিডিও, উপসংহার তৈরি করে। এই প্রথম সে নিউজপ্রিন্টের প্যাডে লিখছে; অদ্ভুত বস্তু মনে হয় এটাকে তার, বলপয়েন্ট আর নিউজপ্রিন্ট কাছাকাছি এলেই একটা বিস্ফোরণ একটা দুর্ঘটনা ঘটে– শুধু লিখতে আর কাটতে আর ছিঁড়তে ইচ্ছে হয়, মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত বাস্কেট, সারা পৃথিবী, ডাঁই ডাঁই ছেঁড়া নিউজপ্রিন্টে ভ'রে ফেলি। কিন্তু তাকে পারতে হবে; কবিদের পারতে হবে, নিজেকে সে বলে, কবি না পারলে আর কে থাকে যে পারে? তাই তাকে পারতে হবে।

মাতৃদুগ্ধ অ্যাডটিতে তার ভাষার কণ্ঠ চিরসত্যের, জিহোভা ঈশ্বর হোলি ঘোস্ট উজ্জা প্রকাশ করছে ওই পরম সত্য, ওই ধ্রুব সত্য থেকে স'রে গেলে ধ্বংস হয়ে যাবে সব কিছু, মরুভূমিতে পরিণত হবে মহাসমুদ্র, চানসুরুজ আর দশ আসমান মাটিতে নেমে আসবে; আর 'রাধিকা'য় তার ভাষার স্বর উদ্দীপক উষ্ণ সুস্বাদু পুষ্টিকর, শিশুরা রাধিকার বাঁট ধ'রে ঝুলে থাকবে বছরের পর বছর।

তার স্ক্রিপ্ট প'ড়ে আহমেদ মাওলা ছুটে আসে তার ডেস্কে। চমৎকার, যাকে বলে মাইডিয়ার, মানুষ আহমেদ মাওলা।

আহমেদ মাওলা খুশিতে ফেটে প'ড়ে বলে, আরে পয়েট ভাই, দারুণ স্ক্রিপ্ট ল্যাখছেন আপনে, দুইটাই হিট হইবো, সুপারহিট; এখন আমার মাথা ঘোরছে স্ক্রিপ্ট বাছাই করতে গিয়া, কোনটা থুইয়া কোনটা রাখি। মনে করছিলাম পয়েট দিয়া ব্যাচাকেনা হইবো না, এখন দেখছি পয়েট ছাড়া কাম হইবো না।

হাসান বিব্রত হয়ে বলে, আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম, এখনো আমার মনে হচ্ছে হয়তো কিছুই হয় নি। এগুলো কবিতা হ'লে আমি ছিঁড়ে ফেলে দিতাম।

আহমেদ মাওলা বলে, স্ক্রিপ্ট পাওয়ার পর আমার সাতদিন ঘষাঘষি করতে হয়, আর এই স্ক্রিপ্ট লইয়া কাইলই কামে নামতে পারি। স্পন্সরগো লগে কথা বইল্যা ঠিক করতে হইবো কোন স্ক্রিপ্টটারে রাখুম কোনটারে ছারুম।

হাসান বলে, আমাকেও ডাকবেন, কীভাবে আপনারা কাজ করেন দেখবো।

আহমেদ মাওলা জিজ্ঞেস করে, ভিডিওর সময় থাকতে চান নি?

হাসান বলে, হ্যাঁ, ওটা এখনো আমার কাছে বিস্ময়

আহমেদ মাওলা বলেন, বোঝতে পারছি মাইয়া দ্যাখতে চান, তা মাঝেমইধ্যে দ্যাখন ভাল; তাতে স্ক্রিপ্টও ভাল হইবো, মডেলগুলিরেও একটু লাড়াচাড়া করা যাইবো। দুইটা খুব ডগমইগ্যা সেক্সি মডেল লাগবো। মাতৃদুগ্ধের মাটারে হইতে হইবো মধুবালার মতন সেক্সি, মা সেক্সি না হইলে পোলাপান মার দুধ খাইতে চাইবো ক্যান? বুকের দুধ খাওয়াতে হইলে মাগুলিরে সেক্সি হইতেই হইবো। আর হইবো বুকভরা মধু বঙ্গের বধু। এমুনভাবে ক্যামেরা চালাইতে হইবো যে পোলাপান ক্যান বাপেরাও দুধ খাইতে চাইবো।

হাসান বলে, তাহলে আমি পুরোপুরি ব্যর্থ হই নি? কবিরাও পারে?

আহমেদ মাওলা বলেন, যা স্ক্রিপ্ট ল্যাখছেন তার জইন্যে আপনেরে প্রাইজ দিমু, একটা মিল্কি মডেলের গে এক সন্ধ্যা ছাইর‍্যা দিমু। অইটা ঠিক রাধিকার অস্ট্রেলিয়ান গাভীটার মতন, যত ইচ্ছা ওলান থিকা দুধ খাইবেন।

হাসানের মনে হচ্ছে সে দুটি বিপরীত দেবী না উর্বশী না পরিহাসের সাধনা ক'রে চলছে; একটা অ্যাডের আরেকটি কবিতার; একটি তাকে বেতন দিচ্ছে ডেস্ক দিচ্ছে মাইক্রোবাসে নিচ্ছে আনছে টেলিফোন দিচ্ছে দামি সিগারেট খাওয়াচ্ছে হুইস্কি বিয়ারের সুযোগ দিচ্ছে তরুণীদের সঙ্গ দিচ্ছে, আরেকটি তাকে কিছুই দিচ্ছে না বা হতাশা দিচ্ছে ব্যর্থতা দিচ্ছে শূন্যতা দিচ্ছে, কিন্তু সেটির পুজোতেই (পুজো? সে কি পুজো ক'রে তার?) সে সুখ পায় বেশি, সেটিকেই সে পুজো করে অন্যটির সাথে বিছানায় যায়। অ্যাডের দেবী তাকে বদলে দিচ্ছে, মুখোমুখি ক'রে দিচ্ছে অজস্র অজানা বাস্তবেরও ও অবাস্তবের, তাকে খুলে দিচ্ছে, অনেক কুত্তার আর বাঘের আর বরাহের বাচ্চার সঙ্গে বসাচ্ছে, আর কবিতার দেবীও যেনো হারতে চায় না, প্রতিযোগিতায় নেমেছে, তাকে ছেড়ে দিতে চাচ্ছে না– দু-চারদিন পরপরই দিচ্ছে একটি-দুটি পংক্তি,

দু-একটি চিত্রকল্প, হঠাৎ ধ্বনিগুঞ্জন, দুটি-একটি যন্ত্রণা, এবং সে ওগুলোকে কবিতায় পরিণত করছে।

দুটি সাময়িকীতে তার দু-গুচ্ছ কবিতা ছাপা হওয়ার পর সে নিজেই চঞ্চল বোধ করে, দুটি সম্পূর্ণ রাত কাটিয়ে দেয় বারবার নিজের কবিতা প'ড়ে, এবং নিজেকে প্রশ্ন ক'রে– কবিতাগুলো কি ঠিক এভাবেই লেখা অবধারিত ছিলো, সে কি এভাবেই লিখতে চেয়েছিলো, না কি এগুলো বাস্তবায়িত হ'তে পারতো অন্য রূপেও, এবং এগুলো আদৌ লেখার কোনো দরকার ছিলো কি না? স্ক্রিপ্টের জন্যে সে প্রশংসা পাচ্ছে, কিন্তু ওই প্রশংসাকে সে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে স্যান্ডল দিয়ে ডলছে; ব্যাকুল হয়ে থাকছে তার কবিতার জন্যে একটুকু প্রশংসার জন্যে, একটু প্রশংসা পেলে তা সে রক্তে গুচ্ছগুচ্ছ ফুলের মতো সাজিয়ে রাখছে। আধটুকু একটুকু প্রশংসার জন্যে সে এক সপ্তাহে দুটি আড্ডায় যায়, সিগারেট খাওয়ায় অন্যমনস্কভাবে, তবে অনেকে কেড়েই নেয় সিগারেট, তবু কারো মুখ থেকে প্রশংসা বেরোয় না; তবে সে বুঝতে পারে তার কবিতাগুলো পড়েছে এরা, এই সম্ভাব্য মহাকবিরা, যারা নিজেদের ছাড়া অন্যদের কখনো প্রশংসা করে না।

হাসান, তুমি কেনো একটুকু প্রশংসার জন্যে কাতর? নিজেকে প্রশ্ন করে সে। ওই প্রশংসায় তো তুমি মহাকবি হয়ে উঠবে না, শহরে তোমার একটা চারতলা বাড়ি উঠবে না, তবু তুমি কেনো সামান্য তুচ্ছ প্রশংসা চাও মনে মনে? কেনো এই এই লাল ক্ষুধা, কেনো এই সোনালি পিপাসা?

সামান্য একটু প্রশংসা হঠাৎ আলোর ঝিলিকের মতো, তাতে ভেতরের অন্ধকার কেটে যায়, শরীর জুড়ে অপার্থিব কাঁপন লাগে; চারতলা বাড়ি তোমাকে সে সুখ দিতে পারে না। সে নিজেকে বলে, মনে মনে বলে, কবি একটুকু প্রশংসার জন্যে নিরবধি কাল অপেক্ষা ক'রে থাকে, আমিও তো সেই কবি, অপেক্ষা ক'রে থাকবো, যদি একটু প্রশংসা পাই।

তাহলে তুমি যাও, হাঁটো, বিব্রতভাবে গিয়ে আড্ডায় বসো, প্রত্যাশা ক'রে থাকো অপেক্ষা ক'রে থাকো অসম্ভবের; তোমার ওই সঙ্গী কবিদেরই মনে করো মহাকাল, তারা প্রসন্ন হ'লে মহাকাল প্রসন্ন হবে। মহাকাল কী? মহাকাল তো এই তুচ্ছরাই; তারাই তো মহাকালের প্রতিনিধি।

কবিতাগুলো বেরোনোর দু-এক দিনের মধ্যেই আলাউদ্দিন রেহমান ফোন ক'রে তার কাতর রক্তে কাঁপন ধরিয়ে দেয়, অতিশয়োক্তিতে তাকে পুলকিত ক'রে তোলে; এবং দুপুরে বিয়ার খাওয়াতে নিয়ে যায়।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত তোমার স্ক্রিপ্ট ফাসক্যালাস হইছে, কিন্তু তোমার কবিতা অসাধারণ, প্রত্যেকটা লাইন আমারে কাঁপাই দিছে। স্ক্রিপ্ট তোমারে ভাত দিবো বিয়ার দিবো, আর কবিতা তোমারে বাঁচাই রাখবো।

হাসান বলে, তুমি আমার অনুরাগী বন্ধু ব'লে এতোটা প্রশংসা করছো। কিন্তু আড্ডায় গেলে শোনা যাবে ওইগুলো কবিতাই হয় নি।

হা হা হা ক'রে আলাউদ্দিন বলে, কবিরা কবে আবার অন্য কবির প্রশংসা করে? আমরা গার্মেন্টস্‌রা অন্য গার্মেন্টসের যেমুন প্রশংসা করি না, কবিতার ব্যবসায়েও একই ব্যাপার, অগো প্রশংসা তুমি পাইবা না। তাছাড়া অরা পড়েও না, অরা পড়ে না খালি ল্যাখে মাথায় যা পাগলামি আসে।

আলাউদ্দিন রেহমানের প্রশংসা তাকে সম্পূর্ণ ভরাতে পারে না, ভেতরে একটা বড়ো শূন্যতা থেকে যায়, তার কবিতার যদি প্রশংসা করতো রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী তাহলেও ওই শূন্যতা ভরতো না; তার সাধ হয় ওই যারা শস্তা রেস্তোরাঁয় স্টার টানছে ময়লা চা খাচ্ছে খিস্তি করছে বুকের ভেতর থেকে একটি-দুটি পংক্তি উচ্চারণ করছে, তাদের কথা শুনতে।

একদিন হেঁটে হেঁটে শেখ সাহেব বাজার রোডের এক রিকশাঅলা রেস্তোরাঁর আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত হয় হাসান। রেস্তোরাঁর টেবিলে টেবিলে রিকশাঅলারা পিরিচে ঢেলে চা খাচ্ছে দু-হাতে টেনে রুটি খাচ্ছে উচ্চস্বরে রেডিও বাজছে, তাদের লুঙ্গিগামছার গন্ধে চারদিক ভ'রে আছে; আর একপাশে সমকালীন কবিরা মহাকাল তৈরি করছে। হাসান দেখে অতিশয় উত্তেজিত অনুপ্রাণিত শিহরিত তুরীয় গলিত হয়ে আছে কবি সালেহ ফরিদউদ্দিন আর কবি আহমেদ মোস্তফা হায়দার। তাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বেরোতে যাচ্ছে, নবাবপুরের আলেকজান্ড্রা প্রেসে লাইনোতে কম্পোজ শুরু হয়ে গেছে, তারা কবিতার প্রুফ দেখছে আর স্টার ফুঁকছে, চায়ের পেয়ালায় ছাই ঝাড়ছে, নীল বলপয়েন্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ, প্রথম প্রেমের মতোই উজ্জ্বল অমর শাশ্বত ব্যর্থ।

সালেহ ফরিদউদ্দিন বলে, আসো আসো দোস্ত আমাগো কবিতার বই বাইর হইতে যাইতেছে, প্রুফ দ্যাখতাছি।

হাসানের ভেতরটা কেঁপে ওঠে; সে জিজ্ঞেস করে, কারা বের করছে?

আহমেদ মোস্তফা হায়দার বলে, বাংলাবাজারের চৌধুরী ব্রাদার্স, তারা তরুণ কবিগো কাব্যগ্রন্থ বের করবে ব'লে ঠিক করছে, আমাগো দুইজন দিয়াই শুরু করছে, পরে অন্যগো কাব্যও বের করবো।

হাসানের ভেতরটা আবার কেঁপে ওঠে, একটা ঝিলিক ও একগুচ্ছ অন্ধকার তার ভেতর দিয়ে বয়ে যায়।

সালেহ ফরিদউদ্দিন কবিতার জন্যে পাগল, হয়তো পাগলের থেকেও বেশি, হয়তো সে মরবেও কবিতার জন্যে; ইংরেজিতে অনার্স ভর্তি হয়েছিলো, কবিতার জন্যে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগে; ও যে কীভাবে বেঁচে আছে হাসান জানে না। সালেহ হাসানের থেকে বছরখানেকের ছোটো, কিন্তু এর মাঝে অনেক বেশি কবিতা লিখে ফেলেছে হাসানের থেকে। তার সাথে হাসানের প্রথম দেখা হয়েছিলো ব্রিটিশ কাউন্সিলে। হাসানের তখন বেশ কিছু কবিতা বেরিয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়, তরুণ কবি হিশেবে একটা পরিচিতি তার গ'ড়ে উঠছে, এবং সে তা উপভোগও করছে। সে একটি টেবিলে ব'সে পাউন্ডের 'একগুচ্ছ নিষেধ' প'ড়ে বেশ মজা পাচ্ছিলো, তখন একটি

বিনম্র বিব্রত লাজুক তরুণ তার পাশে এসে দাঁড়ায়। গায়ে আগের দিনের দুই জেবের শার্ট, পাজামা পরা, চুল উস্কোখুস্কো, মুখে দু-এক দিনের না-কাটা দাড়ি, চোখ ম্লান উজ্জ্বল, শরীরটা অসহায়।

তরুণটি জিজ্ঞেস করে, আপনি তো হাসান রশিদ?

হাসান একটু গোপন গৌরব বোধ করে, তাহলে তাকে এখন অনেকে চেনে।

হাসান হেসে বলে, হুঁ, আর আপনি?

তরুণটি বলে, আমার নাম মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন, এবার ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছি। আমিও কবিতা লিখি।

হাসান বলে, আপনার কোনো কবিতা আমি এখনো পড়ি নি।

তরুণটি তখনই খাতা খুলে নিজের কবিতা সুর ক'রে পড়তে শুরু করে।

হাসান বলে, ব্রিটিশ কাউন্সিলে এভাবে কবিতা পড়লে সবাই বিরক্ত হবে, চলুন বাইরে যাই।

বাইরে গিয়ে হাসানের মনে পড়ে আলাউদ্দিন রেহমানকে, যে তার নাম বদলে দিয়েছিলো; হাসানের মনে হয় মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন নামেও চলবে না; একেও ভাঙতে হবে, নাম দিয়েই শুরু হবে তার ভাঙাভাঙি।

হাসান বলে, আপনার নামটি ঠিক আধুনিক কবির নামের মতো নয়, নামটি সম্ভবত বদলাতে হবে।

মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন বলে, আমি শুনেছি আপনিও নাম বদল করেছেন, আমিও আমার নাম বদলাবো।

কিছু দিন পর মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন নিজেকে ভেঙে হয় সালেহ ফরিদউদ্দিন, এবং কবিতার জন্যে উৎসর্গ ক'রে দেয় নিজেকে, অনবরত ভাঙতে থাকে নিজেকে। প্রথম দিকে সে চলতি বাঙলা বলতো, বেশ চমৎকারভাবে বলতো, পরে অন্যদের মতো সেও মিশ্র বলতে থাকে। হাসান কখনো মিশ্রতে যেতে পারে নি, সম্ভবত সে বেশি আড্ডায় যায় না আর বেশি মেশে না ব'লে।

সালেহর কবিতায় একটা এলোমেলো সুন্দর পাগলামো আছে, শব্দ নিয়ে পাগল কিশোরের মতো খেলা আছে, মাঝেমাঝে চমৎকার কাতর পংক্তি আছে, ছবি আছে, ভেতরে জীবনানন্দ আছে, এবং ওর মুখে একটা করুণ অসহায়তার আভা আছে। সালেহকে এজন্যে ভালো লাগে হাসানের।

সালেহর প্রিয় অভ্যাস নিজের কবিতা প'ড়ে শোনানো; শুধু প'ড়ে নয় নিজের কবিতা সে অনর্গল আবৃত্তি করতে ভালোবাসে।

ওর আরো একটি প্রিয় অভ্যাস অন্যের কোনো পংক্তি ভালো লাগলে সেটাকে নিজের কবিতার ভেতর সে অনায়াসে ঢুকিয়ে দেয়। তাই ছাপানোর আগে সালেহকে কবিতা শোনাতে ভয় হয়, হয়তো কোনো পংক্তি সে হরণ ক'রে নেবে, ছাপিয়ে ফেলবে, তখন পুরো কবিতাটিই বাতিল হয়ে যাবে।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকার সময় কোনো কোনো দিন হঠাৎ ছিন্নভিন্ন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থি মেঘের মতো তার ঘরে আসতো সালেহ, বলতো দোস, তোমার হলে খাইতে আসলাম তোমার হলের চ্যাপ্টা রান আর টেবিলগুলি আমার খুব ভালো লাগে, তোমার লগে খাইলে প্যাট ভরে।

সে নিজের কবিতা আবৃত্তি করতে থাকতো, এমন কি খাওয়ার সময়ও। হাসান সব সময়ই লজ্জা পায় নিজের কবিতা আবৃত্তি করতে, অন্যকে প'ড়ে শোনাতে; কিন্তু সালেহর এটা বড়ো আনন্দ। খাওয়ার পর নিজের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তার ক্যাপস্টেনের প্যাকেট থেকে একটার পর একটা সিগারেট ধরাতো, তারপর বলতো, দোস, পাচটা ট্যাকা দেও, সিনেমা দেখুম।

হাসান অবাক হতো, ও কী ক'রে ওই পচা দুর্গন্ধপূর্ণ আবর্জনা দেখে, আবার সিনেমার থেকে বহুদূরবর্তী কবিতা লেখে!

কবিতার জন্যে সে সব ছেড়েছে, এমন কি ছেড়েছে নিজের শরীরটিকেও, ওর শরীরটি নানাভাবে ভাঙছে ব'লে মনে হচ্ছে হাসানের।

হাসান জিজ্ঞেস করতো, শুধুই কি সিনেমা দেখবে, না কি অন্য কিছুও?

সালেহ লজ্জা পেয়ে বলতো, হল থিকা একবার ব্রোথেলেও যামু, দোস।

আহমেদ মোস্তফা হায়দার একটু অন্যমনস্ক ধরনের, অল্পতেই ভেঙে পড়তে চায়, কিন্তু ভেঙে পড়বে না ব'লেই মনে হয়; একটি দৈনিকে কাজ করে। পাশের বাড়ির একটি ইস্কুলে-পড়া মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিলো আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়, এবং কয়েক দিন পর ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলো। পালানোর জন্যে তারা নদী সাঁতরে গিয়েছিলো, কিন্তু মেয়েটিকে সে ধ'রে রাখতে পারে নি। ওই মেয়েটির জন্যে শোক চিরকালের জন্যে লেগে আছে আহমেদের চোখে মুখে চুলে কণ্ঠস্বরে। আহমেদ কাতর সেন্টিমেন্টাল প্রেমের কবিতা লিখে চলছে, প্রতিটি বাক্যের শেষে অশ্রুর মতো একটি ক'রে বিস্ময়চিহ্ন বসাচ্ছে, হয়তো সারাজীবনই বসাবে। হয়তো এজন্যেই আহমেদ মোস্তফা হায়দারকে ভালো লাগে হাসানের।

দুটি টেবিল ঘিরে চলছে জমজমাট আড্ডা, সিগারেটের ছাই জমছে পিরিচে কাপে; পাশাপাশি ব'সে প্রুফ দেখছে আহমেদ ও সালেহ। তাদের মুখোমুখি একটি নড়োবড়ো চেয়ারে বসে হাসান।

তাদের প্রুফের গুচ্ছগুচ্ছ নিউজপ্রিন্ট থেকে একটা ভেজা ভারি অদ্ভুত সুগন্ধ এসে ঢুকে যাচ্ছে হাসানের বুকের ভেতর, হয়তো কবিতার গন্ধ; আর নিউজপ্রিন্টের প্রুফে লাইনো অক্ষরগুলোকে নক্ষত্রের থেকেও জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে।

হাসান বলে, লাইনের অক্ষরগুলো দেখতে নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বলে, এগুলোর সম্ভবত সুগন্ধ পাচ্ছি।

সালেহ ফরিদউদ্দিন বলে, আরে দোস, লাইনো আর কবিতা একই কথা, লাইনোতে না ছাপলে কোনো কিছুই কবিতা মনে হয় না।

আহমেদ মোস্তফা হায়দার বলে, লাইনো মিস্ পোয়েট্রি, এই জন্যেই ত হাইট্টা হাইট্টা নবাবপুর যাই, যখন ঝনাৎ ঝনাৎ কইর‍্যা লাইনগুলি পড়ে মনে হয় আমার ভিতর থিকা ঝনাৎ ঝনাৎ কইর‍্যা কবিতার লাইন বাইর হইতেছে।

হাসান বলে, তোমার কবিতার লাইন তো ঝনাৎ ঝনাৎ ক'রে বেরোনোর কথা নয়, ওগুলো তো অশ্রুর মতো গড়িয়ে বেরোনোর কথা।

হৈ হৈ ক'রে ওঠে আহমেদ, দোস, অশ্রু জইম্যা সীসা হইয়া গ্যাছে, আইজ লাইনো অক্ষর হইয়া ঝনাৎ ঝনাৎ কইর‍্যা পড়ে।

খুব সুখী মনে হচ্ছে আহমেদ মোস্তফা হায়দার ও সালেহকে। ওরা প্রুফ দেখছে, কিন্তু শুধু বানান দেখছে না, পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখছে না, নতুন নতুন পংক্তিও যোগ করছে প্রুফে। আর প্রুফের চিহ্নগুলো দিচ্ছে পরম আদরে, ক্লাশের খাতায় ওরা কখনো এতো আদরে কিছু লেখে নি। প্রুফের চিহ্নগুলোকে রহস্যময় মনে হচ্ছে হাসানের; সে কখনো প্রুফ দেখে নি, তাই ওই চিহ্নগুলোর অর্থ সে বুঝতে পারছে না, তাকিয়ে থাকছে ওদের আঙুলের দিকে, কবিতার থেকেও রহস্যময় চিহ্নরাশি নির্গত হচ্ছে ওদের আঙুল থেকে।

সালেহর থেকে প্রুপের কয়েকটি পাতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে হাসান। একদিন কি এমন প্রুফ সেও দেখবে, বর্ণের ওপর দাগ দেবে, শব্দ ফাঁক করবে, যুক্ত করবে, পাতার পাশে এই বিস্ময়কর চিহ্নগুলো বসাবে? বেশ কয়েকটি বানান ভুল রয়ে গেছে সালেহর প্রুফে, কিছু বাক্যও অশুদ্ধ।

হাসান একটি শব্দ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, সালেহ এই শব্দটি কী?

সালেহ বলে, আরে দোস, শব্দটা হইল 'মুমুর্ষ', মানে মরা মরা।

সে কি শব্দটি ঠিক ক'রে দেবে?

হাসান বলে, সালেহ, শব্দটির বানান কিন্তু 'মুমূর্ষু'।

সালেহ বলে, আরে দোস, বানানে কি হয়, কবিতা হইলেই হইল, কবিগো বানান লাগে না, তুমি ত আবার আমাগো থিকা বানান বেশি জানো, দেও দেও দোস বানানটা শুদ্ধ ক'রে লই।

সালেহ বানানটি শুদ্ধ ক'রে নেয় প্রুফে।

সালেহ বলে, দোস, তোমারও একটা বই বাইর হওন দরকার। বিয়ার বয়সের মতন প্রথম কাব্যগ্রন্থ বাইর করনেরও একটা বয়স আছে।

তার হৃৎপিণ্ডটি বিপজ্জনকভাবে লাফিয়ে ওঠে, থামতে চায় না।

হাসান বলে, না, না, এখনো সময় আসে নি; আমি বেশি কবিতা লিখি নি।

আহমেদ মোস্তফা বলে, আরে দোস, বিনয় কইরো না, ছয় ফর্মা পদ্য তুমিও ল্যাখছো, অই যে দুইটা গুচ্ছ ছাড়লা তাতেই ত তিন ফর্মা হইয়া যাইবো। যাও, কবিতার বইর নাম ঠিক কইর‍্যা ফালাও।

হাসান বিব্রতভাবে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি আমার কবিতাগুলো পড়েছো?

সালেহ বলে, পরুম না ক্যান, ভালই ল্যাখছো দোস, যাও, কপি বানাই ফালাও, আমাগো বইর পর তোমার বইও চৌধুরী ব্রাদার্স বাইর করবো।

ওদের এই সামান্য কথা, ওরা তার কবিতা পড়েছে, এটাকেই হাসানের মনে হয় শ্রেষ্ঠ প্রশংসা; যেনো মহাকাল বলছে, কপি বানাই ফালাও, কবিতার বইর নাম ঠিক কইর‍্যা ফালাও।

কিন্তু চৌধুরী ব্রাদার্স কি তার নাম জানে? কী ক'রে জানবে? সে তো কখনো কোনো প্রকাশকের কাছে যায় নি, আর সে শুনছে প্রকাশকরা কবিতা পড়ে না, বই পড়ে না, বই ছাপে। তারা কি ছাপবে তার কবিতার বই? প্রথম কাব্যগ্রন্থ?

বাসায় ফেরার সময় রিকশা নিতে ইচ্ছে হয় না তার, সে হেঁটে হেঁটে একটির পর একটি ক্যাপস্টেন টানতে টানতে মহাকালের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, মহাকালের গ্রীবা দেখতে পায়, যেনো তাকে কে যেনো ডাকছে সে তার পেছন পেছন হাঁটছে, এই হাঁটা ফুরোবে না কোনোদিন। তার হাঁটা অনন্ত হোক, গন্তব্যহীন হোক, অশেষ হোক; সে শুধু হাঁটবে, কোনোদিন পৌঁছোবে না, হাঁটাই গন্তব্য। সে কি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রেসকপি বানাবে, তৈরি ক'রে ফেলবে পাণ্ডুলিপি, ঠিক ক'রে ফেলবে বইয়ের একটা নাম? চিরকালের জন্যে ওটিই হয়ে যাবে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম? শিউরে ওঠে হাসান, তার মনে হয় সে এমন কিছু সম্পর্কে ভাবছে যা সম্পর্কে বাস্তবে বাস ক'রে ভাবা উচিত নয়, ভাবা উচিত স্বপ্নে, বা একলা পানশালায় ব'সে প্রচুর বিয়ার পান করতে করতে। অনেকগুলো কবিতার পংক্তি অনেকগুলো চিত্রকল্প তার মাথায় ঝাঁকঝাক ভোরের টিয়ের মতো উড়ছে, এদিকে যাচ্ছে সেদিকে যাচ্ছে, সেগুলোকে সে খাতার খাঁচায় ধরতে পারছে না, ধরতে গেলেই ওড়া বন্ধ ক'রে দিচ্ছে ডাক বন্ধ ক'রে দিচ্ছে ওই বিস্ময়কর সবুজ স্বপ্নগুলো, সেগুলোকে কি সে ধরবে না? কী নাম রাখবে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থের? একটি একটি ক'রে নাম ভেসে আসতে থাকে, উড়ে যেতে থাকে; কোনোটিকেই তার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে না, আবার প্রত্যেকটিকেই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে বুকের ভেতরে।

হাঁটতে হাঁটতে নিজের কবিতার নাম ও পংক্তি একটি একটি ক'রে মনে আসতে থাকে হাসানের; এবং এক সময় সব কিছু এলোমেলো হয়ে তার মগজে খেলা করতে থাকে পূর্বপুরুষদের বিস্ময়কর পংক্তির পর পংক্তি।

পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে আরো কিছুখন ধ'রে ঝলুক তোমার কালো কেশে।

কবিতা, মানসী, তুই প্রাসাদের উপাসক, জানি। কিন্তু বল, যখন প্রদোষকালে, হিমেল বাতাসে, নির্বেদে, নীহারপুঞ্জে জানুয়ারি কালো হয়ে আসে– নীলাভ চরণে তোর তাপ দিবি, আছে তো জ্বালানি?

আনরিয়েল সিটি, আন্ডার দি ব্রাউন ফগ অফ এ উইন্টার ডন, এ ক্রাউড ফ্লোউড ওভার লন্ডন ব্রিজ, সো মেনি, আই হ্যাড নট থট ডেথ হ্যাড অনডান সো মেনি।

সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

থিংজ ফল অ্যাপার্ট; দি সেন্টার ক্যানট হৌল্ড; মেয়ার অ্যানার্কি ইজ লুজ্‌ড্‌ আপন দি ওয়ার্ল্ড' দি বেস্ট ল্যাক অল কনভিকশন, হোয়াইল দি ওয়র্স্ট আর ফুল অফ প্যাশোনেট ইন্টেনসিটি।

একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী; একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে, থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।

আই হ্যাভ সাং উইমেন ইন থ্রি সিটিজ। বাট ইট ইজ অল ওয়ান। আই উইল সিং অফ দি সান।

অ্যামাং টুয়েন্টি স্নোয়ি মাউন্টেন্স্‌ দি অনলি মুভিং থিং ওয়াজ দি আই অফ দি ব্ল্যাকবার্ড।

তুমি ভ'রে তুলবে, তাই শূন্যতা। তুমি আসবে উষ্ণতা, তাই শীত।

আই হ্যাভ মাইল্‌স্‌ টু গো বিফোর আই স্লিপ।

এই সব অবিস্মরণীয় জলের মতো ঘুরে ঘুরে বুকের ভেতর কথাবলা পংক্তির ভেতর থেকে আবার জেগে ওঠে নিজের পংক্তিমালা, এগুলোর পাশে তারগুলোকে কি খুব করুণ গরিব দেখাচ্ছে? নিজের পংক্তিমালার উদ্দেশে সে বলতে থাকে :

আমার করুণ গরিব বিপন্ন রুগ্ন পংক্তিমালা
তোমরা জেগেছো তোমরা জন্মেছো আমার ভেতর থেকে
আমি সামান্য, তোমাদের আমি অমরত্ব দিতে পারি নি
ক'রে তুলতে পারি নি অবিস্মরণীয়
তোমরা হয়তো কবিতাও হয়ে ওঠো নি
তোমরা হয়তো কারো হৃদয়েই ঢুকতে পারবে না
ঢুকতে পারবে না কারো রক্তে
কিন্তু তোমরা নতুন তোমরা এই ভয়ঙ্কর সময়ের
তাই তোমরা হ'তে পারো কাব্যগ্রন্থ।
তোমরা সূচনা, একদিন দেখা দেবে তারা
যারা বেঁচে থাকবে, হবে অবিস্মরণীয়।

কয়েক দিনের মধ্যে দুটি ঘটনা ঘটে যায়; হাসান দেখে তার ভেতর একটি অন্য হাসান জ্বলছিলো। সে-আগুন হঠাৎ বের হয়ে ঝলসে দেয় প্রথাগত ভাবনার মুখমণ্ডল। নিজের এ-রূপ দেখে সে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়, আর অন্যরা তাকে ভয় পেতে থাকে, যদিও সে মনে করে সে ভীতিকর নয় একটুও।

গাড়লদের একটি ভাঙাচোরা দুর্গ আছে, ওই পদ্মলোচনের নাম অ্যাকাডেমি; কিন্তু ওটা একটা গোশালা একটা ছাগশালা।

সেখানে পালিত হবে সুকান্তজয়ন্তী;– দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর গরু গাধা মোষ খচ্চর সিংহ সবাই সমাজতান্ত্রিক হয়ে উঠছে; ওই দুর্গের একজনের সাথে একদিন দেখা হয়ে যায় হাসানের, যে পছন্দ করে হাসানকে। হাসান ওই অনুষ্ঠানে স্থান পায় আলোচক হিশেবে। একরাশ বাজেকথা, ভজভজে বাজেকথা, হবে বটগাছের নিচে,

হাসান জানে, যেমন হয়ে আসছে বছরের পর বছর; কোনো পদস্থ মূর্খ সুকান্তের কবিতা থেকে একশো চল্লিশটা উদ্ধৃতি দিয়ে একটা চল্লিশ মিনিটের প্রবন্ধ পড়বে, তারপর আলোচকেরা প্রবন্ধের কথা ভুলে বিশ্বজগত ভুলে অনর্গল আবোলতাবোল বকবে প্যাচাল পাড়বে। বড়ো গৌরবের কথা, সে আলোচক হয়ে উঠছে। এবার একটি বিশেষ আকর্ষণও আছে, কলকাতা থেকে প্রধান অতিথি হয়ে আসছেন সুকান্তের ভাই। ভেতরে একটা কাঁপনও লাগে, সে মঞ্চে কথা বলতে পারবে তো, পা কেঁপে উঠবে না তো, গলা শুকিয়ে যাবে না তো, চোখে অন্ধকার দেখবে না তো? সে যখন জানতে পারে প্রবন্ধ পড়বে অধ্যাপক জমিরালি পিউবিক হ্যায়ার ড্রেসার, সে হো হো ক'রে ভেতরে ভেতরে হাসে, সুকান্তের সমস্ত কবিতাই হয়তো জমিরালি সাহেব উদ্ধৃত করবে প্রবন্ধে। সে আলোচনা করবে জমিরালির প্রবন্ধ? একবার ইচ্ছে হয় গিয়ে ব'লে আসে সে আলোচনায় অংশ নিতে পারবে না, জমিরালির প্রবন্ধে আলোচনার যোগ্য কিছু থাকবে না। জমিরালির মুখোমুখি হ'তে হবে তাকে? বিশ্ববিদ্যালয়ে জমিরালি তার শিক্ষক ছিলো, কিন্তু জমিরালির কাছে থেকে সে কিছু শেখে নি, যেমন কিছুই শেখে নি কদম আলি মনু মিয়া তোরাব উদ্দিন সোরাব চাকলাদারের কাছে; এবং সে তো জমিরালি ও অনেককেই ঘৃণা করে। জীবনে কখনো তাদের মুখ যে সে দেখতে চায় না। জমিরালি যে তার শিক্ষক ছিলো এটাও সে আর স্বীকার করতে চায় না বা স্বীকার করলে সব কিছু নিরর্থক হয়ে ওঠে। শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষক, কাকে বলে শিক্ষক? সে নিজেকে বলে, এটা এক আকস্মিক দুর্ঘটনা কে কখন কোথায় কোন অবস্থায় থাকে, ক্লাশকক্ষে কে শিক্ষক হিশেবে ঢোকে কে ঢোকে ছাত্র হিশেবে।

অনুষ্ঠানের বিকেলে হাসান গিয়ে দেখে লোকজন আসতে শুরু করেছে।

বটগাছের সামনে সারিসারি চেয়ার পাতা, সে একজন আলোচক ব'লে বেশ বিনয়ের সাথে এক কর্মকর্তা তাকে সামনের সারির একটি চেয়ারে বসান। খুবই বিব্রত বোধ করে হাসান। সে আলোচক? তার কাছে হাস্যকর মনে হয় এটা। ইচ্ছে করে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু সে চুপচাপ ব'সে থাকে, এমন সময় অধ্যাপক জমিরালি বেশ হাসিখুশি মুখে তাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। জমিরালি মনে করেছিলো হাসান উঠে তাকে সালাম দেবে, কিন্তু হাসান সে-সব কিছুই করে না। জমিরালির হাসিটা কালো হয়ে ওঠে। তার কালো হাসিটা দেখে বেশ সুখ পায় হাসান।

কিন্তু জমিরালি দমার পাত্র নয়, সে তার মর্যাদা রক্ষা ক'রে ছাড়বে।

সে আবার হেসে বলে, তুমি হাসান রশিদ না?

হাসান কোনো উত্তর না দিয়ে একটি পায়ের ওপর আরেক পা দিয়ে বসে, এবং পকেট থেকে বের ক'রে একটি সিগারেট ধরায়।

জমিরালি আবার হেসে হেসে বলে, আমার কি ভুল হচ্ছে, আমার কি ভুল হচ্ছে, তুমি হাসান রশিদ না?

হাসান ধুঁয়ো ছাড়তে ছাড়তে বলে, হু, আমি হাসান রশিদ, আর আপনি?

কেঁপে ওঠে জমিরালি, তুমি আমাকে চিনতে পারলে না, তুমি আমাকে চিনতে পারলে না? আমি তোমার শিক্ষক।

হাসান বলে, না, চিনতে পারলাম না। শিক্ষক? ইস্কুলের পর আমার আর কোনো শিক্ষক নেই।

জমিরালি টলতে টলতে অন্য দিকে পা বাড়ায়, মাটিতে প'ড়ে যাবে মনে হয়, তবে দু-তিনটি সালাম পেয়ে আবার সুস্থ বোধ ক'রে ঠিক মতো দাঁড়ায়।

মঞ্চে ছটি চেয়ার; এক সময় অনুরোধ করা হয় সভাপতি, প্রধান অতিথি, প্রাবন্ধিক, ও তিনজন আলোচককে মঞ্চে উঠতে। হাসান, সবচেয়ে তরুণ, সবার শেষে মঞ্চে উঠে উত্তরতম চেয়ারটিতে বসে। জমিরালি সভাপতি আর প্রধান অতিথির সাথে প্রচুর কথা বলতে চেষ্টা করছে; সে সম্ভবত পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে নি, প্রবন্ধ পড়ার আগে সুস্থ হয়ে উঠতে চাচ্ছে, কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠতে পারছে না। হয়তো সারাজীবনেও সে আর সুস্থ হবে না, অসুস্থতাটা থেকে যাবে, অন্তত হাসানের কথা মনে পড়লে; কিন্তু হাসান কয়েক বছর পর আজই চমৎকার সুস্থ বোধ করছে, তার মাংস প্রসন্নতা বোধ করছে।

হ্যাঁ, জমিরালি জমিরালির মতোই প্রবন্ধ লিখেছে, জমিরালির মতোই পড়ছে।

সময় কাটানোর জন্যে হাসান গুণে দেখতে চেষ্টা করছিলো জমিরালির প্রবন্ধে কটি উদ্ধৃতি আছে, পঁচিশটা গোণার পর ক্লান্ত হয়ে সে দূরের আমগাছের ডালে কয়েকটি ব্যস্ত কাকের কয়েকটি চঞ্চল শালিখের সৌন্দর্য দেখতে থাকে– দেখে মুগ্ধ হয়, চোখ ফিরিয়ে সামনের সারিতে বসা এক প্রচণ্ড উদ্ভিন্ন উল্লসিত চল্লিশোত্তরার দর্শনীয় সম্মুখভাগের পর্বতমালার উচ্চতা, ভর ও ওজন পরিমাপ করতে থাকে, অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তার বক্ষবন্ধনির রঙ, বিবর্ণতা, ও আকার নির্ণয় করতে থাকে। জমিরালির প্রবন্ধের থেকে এগুলো অনেক বেশি মননশীল, অনেক বেশি সৃষ্টিশীল; অনেক বেশি মনোযোগ দাবি করে। জমিরালি প্রবন্ধ পড়তে থাকে, প্রাবন্ধিক না হয়ে সে ধারাবর্ণনাকারী ও আবৃত্তিকার হ'লেই ভালো হতো; হাসানের মাথার ভেতর দিয়ে তখন ছুটে চলছে কয়েকটি কাক শালিখ, আর রানার, আঠারো বছরের দুঃসহ বয়স, বিদ্রোহ আজ বিপ্লব চারিদিকে, হিমালয় থেকে সুন্দর বন হঠাৎ বাংলাদেশ, সিগারেট, পূর্ণিমা চাঁদ যেনো ঝলসানো রুটি, এবং ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। ঝলসে ওঠে হাসান, আসলেই ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়? একটি গরম তাওয়া থেকে উঠে একটা তাপের প্রবাহ বয়ে যায় তার চামড়ার নিচ দিয়ে।

জমিরালির শেষ হ'লে প্রথমে আলোচনা করার জন্যে ডাকা হয় হাসানকে।

সে তরুণতম, সবচেয়ে নির্জ্ঞান, তাই শুরু হয় তাকে দিয়েই, এটাই সূত্র; প্রাজ্ঞ মহাজ্ঞানী মহাজনেরা, যাঁরা পাঁচশো পঁচিশ বছর ধ'রে কবিতা পড়েন না, যাঁদের কাছে কবিতা হচ্ছে 'চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন', বড়োজোর 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু', তাঁরা পরে আলোচনা করবেন, বাণী দেবেন; বৈদিক শাশ্বত শ্লোক যতো পরে উচ্চারিত হয় ততো বেশি প্রাজ্ঞ শাশ্বত শোনায়।

হাসান কাঁপতে কাঁপতে কোনোদিকে না তাকিয়ে মাইক্রোফোনে গিয়ে সরাসরি আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ তার মনে পড়ে যে সভাপতি, প্রধান অতিথি প্রমুখ বা ইত্যাদিকে স্মরণ ক'রে দু-চারটি বিশেষণ ব্যবহার করা বিধেয়, তাই সে তাঁদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে একটি দীর্ঘ বাক্য বলে– বাক্যটি ভেঙে পড়তে পড়তে শুদ্ধ হয়ে ওঠে, যদিও প্রত্যেককে তার মনে হচ্ছিলো স্তূপস্তূপ সম্মানিত পেটমোটা শূন্যগর্ভতা, অসার অপার অপদার্থতা; এবং সে আলোচনা শুরু করে।

হাসান বলে, অধ্যাপক জমিরালি সাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ তাঁর ৬১টি উদ্ধৃতির জন্যে; তবে প্রবন্ধটি শোনার সময় তার মনে হচ্ছিলো এটা কোনো মেধাবী স্নাতক শিক্ষার্থীর লেখা, এতে সুকান্তের কবিতার বিষয়, ছন্দ, অলঙ্কার সবই উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে, তাঁর প্রবন্ধ শুনে সুকান্তের কবিতার আবৃত্তি শোনার সুখ পাওয়া গেছে, শুধু সুকান্তের কবিতার মর্ম বোঝা যায় নি। তবে জমিরালি সাহেবকে ধন্যবাদ উদ্ধৃতিগুলোর জন্যে, যদিও ভুল রয়েছে কয়েকটি উদ্ধৃতিতে।

হাসান অনুভব করে শ্রোতাদের মধ্যে বিকট অদ্ভুত উল্লাস আর মঞ্চে অতল অশরীরী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে।

ঘোষক এসে তার হাতে এক টুকরো কাগজ দেয়, তাতে লেখা 'শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে আলোচনা করুন; আলোচনা সংক্ষিপ্ত করুন।'

হাসান কিছুক্ষণ ধ'রে কাগজটি পড়ে, তার ইচ্ছে হয় আর আলোচনা না ক'রে মঞ্চ থেকে নেমে বটগাছের ছায়া পেরিয়ে বিক্রমপুর পার্বতীপুর সাগাইয়া কিশোরগঞ্জের ধানক্ষেতে গিয়ে চাষবাস করতে, পুকুরে পলো বা ঝাঁকিজাল দিয়ে মাছ ধরতে, বাড়েখালির বাজারে গিয়ে দোকানে ব'সে ঘোলাটে চা খেতে।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে ওঠে, আপনে বলেন, হাসান রশিদ সাব, আপনে ঠিক কথাই বলতেছেন, আপনে বলেন, আমরা শোনতে চাই।

হাসান বলতে থাকে, সুকান্ত বাঙলা ভাষার একমাত্র বিশুদ্ধ মার্ক্সবাদী কবি, তাঁর কবিতা সাম্যবাদী ইশতেহারের কাব্যরূপ। বাঙলার কবিরা সকলের কবি, তাঁরা সাধনা করেন সকলের কবি হওয়ার, কিন্তু সুকান্ত সকলের কবি হওয়ার দুর্বলতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; তিনি সকলের কবি হ'তে চান নি, তিনি হ'তে চেয়েছিলেন একটি শ্রেণীর কবি। সুকান্ত সকলের কবি নন, তিনি একটি শ্রেণীর কবি, তিনি দুর্গত সর্বহারা শ্রেণীর কবি।

হাসান পেছনে উচ্চ 'না, না, না' শব্দ শুনতে পায়; তাকিয়ে দেখে সুকান্তের ভাই, প্রধান অতিথি, চিৎকার করছেন, না, না, সুকান্ত ছিলো সকলের কবি। সুকান্ত সকলের কবি, সুকান্ত সকলের কবি।

হাসান বলতে থাকে, সুকান্তের স্পষ্ট পক্ষ ও প্রতিপক্ষ ছিলো; তিনি চাইতেন প্রতিপক্ষকে উৎখাত ক'রে নিজের পক্ষের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে।

হাসান শুনতে পায় পেছনে কে যেনো বলছে, এইটা বলা ঠিক হইতেছে না, সুকান্তকে সকলের কবি বলতেই হবে।

হাসান বলে, সুকান্তের কোনো স্ববিরোধিতা ছিলো না। নজরুলের কথা মনে পড়ছে, নজরুল কয়েক বছর বিদ্রোহী ছিলেন, কিন্তু ছিলেন স্ববিরোধী, কন্ট্রাডিকশনে পরিপূর্ণ, কিন্তু সুকান্তে কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই।

পেছনে কে যেনো বলে, নজরুলরে টেনে আনা ঠিক হচ্ছে না, নজরুল সমালোচনার উর্ধ্বে।

হাসান বলে, সুকান্তের একটি পংক্তির সাথেই শুধু আমি দ্বিমত পোষণ করি, আর ওই পংক্তিটি তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ পংক্তির একটি; তিনি বলেছিলেন, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়; এটা খুবই স্মরণীয় পংক্তি, কিন্তু কবিতা শাশ্বত, ক্ষুধার রাজ্যেও পৃথিবী কবিতাময়।

সম্মানিত প্রাজ্ঞ আলোচকগণ এর পর আর সুকান্তের কবিতা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেন না, তাঁরা ঝাল ঝাড়া আলোচনা করেন হাসানকে; তাঁরা সবাই অকপটে নিন্দা জানাতে থাকেন হাসানের বক্তব্যের, তাঁরা বলেন সুকান্ত অবশ্যই সকলের কবি, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী অবশ্যই গদ্যময়; আর তরুণ অর্বাচীন আলোচনা হাসান রশিদ উদ্ধত দুর্বিনীত, সে কবিতা আর সাহিত্য বোঝে না, সে এমন এক পবিত্র সভায় স্থান পাওয়ার অযোগ্য।

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে দু-তিনজন প্রতিবাদ জানালে আলোচকেরা ভয় পান, তাঁরা সংযত হন; এমনকি সভাপতি হাসানের প্রশংসাও করেন।

হাসান চুপ ক'রে বসে থাকে, মাঝেমাঝে তার মনে হয় লাফিয়ে মাইক্রোফোন কেড়ে সে এসবের প্রতিবাদ করে, আবার মনে মনে সে হেসে ওঠে। সভা শেষ হ'লে আস্তে চুপচাপ নেমে আসে মঞ্চ থেকে, একাডেমির কেউ তার সাথে কথা বলে না। সুকান্তের ভাই তার দিক থেকে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেন।

কিন্তু মাঠে কয়েকটি তরুণ ও কয়েকটি তরুণ সাংবাদিক তাকে ঘিরে ধরে।

এই তাকে প্রথম ঘিরে ধরা, এই প্রথম তার কথা শোনার জন্যে নতুন সময়ের নতুন বিকেলের প্রথম উজ্জ্বল উৎসাহ।

একটি তরুণ বলে, আপনার কথা শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, এই নতুন কথা শুনলাম, সুকান্তকে নতুনভাবে বুঝলাম।

আরেক তরুণ বলে, কবিরাও যে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন, এই প্রথম দেখলাম। আগেও কয়েকজন কবির বক্তৃতা শুনেছি, তাঁরা আবোলতাবোল বলেন, কিছু পড়েছেন ব'লে মনে হয় না।

হাসান হেসে বলে, তাহলে আমি হয়তো কবি নই।

একটি তরুণ সাংবাদিক বলে, আমরা আপনার কথাগুলোই রিপোর্ট করবো, বহু দিন এমন বক্তৃতা শুনি নি। মিছে কথা শুনতে শুনতে আমাদের কান প'চে গেছে।

হাসান চঞ্চল হয়ে ওঠে, তার রক্তে কিসের যেনো সুর বাজে। সে গুছিয়ে কথা বলতে পারে তাহলে? নতুন কথা বলতে পারে? সত্য কথা? কবি হয়েও পারে কথা বলতে? কিন্তু সে কি কবি? কোথায় তার কবিতার বই?

এক বুড়ো এগিয়ে আসেন তার দিকে।

বুড়ো বলেন, আপনার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছি, বুড়ো বয়সে সভায় আসি সময় কাটানোর জন্যে, পচা পচা কথা শুনি মিথ্যে কথা শুনি, মনে হয় আমার সময় প্রভু কবে কাটাবেন; আজ সুখ পেলাম যে নতুন সত্য কথা বলার লোকও জন্ম নিচ্ছে আমাদের এই মিথ্যেবাদী সমাজে।

হাসান বলে, আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু দেখলেন তো সবাই আমাকে কেমন বকাবকি করলেন; দেখলেন তো সাহিত্য সমালোচনাও এখানে রাজনীতি।

বুড়ো বলেন, ওরা মিথ্যে বলেন ব'লেই মঞ্চে জায়গা পান। আপনার জন্যে আমার ভয় হচ্ছে, এমন সত্য কথা বলতে থাকলে ভবিষ্যতে আপনি মঞ্চে স্থান পাবেন না, সমাজেও হয়তো স্থান পাবেন না।

হাসান হাসতে হাসতে বলে, আমি শূদ্র হয়েই থাকবো, সমাজের বাইরে নর্দমার পাশের বস্তিতে থাকবো, আমার দিকে তাকাতে সমাজ ঘেন্না বোধ করবে।

সমাজ, হায় রে সমাজ, হায় রে সুন্দর ভাগাড়।

পরদিন ভোরে কয়েকটি বাঙলা দৈনিক দেখে শিউরে ওঠে হাসান।

তার কথা দিয়েই সংবাদের শিরোনাম করা হয়েছে, আর তার বক্তৃতারই রয়েছে বিশদ বিবরণ; সভাপতি, প্রধান অতিথির শুধু নাম রয়েছে। হায়, সভাপতি, হায়, প্রধান অতিথি। একটিতে তার ছবিও ছাপা হয়েছে, কিন্তু ছবিটা হাসানের পছন্দ হচ্ছে না, পাশ থেকে ছবিটা না তুলে কি মুখোমুখি তোলা যেতো না? হাসান পত্রিকাগুলোর সংবাদ বারবার পড়ে। এই কথাগুলোই কি সে বলেছে? মনে পড়ে সে বলেছে, তবে অনেক বাক্য ঠিক তার নয়, সাংবাদিকেরা নিজেদের মতো ক'রে লিখেছে। সে কি এমন বাসি বাক্য বলে?

তাহলে আমিও শিরোনামযোগ্য? সংবাদযোগ্য? হো হো ক'রে মনে মনে হাসে সে। আমিও তাহলে হয়ে উঠছি?

কিন্তু হয়ে ওঠা কাকে বলে, হাসান? নিজের সাথে কথা বলতে থাকে সে।

জমিরালি তো অনেক আগেই হয়ে উঠেছে, আরো হয়ে উঠবে; তুমি কি জমিরালি হ'তে চাও? হ'তে চাও ওই সভাপতি, প্রধান অতিথি? এক পাতিল বাসি পচা পুঁটি মাছের সিদলের মতো মঞ্চে মঞ্চে পচা বাসি কথা বলতে চাও তুমি? চাও না? তাহলে তোমার কিচ্ছু হবে না। কবিতা লিখে তুমি স্বীকৃতি পাবে? তোমার কবিতা ওরা বুঝবে? তুমি ওদের পেছনে পেছনে না হাঁটলে কখনো ওরা তোমার নাম নেবে? কখনো নেবে না।

আলাউদ্দিন রেহমান ফোন করে, দোস্ত, তোমার অনুষ্ঠানে যাইতে পারি নাই, কিন্তু কাগজে যা পড়লাম তাতে মনে হইতেছে তুমি তুলকালাম কাণ্ড বাধাই দিছো। মনে হইল সুকান্তজয়ন্তী না হইয়া হাসান জয়ন্তী হইয়া গেছে।

হাসান বলে, না, না, হাসানজয়ন্তী নয়, তুমি একটু ভুল করেছো, এর নাম হওয়া উচিত। হাসানক্ষয়ন্তী; আমার আর ভবিষ্যৎ নেই।

আলাউদ্দিন রেহমান বলে, কবির আর ভবিষ্যৎ কি, মরার পর অমর হওয়া ছাড়া।

হাসান বলে, তাহলে ওই ঘটনাটি শিগগির ঘটা দরকার।

আলাউদ্দিন রেহমান বলে, দোস্ত, একটা ভাল খবর আছে, তোমার জন্যে, ম্যাডাম মরিয়ম মাঝেমইদ্যেই তোমার নাম লয়, বলে তুমি আর আসলা না।

হাসান বলে, কার কথা বলছো, বুঝতে পারছি না তো।

আলাউদ্দিন রেহমান বলে, আরে দোস্ত, অই যে একদিন আসছিলা আর তোমারে হুইস্কি ঢাইল্যা খাওয়াইছিলো, সেই ম্যাডাম মরিয়ম; মাঝেমইদ্যেই তোমার কথা কয়। মনে হয় দিলে দাগ কাইট্যা গেছো।

হাসান বলে, খুবই চমৎকার মেয়ে ম্যাডাম মরিয়ম, তুমি বেশ ভালোই আছো।

আলাউদ্দিন রেহমান বলে, দোস্ত, ভাল থাকা কি অতই সহজ, মাইয়ালোক লইয়া? এই এরিয়ায় গার্মেন্টস্ আর প্রিন্সেসে তফাৎ নাই; মাইয়ালোক শুরুতে গোলাপের পাপড়ির মতন পাতলা আর শ্যাষে পাথরের মতন ভারি। দোস্ত, আমি ভাল থাকতে চাই না, মাঝেমইধ্যে আনন্দে থাকতে চাই। আইজ সন্ধ্যায় আমার বাইড়তে আইসো, দোস্ত, একটু খাঅনদাঅনগিলন যাইবো, আনন্দ করন যাইবো।

হাসান বলে, আচ্ছা, অবশ্যই আসবো।

আলাউদ্দিন বলে, আরও দুই চাইরটা কবিরেও বলতেছি, অই দোস্তরা গিলার বেশি চান্স্ পায় না, কিন্তু গিলতে চায়, অগো গিলাইতে ভালই লাগে, ইম্মরটালগো লগে খাইতে আমার ভালই লাগে, অগো যতই গাইল্লাই অরা কমবেশি ইম্মরটাল এইটা আমি বুঝি। অগো নাম থাকবো, আমার নাম থাকবো না।

হাসান বলে, তুমি গার্মেন্টস্, নও তুমি অ্যাড নও, তোমার ভেতর সেই কবিটি এখনো আছে, তুমি আবার কবিতা লেখো। তোমার কবিতা আমি পছন্দ করতাম। তোমার ভেতরেও অমর হওয়ার রোগ আছে, আলাউদ্দিন।

আলাউদ্দিন রহমান বলে, আরে দোস্ত, গার্মেন্টস্, আর পয়েট্রি একলগে যায় না, ট্যাকা বানাইতে চাইলে আর ইম্মরটাল হঅন যায় না। ইম্মরটাল হইতে হইলে সেক্রিফাইস করতে হয়, পাগল হইতে হয়, আয়নায় নিজেরে দেইখ্যা গুডমর্নিং বলার প্রতিভা থাকতে হয়, খানকি ট্যাকারে গুডবাই জানাইতে হয়, আমি পয়েট্রিরে গুডবাই জানাইছি, অই বিউটি আমার লগে শুইবো না, তোমাগো লগেই রাইত কাটাইবো। তয় ট্যাকার শরিলটাও শোঅনের মতন।

অনেক দিন পানটান হয় নি, হাসান একটু তৃষ্ণা বোধ করে, আজ সন্ধ্যায় বেশ পান করা যাবে, রক্তনালি ভ'রে নিতে হবে ব্ল্যাক লেবেলে। সন্ধ্যার বেশ পরে, কখন যাবে কখন যাবে ভাবতে ভাবতে একটু দেরি ক'রে, সে উপস্থিত হয় আলাউদ্দিন রেহমানের লালমাটিয়ার বিশাল বাড়ির তেতলার ফ্ল্যাটে।

হাসানকে দেখে হৈহৈ ক'রে ওঠে আলাউদ্দিন, শ্যাষম্যাষ কবি হাসান রশিদ আসছেন, বেশি দেরি করেন নাই, ঘণ্টা দুই দেরি করছেন, বইস্যা যাও, দোস্ত, খাও, গিলো।

ঢুকেই হাসান দেখে পাঁচ অমর পান ক'রে চলছেন।

আলাউদ্দিনের কাব্যরুচি গার্মেন্টস্ ইভেন্টিং অ্যাডে নষ্ট হয় নি– এজন্যেই ওকে আজো কবি মনে হয়, আলাউদ্দিন বেছে বেছেই গিলতে ডেকেছে, হাসানের ভালোই

লাগে। মাঝখানের দুটি সোফায় ব'সে আছেন কবি কামর আবদিন ও কথাশিল্পী করিম আহমেদ; এ-পাশের বড়ো সোফাটিতে বসেছে কবি শাহেদ আলতাফ ও কবি রাকিব সুলতান, ওপাশের আরেকটি বড়ো সোফায় একলা ব'সে আছে কবি সালেহ ফরিদউদ্দিন।

কথাশিল্পী করিম আহমেদটি সবার বড়ো, দু-খানা বই লিখে সাতখানা পুরস্কার পেয়ে তিনি সব সময় গাল ফুলিয়ে এবং সব কিছুর ওপর নিরন্তর বিরক্ত হয়ে থাকেন, সহজে কাউকে দেখতে পান না, তাঁর চোখ দুটি যে-কাউকে দেখার জন্যে নয়; হাসানের মতো সামান্যতাকে তিনি দেখতে পেয়েছেন ব'লে মনে হলো না। তিনি পান ক'রে চলছেন, পানপাত্রে হয়তো তাঁর নায়িকাদের নগ্ন সাঁতার কাটতে দেখছেন, চমৎকারভাবে কাঁপছেন, কারো দিকে তাকাচ্ছেন না, মনে মনে তিনি দস্তয়োভস্কির বা হেমিংওয়ের সাথে হয়তো কথা ব'লে চলছেন।

কবিদের মাঝে এই গদ্য কেনো? হাসান নিজেকে জিজ্ঞেস করে।

ওহ! কবি কামর আবদিন আবার এঁকে ছাড়া কোথাও যান না, তাঁরা দুজন দুজনকে প্রশংসা ক'রে ক'রে পুরস্কার পাচ্ছেন ও বুড়ো হচ্ছেন।

তাঁরা দেশকে একদিন দুটি অতুলনীয় বুড়ো উপহার দেবেন।

হাসান মনে মনে অনেকক্ষণ ধ'রে হাসে।

কবি কামর আবদিন এখন খুব সাড়া জাগাচ্ছেন, এবং তিনি আপাদমস্তক অকবিসুলভ ভদ্রজন, বুড়ো হ'লে লোকটি হয়তো এতো ভদ্র হবেন যে সব কিছু ঘিনঘিনে ক'রে তুলবেন; তাঁর চুল ঢেউ খেলানো, মুখখানি সুন্দর– এটা তাঁর বড়ো সম্পদ, এটা ভেঙে তিনি খেয়ে যাবেন আরো তিরিশ বছর, এবং তিনি কথা বলার সময় মৃদুমধুর তোতলান, সব সময়ই মধুর কথা বলেন।

কবি কামর আবদিন পান করতে করতে বলেন, আআআসুসুসুন হাসান রশিদ সাহেব, আআআপপপনার কককককথাই হহহচ্ছিলো।

আদিম অভদ্র কবিদের মধ্যে এমন দু-একটি ভদ্র উদাহরণ থাকা দরকার।

হাসান হাত নেড়ে সবাইকে সালাম দেয়, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

কবি শাহেদ আলতাফের মুখটি বিশাল, ঠোঁট ঝুলন্ত, চুল এলোমেলো, চোখ ঘোলাটে লাল: এর মাঝেই প্রচুর পান ক'রে ফেলেছে ব'লে মনে হয়, সে ঝিমোচ্ছে একটু পরই হয়তো সিঁড়ির নিচে গড়িয়ে পড়বে, হাসানের দিকে একবার তাকিয়ে বলে, পিয়ো, ইয়াং পোয়েট অ্যান্ড রেবেল, হ্যাভ এ গ্লাস।

শাহেদ আলতাফ হাত বাড়িয়ে দেয় হাসানের দিকে; কয়েক সের ওজন হবে শাহেদ আলতাফের হাতটি, হাসানের হাতটি ভেঙে যেতে চায়।

শাহেদ বলে, ইয়াং পোয়েট অ্যান্ড রেবেল, হাতটা তো রমণীদের মতো নরম।

হাসান বিব্রত হয়ে হাসে, বলে, কবির হাত।

শাহেদ আলতাফ বলে, পোয়েট, নাউ-এ-ডেইজ পোয়েটদের হাত ডাকাতদের হাতের মতো শক্ত হওয়া দরকার, লিরিকেল রোম্যান্টিসিজমের কাল কবে শেষ হয়ে

গেছে, এখন কবির হাত দিয়ে নর্দমা ঘাঁটতে হবে, চৌরাস্তায় গুণ্ডামি করতে হবে, রাবীন্দ্রিক চম্পক আঙুলে আর চলবে না; এ পয়েট নাউ-এ-ডেইজ ইজ অ্যান অ্যাকজিকিউশনার।

কবি রাকিব সুলতান এরই মাঝে উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে।

রাকিব সুলতান বলে, গিলতে আসতে দেরি করলে আর কবি হওন হইবো না ভাই, মদের গন্ধ পাইলেই কবিগো কুত্তার মতন ছুইট্টা আসতে হইবো শুয়োরের মতোন ঘোৎঘোৎ করতে করতে আসতে হইবো, মদই হইল কবি গো পানি কবিগো নিশ্বাস, হায়, তাও অই গরিবরা পায় না, গার্মেন্টস্‌রা পায় খানকির পুতরা পায়, কবিরা পায় না। বইল্যা দিলাম আপনে ভাই কবি হইতে পারবেন না, যান, গ্যারামে গিয়া চেয়ারম্যানের মোটাগাটা একটা মাইয়ারে বিয়া কইর‍্যা সুখে ঘরসংসার করেন, পোলাপান পয়দা করেন।

কবি সালেহ ফরিদউদ্দিন একপাশে তার প্রুফগুচ্ছ বিছিয়ে বসেছে, কাবাব আর নান খেয়ে চলছে, ও সব সময়ই ক্ষুধার্ত থাকে, এবং নিজের কবিতাও আবৃত্তি ক'রে চলছে, আর পান ক'রে চলছে।

সে বলে, আসো, দোস্ত, বসো আমার পাশে; তোমারে একটা কবিতা শুনাই।

সালেহ প্রুফগুচ্ছ থেকে একটি কবিতা পড়তে শুরু করে, ওর দেখে পড়তে হয় না, চোখ বুজেই সে আবৃত্তি করতে থাকে।

ম্যাডাম মরিয়ম ঢোকার সময়ই হাসানকে সালাম ও হাসি জানিয়েছিলো, এবং আরো দুটি তরুণীও তাকে সালাম ও হাসি জানিয়েছিলো; তারা পরিবেশকে খুবই সেনসুয়্যাল শৈল্পিক ক'রে রেখেছে, পাত্রে পাত্রে ব্ল্যাক লেবেল ঢেলে দিচ্ছে, এগিয়ে দিচ্ছে কাবাব আর নান।

হাসান কবি সালেহ ফরিদউদ্দিনের পাশে বসে।

ম্যাডাম মরিয়ম একটি প্লেটে কাবাব আর নান নিয়ে তার সামনে হেসে দাঁড়ায়, সে প্লেটটি নেয় ম্যাডাম মরিয়মের হাত থেকে। মরিয়মের একগুচ্ছ আঙুল তার আঙুলের ওপর একপশলা বৃষ্টিধারার মতো ঝ'রে পড়ে।

অনেক দিন পর তার আঙুলের ফাটা মাটির ওপর শ্রাবণ নামলো।

ম্যাডাম মরিয়ম তার গেলাশে হুইস্কি এবং চোখে বৃষ্টি ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করে, পানি না বরফ, কবি?

বিস্মিত হয়ে হাসান তাকায় তার দিকে, এবং হেসে বলে, পানিও নয় বরফও নয়, একটু সবুজ মেঘ একটু সোনালি কুয়াশা এক টুকরো নীল চাঁদ যদি থাকে।

মরিয়ম মধুরভাবে তাকায় হাসানের দিকে।

হাসান বলে, প্রিয়, এখানে আমি একা কবি নই, একা আমাকে কবি বললে অন্যরা আপনাকে খুন ক'রে ফেলবে। সেনাপতিরাও অবহেলা সহ্য করে, কিন্তু কবিরা করে না, কবিরা নিজেকে ছাড়া আর কাউকে কবি মনে করে না।

মরিয়ম তার গেলাশে পানি ঢালতে ঢালতে বলে, খুন করুক, আপনারে এই একটু সবুজ ম্যাঘ দিলাম, কবি।

হাসান মরিয়মের মুখের দিকে তাকিয়ে গেলাশে একবার চুমুক দেয়।

আলাউদ্দিনও বসে তার পাশে, হাতে অমিশ্র হুইস্কির গেলাশ, কোনো পানি নেই বরফ নেই। সে কাঁপতে কাঁপতে এক চুমুকে অর্ধেকটাই শেষ করে ফেলে, তার ঝকঝকে গায়ের রঙ ঝিলিক দিয়ে ওঠে, এবং বলে, ইম্মরটালগো লগে পান করতে পাইর‍্যা আমি নিজেরে ধইন্য বোধ করতেছি।

আলাউদ্দিন সম্ভবত এর আগেই দু-এক গ্লাশ গিয়েছে।

কবি কামর আবদিন খুবই সামাজিক ভদ্র, তিনি জিজ্ঞেস করেন, আলাউদ্দিন সাহেব, ভাভাভাবীকে তো আআআজ দেখছি না।

তাঁর ভদ্রতায় মুগ্ধ হয় হাসান, নিজেকে অভদ্র মনে হয়; আলাউদ্দিনের বাসায় এসে প্রথমেই তো তার উচিত ছিলো ভাবীর সংবাদ নেয়া।

তবে কামর আবদিনের ভদ্রতা ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

আলাউদ্দিন আরেক চুমুকে গেলাশটি শেষ ক'রে ম্যাডাম মরিয়মের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, তারে কি দ্যাখনের সাধ এত তারাতারিই হইয়া গেলো আপনের আবদিন ভাই? এখনও ত রাইত বেশি হয় নাই, এক গেলাশও শ্যাষ করেন নাই, আরও কয়েক গেলাশ গিলেন, তারপর তারে দেখনের কথা ভাইবেন। রাইত ফুরাই যায় নাই।

খুবই বিব্রত হন ভদ্র কবি কামর আবদিন, তাঁর হাত থেকে গেলাশটি প'ড়ে যেতে চায়; গেলাশটি ধরতে ধরতে তিনি লাজুকভাবে বলেন, না, না, কিকিকিকিছু মমমনে কককরবেন না, আমি কিছু খারাপ মিন করি নি, আআআমি এএইভাবেই জিজিজিজ্ঞেস কককরেছিলাম। ভাবী খুব সম্ভ্রান্ত মহিলা।

আলাউদ্দিন বলে, ওই সব সম্ভ্রান্তফভ্রান্ত মহিলার কথা ভুইল্যা যান, আইজ ম্যাডাম মরিয়ম আছে, লগে আরও দুইজন প্রিন্সেস আছে।

কবি রাকিব সুলতান বলে, অই হারামজাদা আলাউদ্দিন, তুই ত আমার আগেই মাতাল হইয়া যাইতেছছ, আগে আমারে মাতাল হইতে দে, এইটা আমার অধিকার, তারপর তুই মাতলামি করিছ। আসল কথাটা কইয়া দে যে ভাবী দ্যাশে নাই, দিল্লি দার্জিলিং গ্যাছে।

আলাউদ্দিন বলে, আর ফিইররা না আসলে বাচি, ওয়াইফ আর হুইস্কি আর কবিতা একলগে চলে না। এই দ্যাখেন না, ওয়াইফগো ডরে আপনেরা নিজেগো বাড়িতে গিলেন না, বাড়িতে ঢোকনের আগে পানজর্দা খাইয়া লন।

শাহেদ আলতাফ বলে, আরে ছালা, বউটউ লইয়া ডিস্কাশন ছারো, পান করো আর কবতে লইয়া কথা বলো, কবতেই আমাদের ফিয়াঁসে, কবতেই আমাদের ওয়াইফ অ্যান্ড মিস্ট্রেস, কবতেই আমাদের ইটারন্যাল গডেজ। ওয়াইফ থাকবে হারামজাদাদের, আমাদের কোনো মেয়েলোক ওয়াইফ থাকবে না। হিজড়েদেরই ওয়াইফ লাগে, কবিদের ওয়াইফ লাগে না; দি পয়েটস ডোন্ট নিড ওয়াইভস্।

রাকিব সুলতান বলে, ওস্তাদ, কইতে থাকো, কবতের স্তব গাইতে থাকো, কবতের জইন্যে আমি হাজেরার লগে ঘুমাইতে অস্বীকার করছি, কবতের জইন্যে আমি পশ্চিম পাড়ার সুনীল্যার মতন অমৃতা অস্বীকার করছি।

আলাউদ্দিন বলে, শালা, অইটা কোনো কবি না, অইটা একটা সেন্টিমেন্টাল স্টোরিটেলার, অইটার নাম মুখে আনিছ না। অই শালা কবি না।

রাকিব সুলতান বেশ খেয়েছে, সে ঢকঢক ক'রে খায়, সে গড়িয়ে পড়ে, উঠতে উঠতে বলে, তাইলে কি আমি এই পোস্ট-এডিটরিয়াল রাইটার কামর আবদিনের কথা বলুম? ও আইজ পর্যন্ত একটা মেমোরেবল লাইন লিখছে? ও ত একটা ঈশ্বরগুপ্ত। এই পাড়ার মুসলমানরা অরে লইয়া মাতামাতি করন শুরু করছে, আগে জসিমুদ্দিন আছিল, এখন অরে লইয়া ফালাফালি করছে, ও আমার এইটার কবি।

রাকিব সুলতান দাঁড়িয়ে ট্রাউজারের জিপ টানতে টানতে বলতে থাকে, ও আমার এইটার কবি, ও হইল পোস্ট-এডিটরিয়াল রাইটার, ও হইল রিপোর্টার, রিপোর্টিং আর কবতে এক জিনিশ না। কবিরা মহাকালের জইন্যে লেখে, ও লেখে একদিনের জইন্যে; ওর কবিতা পাঁঠার পদ্য, তপসে মাছের পদ্য।

কামর আবদিন বিব্রত হয়ে তোতলাতে শুরু করেন, তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে, এবং বলেন, আআআমি যা লিলিলিখেছি আআআগে তা লিলিলিখুন, ওই সব নাগরিক ইমেজারি তৈরি করুন, পরে এএএইসব বববলবেন।

রাকিব সুলতান গিয়ে দাঁড়ায় কামর আবদিনের সামনে, সে জিপ খুলতে থাকে, কামার আবদিন ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

রাকিব সুলতান বলে, তুমি আমার এইটা ল্যাখছো, অই ল্যাওরা আমি লিখুম না, কবিতা লিখতে গিয়া আমি জার্নালিজম করুম না। কবিতা হইল পিউরেস্ট ডায়মন্ড, আর তুমি কবিতার নামে কয়লা চালাইতেছ।

সালেহ ফরিদউদ্দিন নিজের কবিতা আবৃত্তি ও পান করা থেকে জেগে উঠে বলে, মহাকবি জীবনানন্দের আগে আর পরে বাঙলায় কোনো শালা কবিতা ল্যাখে নাই, আমি দুই একটা ল্যাখতেছি। আবদিন ভাই ত আঠার মাত্রার গদ্য লেখে।

কামর আবদিনকে বাঁচাতে কাঁপতে কাঁপতে গেলাশ উল্টে ফেলতে ফেলতে ধরতে ধরতে এগিয়ে আসেন কথাশিল্পী করিম আহমেদ।

তিনি খশখ'শে পুরস্কারপ্রাপ্ত গলায় বলেন, কবি কামর আবদিন বাঙলা কবিতায় যুগান্তর এনেছেন, তিনি নকশিকাঁথা সোজনবাদিয়ার কবিতাকে খালেঝিলে ফেলে দিয়ে কবিতাকে নাগরিক কবিতা ক'রে তুলেছেন, তিনি আমাদের টি এস এলিয়ট, তাঁর কবিতা বোঝার শক্তি আপনাদের নেই।

রাকিব সুলতান এবার করিম আহমেদের দিকে তার জিপ টানাটানি নিয়ে এগিয়ে যায়, বলে, আমার চুলমার্কা দুইখানা পিরিতির গল্প লেইখ্যা আপনে সাতখানা পুরস্কার পাইছেন, আপনে অইগুলি লইয়াই থাকেন, কবিগো মইধ্যে কথা কইতে আইসেন না। নাগরিকতা আর এলিয়টের এইটা বোঝেন আপনে, হইছেন ত মুসলমানের নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সেইটা হইয়াই থাকেন।

কামর আহমেদ চিৎকার ক'রে ওঠেন, আমাকে একটা সিগারেট দিন, আমাকে একটা সিগারেট দিন।

তিনি আসন থেকে মেঝের ওপর প'ড়ে যেতে যেতে আসন জড়িয়ে ধরেন।

কামর আবদিন তাঁকে বলেন, করিম ভাই, আপনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিলো, আপনার সিগারেট খাওয়া ঠিক হবে না।

করিম আহমেদ বলেন, রাখুন হার্ট অ্যাটাক, আমাকে একটা সিগারেট দিন, আমাকে একটা সিগারেট দিন।

হাসান উঠে গিয়ে তাকে একটি সিগারেট দেয়।

করিম আহমেদ সিগারেটটি ঠোঁটে রাখতে রাখতে একবার সিগারেটটি নিচে প'ড়ে যায়, তিনি সেটি খুঁজতে থাকেন।

হাসান সিগারেটটি তুলে তাঁর হাতে দেয়।

তিনি বলেন, আগুন দিন, আগুন দিন।

হাসান আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে দেখে করিম আহমেদের কোলে একটা ছোটো অদ্ভুত বোতল, বোতলটা পিছলে প'ড়ে যাচ্ছে।

হাসান বোতলটা তুলে বলে, এটা কী?

করিম আহমেদ চিৎকার ক'রে বলে, এটা সিভাস রিগাল, এটা সিভাস রিগাল, এটা আমার জন্যে, আমি এটা ছাড়া খেতে পারি না।

রাকিব সুলতান এসে বোতলটি ছিনিয়ে নেয় হাসানের হাত থেকে, চিৎকার ক'রে বলে, কবিরা খাইবো ব্ল্যাক লেবেল, আর সিভাস রিগাল খাইবো একটা থার্ড ক্লাস নভেলিস্ট, এইটা হইতে পারে না।

করিম আহমেদ হাহাকার ক'রে ওঠেন, আমার সিভাস রিগাল, আমার সিভাস রিগাল; সিভাস রিগাল ছাড়া আমি খেতে পারি না।

আলাউদ্দিন ঢুলতে ঢুলতে বলে, দ্যাখো শালা নভেলিস্টরা কিৎনা ছোটোলোক, ঘরে ঢুইক্যাই সিভাস রিগালের বোতলটা নিজের প্যাটের ভিতর ঢুকাইয়া রাখছে। কবিরা যদি ব্ল্যাক লেবেল টানে তাইলে নভেলিস্টগো টাননের কথা মেথরপট্টির কেরু, ব্যাটারি ভিজাইন্যা অ্যাসিড।

রাকিব সুলতান ঢকঢক ক'রে বোতল থেকেই গলায় ঢালতে থাকে সিভাস রিগাল, এবং টলতে টলতে মেঝের ওপর ব'সে পড়ে।

করিম আহমেদ কেঁপে কেঁপে বলেন, হাসান সাহেব, আরেকটা সিগারেট দিন।

হাসান বলে, আপনার আর সিগারেট খাওয়া ঠিক হবে না।

করিম আহমেদ রেগে ওঠেন, ধমক দিয়ে বলেন, আরে হাসান সাহেব, আপনি তো খুবই কৃপণ লোক, একটা সিগারেট, তাও দিতে চাচ্ছেন না।

শাহেদ আলতাফ অনেকক্ষণ চুপচাপ পান করছিলো, অল্প অল্প ঢুলে পড়ছিলো, এক সময় সব কিছু তার অসহ্য মনে হয়; সে ব'লে ওঠে, শালা এই গাঁইয়া কবিয়ালগো সাথে পান করতে আসার থিকা মেথরপট্টিই ফার বেটার, শালারা কবিতাও ল্যাখতে জানে না পানও করতে জানে না। আমি এখনই বেরিয়ে বাদামতলি চ'লে যাবো, সেইখানে গোলাপির সাথে মদ খাবো।

শাহেদ আলতাফ একবার উঠতে গিয়ে ব'সে পড়ে; বিড়বিড় করতে থাকে, গোলাপি গোলাপি, পেতে দে তোর পবিত্র দেহখানা।

পান করতে বেশ লাগছে হাসানের, বেশ লাগছে তার এই পরিবেশ। কবি, এখানে পান করছে কবিরা, যারা এই শহরের রাষ্ট্রের কেউ নয়, যারা নির্বাসিত এই শহর রাষ্ট্র বন্দুক কামান থেকে,– হাসানের মনে হ'তে থাকে–, কিন্তু তারাই এই সময়। আজ সন্ধ্যার আজ রাতের এই অসামান্য সময়টুকুই শুধু স্মরণীয় শুধু উল্লেখযোগ্য সারা শহরের আজকের ইতিহাসে, আর কিছু স্মরণীয় নয় উল্লেখযোগ্য নয়। কয়েক দিন আগে সে একটা ঝকঝকে উচ্চ আমলার চকচকে বাসায় পান করতে গিয়েছিলো, চারজনকে বসতে হয়েছিলো পৃথিবীর চার প্রান্তে, এবং তারা কেউ কথা বলছিলো না, যে যার পাত্র নিয়ে অল্প অল্প খাচ্ছিলো, হয়তো তারা ফাইল ঘাঁটছিলো, উন্নতি মাপছিলো, টাকা হিশেব করছিলো, সভ্যতা বজায় রাখছিলো, আর হাসানের মনে হচ্ছিলো সে একটা গোয়ালঘরে ব'সে সাত দিনের বাসি পান্তাভাত লবণ ছাড়া খাচ্ছে। বারবার সে নিজেকে বলছিলো, হাসান, দ্যাখো, প্রতিভাহীনতা কাকে বলে, ভালো ক'রে দেখে নাও, সাফল্য হচ্ছে এই রকম, চুপচাপ, অতিশয় সভ্য, চারপ্রান্তে, নীরবে নিঃশব্দে পান্তাভাত। একটু পরেই সে বেরিয়ে এসেছিলো, ঠিক করেছিলো ওই সাফল্যের পান্তাভাতে সে আর যাবে না।

পান করতে তার বেশ লাগছে, সব কিছু সুন্দর মনে হচ্ছে, কয়েক দিন আগে যে-রঙিন ট্রাকটি তাকে চাপা দিতে দিতে স'রে গিয়েছিলো, সেটির মুখ সে দেখতে পাচ্ছে- সুন্দর বিষণ্ন পবিত্র মুখ, সেটির গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, এবং তার ভেতর থেকে দু-তিনটি কবিতা না পাখি না কী যেনো গড়িয়ে গড়িয়ে বেরোতে চাচ্ছে, কয়েকটি চিত্রকল্প কেঁপে কেঁপে বারবার হানা দিচ্ছে, কয়েকটি শব্দ প্রজাপতির মতো উড়ছে ঘুরছে উড়ছে বসছে কাঁপছে নাচছে; একটু একটু ঘোলাটে বোধ করছে সে নিজেকে, এক অসম্ভব সরলতা তার ভেতরটাকে কোনোদিন না-দেখা দিঘির জলের মতো দোলাচ্ছে। সে বিষণ্ন হয়ে উঠছে তাদের পুকুরের পাড়ের নিঃসঙ্গ হিজল গাছটির ছায়ার মতো। হিজল, তুমি আমার থেকে পাঁচ বছর দূরে আছো আমি আছি তোমার থেকে, কেমন আছো, তুমি? কী রকম ব্যথিত সুদূর নক্ষত্রের মতো মনে হচ্ছে সবাইকে, কী যেনো তারা জয় করতে চাচ্ছে যা তারা কখনো জয় করতে পারবে না, তারা চিরপরাভূত থেকে যাবে। আমি এই চিরপরাজিতদের একজন, আমি এই চিরপরাজিতদের একজন হ'তে চাই, যেমন পরাজিত রবীন্দ্রনাথ, যেমন পরাভূত সুধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ বুদ্ধদেব, যেমন পরাভূত বদলেয়ার র‍্যাঁবো মালার্মে ইয়েট্স্, এবং আরো অজস্র মত্ত উন্মত্ত উদ্বাস্তু।

হাসান নিজের পাত্রটিকে ভ'রে নেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ায়, একটুকু কাঁপে, মধুর কম্পনটুকু সে উপভোগ করে, সে নির্ভার হচ্ছে, মধ্যরাতে হয়তো কোনো খ'সে পড়া পালকের মতো উড়ে যাবে বিলের আকাশে, বৃষ্টির জলের মতো লাল ফুলের হিজল গাছের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাবে ছোট্ট কোনো পুকুরের দিকে।

সে দেখে আলাউদ্দিন নদীর পাড়ে একটি বিশাল নৌকোর মতো কাৎ হয়ে আছে, মেঝের ওপর শাশ্বত বিকলাঙ্গ ভিখিরির মতো প'ড়ে আছে রাকিব সুলতান, চুপচাপ পান করছে কামর আবদিন, করিম আহমেদ, শাহেদ আলতাফ; হয়তো তারা অন্য কোনো নক্ষত্রে আছে যার নাম তারা জানে না; সালেহ ফরিদউদ্দিন তার প্রুফগুচ্ছ জড়িয়ে ধ'রে কাঁদছে।

মরিয়ম এসে তার পাত্রটি ভ'রে দেয়, একগুচ্ছ মেঘ তার আঙুলে লাগে।

মরিয়মকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, ওর চুলের ভেতর একরাশ আঙুল প্রবাহিত ক'রে দিতে ইচ্ছে করছে, ওর শাড়ির ভেতর দিয়ে একটা কোমল নরম সাপের মতো এঁকেবেঁকে ওপরের দিকে উঠে বিড়া পাঁকিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে, ওর বুকে একটা ছোটো পাখি হয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

মরিয়ম বলে, কবিদের মদ খাওয়া খুব সুন্দর, দেখতে আমার ভাল লাগে।

ঝলক দিয়ে উঠছে মরিয়ম।

মরিয়মের পায়ের তালু দুটি কেমন? সেখানে ওষ্ঠ ছোঁয়াতে ইচ্ছে করছে; ও কি শোয় আলাউদ্দিনের সাথে, তা শোক; ওর ঠোঁটে হুইস্কি হয়ে লেগে থাকতে ইচ্ছে করছে, ওর গ্রীবায় একটা লাল তিল হয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে; ওকে একটি কবিতার পংক্তি ক'রে চিরকালের জন্যে অমরতা দিতে ইচ্ছে করছে।

হাসান বলে, কবিরা ব্যর্থ, ব্যর্থতা সব সময়ই সুন্দর।

মরিয়ম বলে, আমার কাছে আপনে সুন্দর।

হাসান মরিয়মের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, ওর মুখে একটা উজ্জ্বল শহর দেখতে পায়, যেখানে জ্বলছে অজস্র নিদ্রাতুর বাতি।

হাসান সালেহ ফরিদউদ্দিনের দিকে এগিয়ে যায়, একটু কাঁপছে সে, সালেহের কান্না আরো বেড়ে গেছে।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কাঁদছো কেনো সালেহ?

সালেহ বলে, আমার এই কবিতাগুলো অমর হবে না, এগুলো জীবনানন্দের কবিতার মতো হবে না।

সালেহ কাঁদতে থাকে; আজ রাতে অনন্তের কানে সে তার কান্না পৌছে দিতে চায়, হাসানের মনে হয় সে নতুন কবিতার কান্না শুনছে।

তার ভেতরেও কেঁদে চলছে তার কবিতাগুলো।

রাকিব সুলতান মেঝে থেকে হুহু ক'রে কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসে, হাসানকে দেখতে পেয়ে সে উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে হাসানের পা জড়িয়ে ধরে।

রাকিব সুলতানের কান্নার শব্দে সবাই যেনো অবলুপ্ত অতলতা থেকে এক অপরিচিত অস্বস্তিকর বাস্তবতায় জেগে ওঠে।

হাসানের পা জোরে জড়িয়ে ধ'রে চুমো খেতে থাকে রাকিব, এবং কাঁদতে থাকে যেনো এইমাত্র তার সবচেয়ে প্রিয়জনের মৃত্যু হয়েছে, আর বলতে থাকে, আমারে মাফ কইর‍্যা দেও, দোস্ত, মাফ কইর‍্যা দেও, বাঙলা কবিতা, মাফ কইর‍্যা দেও, চণ্ডীদাস,

মাফ কইর‍্যা দেও, মুকুন্দরাম, আমি বড়ো পাপী, আমি নদীর কাছে পাপ করছি, নারীর কাছে পাপ করছি, ম্যাঘের কাছে পাপ করছি, অক্ষরবৃত্তের কাছে পাপ করছি, পাখির কাছে পাপ করছি, আমারে মাফ কইর‍্যা দেও।

হাসান তাকে টেনে তুলতে তুলতে বলে, তুমি কী করছো, কী করছো রাকিব, ওঠো, তুমি কোনো পাপ করো নি, পাপ আমরা সবাই করেছি, তুমি কোনো পাপ করো নি, কবিরা সবাই পাপী।

রাকিব সুলতান পাপের ভারি বোঝা মাথায় নিয়ে পা থেকে পায়ে ছুটতে থাকে। পাপের ভারে সে হাঁটতে পারছে না, কাঁপছে, প'ড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে ছুটছে; সব মানুষের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে উঠতে হবে তাকে।

সে ঢুলতে ঢুলতে গিয়ে জড়িয়ে ধ'রে কামর আবদিনের পা।

কামর আবদিন ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠেন, এমন বর্বর তিনি আগে দেখেন নি, তাঁর হাতের পাত্রটি দূরে ছিটকে পরে হাহাকার করতে থাকে, পারলে তিনি দৌড়ে বেরিয়ে যেতেন পৃথিবী থেকে। বেরোতে না পেরে তিনি কাঁপতে থাকেন।

রাকিব সুলতান কামর আবদিনের পা জড়িয়ে ধ'রে চুমো খেতে খেতে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, আমারে মাফ কইর‍্যা দেও, ভাই, তুমি আমার অগ্রজ, তুমি আমার বাবা, তুমি আমার পিতামহ, তোমার কাছে আমার পাপের শ্যাষ নাই, তুমি হইলা আমাগো রবীন্দ্রনাথ, আমাগো জীবনানন্দ, আমাগো এলিঅট; তোমার কবিতা ছাড়া আর কোনো কবিতা নাই, আমারে মাফ কইর‍্যা দেও, তুমি ছাড়া আর কোনো মুসলমান কবিতা ল্যাখতে জানে না, তুমিই শুধু থাকবা, আমরা থাকুম না, আমারে মাফ কইর‍্যা দেও।

কামর আবদিন বুঝতে পারেন না কী করবেন। তিনি রাকিব সুলতানকে জড়িয়ে ধ'রে বলতে থাকেন, এ আআআপনি কী কককরছেন, এ আপনি কি বলছেন, আপনি আআমাদের বড়ো কবি হহবেন, আমার কবিতা কিছু না কিছু না, আপনার কবিতা পিউউর ককবিতা, আমি আজো শুদ্ধ কবিতা লিলিলিখতে পারি নি।

রাকিব সুলতান কামর আবদিনের পা ছেড়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে করিম আহমেদের পায়ে।

করিম আহমেদ বলেন, এ কি অসভ্যতা, এ কি গ্রাম্যতা, এ কি ভালগারিটি।

রাকিব কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমারে মাফ কইর‍্যা দেও, ভাই, তোমার কাছে আমি অনেক পাপ করছি, তুমি হইলা আমাগো হেমিংওয়ে, আমাগো টমাস মান, আমাগো জেমস জয়েস, আমাগো লরেন্স; আমারে তুমি মাফ কইর‍্যা দেও। কবতে কিছু না, বেশ্যার দালালও কবতে ল্যাখতে পারে, নভেল ল্যাখার জইন্যে দরকার জিনিয়াস। তুমি আমাগো জিনিয়াস।

রাকিব সুলতান তাঁর পা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পথ খুঁজতে থাকে, পথ খুঁজে পায় না; সে কাঁদতে থাকে, হাজেরারে, তর কাছে আমি পাপ করছি, তর বুকের কাছে আমি পাপ করছি, তর ঠোঁটের কাছে আমি পাপ করছি, তর শাড়ির কাছে আমি পাপ করছি, আমারে তুই মাফ কইর‍্যা দে।

হুহু ক'রে কাঁদতে থাকে রাকিব সুলতান।

কয়েক দিন ধ'রেই হাসান ভাবছে একবার বাংলাবাজারের চৌধুরী ব্রাদার্সে যাবে, কথা ব'লে দেখবে তাঁরা তার প্রথম কাব্যগ্রন্থটি বের করবেন কি না? এককেবার সে খুবই অনুপ্রাণিত বোধ করে, পরেই মনে হয় যদি তাঁরা রাজি না হন? প্রথম কাব্যগ্রন্থ কি তাকে দুঃখ দেবে, লজ্জা দেবে, বুকে একটা ঘা জাগিয়ে দেবে? একদিন দুপুরে সে সুদূর বাংলাবাজারের পথে গিয়ে পৌঁছে; রিকশা থেকে নেমে খুঁজতে থাকে চৌধুরী ব্রাদার্স; তার লজ্জা লাগে, ভয় লাগে, মনে হয় ফিরে যাই, আবার সে একটি একটি ক'রে নম্বর আর নাম পড়তে পড়তে এগোতে থাকে। সে এক সময় চৌধুরী ব্রাদার্সের ছোটো দোকানটি দেখতে পায়। কলেজের ছাত্র যেমন প্রথম একলা পতিতাপল্লীর গলির সামনে এসে ভয়ে লজ্জায় হঠাৎ অন্য দিকে চ'লে যায়, তাকিয়ে দেখে কেউ তাকে দেখলো কি না, হাসানও দ্রুত হেঁটে পেরিয়ে যায় কয়েকটি দোকান, দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট কিনে ধরায়, আবার অন্য দিকে হাঁটতে থাকে, সিগারেটটি শেষ করে।

সে কি ফিরে যাবে? সে কি চৌধুরী ব্রাদার্সে ঢুকবে?

নিজের কী পরিচয় দেবে সে?

নিজেকে কবি বলা কি ঠিক হবে? না, না, না।

না, আর ঘোরাঘুরি নয় আর সিগারেট নয়; সে এবার ঢুকে পড়ে চৌধুরী ব্রাদার্সে, দু-দিকে ব'সে আছেন দুই সুদর্শন তরুণ, মাঝে এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণ বৃদ্ধ।

হাসান নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, আমার নাম হাসান রশিদ।

দুই তরুণ উৎসাহিত হয়ে বলে, আপনার কথাই সেদিন হচ্ছিলো, আপনার বই আমরা ছাপবো ঠিক করেছি।

বৃদ্ধ বলেন, আপনে কবি? আপনারে ত কবির মতন দেখাইতেছে না।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কবিরা দেখতে কেমন?

বৃদ্ধ বলেন, রাস্তায় পাগল আসতে দেখলেই আমার মনে হয় কোনো কবি আসতেছে, বই ছাপাইতে বলবো। আপনের ত লম্বা চুল নাই, পরনে ছিরা জামা নাই, আপনে আবার দারিও কাটছেন।

পিতার কথা শুনে দুই তরুণ বেশ লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু ক'রে থাকে।

হাসান বলে, আমি অতো বড়ো কবি নই।

বৃদ্ধ বলেন, আপনে দেখি আবার শুদ্ধ ভাষা কন, কবিরা শুদ্ধ ভাষা জানে না।

হাসান বলে, আপনি কবিদের সম্পর্কে চমৎকার ধারণা রাখেন, আমার বেশ ভালো লাগছে।

বৃদ্ধ বলেন, কবিতা ছাইর‍্যা আমারে ক্যালাস নাইনের কয়টা নোট বই লেইখ্যা দেন, অইগুলি চলে, হাতে দুই চাইর পয়সা আসে, আপনেও ভাল পয়সা পাইবেন, কবিতায় পয়সা নাই, পাগল ছারা কেও কবিতা পড়ে না।

বৃদ্ধের কথা শুনে তাঁর লাজুক পুত্র দুটি লজ্জা পায়, হাসান হাসে, এবং বলে, নোটবই লিখতে পারলে খুব খুশি হতাম, তবে নোট বই লিখতে হ'লে পণ্ডিত হ'তে হয়, এক্সপেরিয়েন্সড্ হেডমাস্টার হ'তে হয়, আমি তাদের মতো পণ্ডিত নই; আপনি

তো জানেন ফেলকরারা আর মূর্খরাই কবিতা লেখে; আর পয়সা? পয়সা খুবই সুন্দর, খুবই পবিত্র, পয়সা দেখতে আমার ফুলের থেকেও ভালো লাগে, আমি যদি বিশ্বাসী হতাম তাহলে শুধু পয়সায়ই বিশ্বাস করতাম।

বৃদ্ধ বলেন, হ, বোঝছি, পয়সাই যদি চাইবেন তাইলে আর ক্যান কবিতা ল্যাখবেন, তাইলে ত ব্যবসাবাণিজ্যই করতেন।

হাসান হাসে, আপনি ঠিক বুঝেছেন, তবে আমি স্বপ্নে কিন্তু শুধু পয়সাই দেখি।

বৃদ্ধ বলেন, আপনারে আমার ভাল লাগতেছে, আপনে অন্য কবিগুলির মতন না। তারা আইসাই বিড়ি ধরায়, চা খাইতে চায়, দোকানে ছ্যাপ ফালায়, আর বলে তাগো মতন কবি আর নাই। তয় আমার কাছে কবি হইতেছে মহাকবি কায়কোবাদ, আর কবি নাই, তার মতন ল্যাখেন ত 'কে মোরে শোনাইল আজানের ধ্বনি, মর্মে মর্মে সেই সোর বাজিল কি সোমধুর, আকোল করিল প্রাণ নাচিল ধমনী'। ল্যাখেন ত এমন কবিতা, দেখুম কেমুন কবি আপনেরা।

প্রথম কবিতার বই ছাপার জন্যে গৃহীত হয়ে গেছে, চৌধুরী ব্রাদার্স গ্রহণ করেছে তার পাণ্ডুলিপি, হাসান কাঁপছে থরোথরো, দিনরাতগুলো তার স্বপ্নে ভ'রে গেছে যন্ত্রণায় ভ'রে গেছে মধুরতায় ভ'রে গেছে। অ্যাড ২০০০-এর ডেস্কে ব'সে স্ক্রিপ্ট লিখতে লিখতে মনে হয় তাকে যেতে হবে নবাবপুরে আলেকজান্ড্রা প্রেসে, পবিত্রতম গন্তব্যে, তীর্থে, যেখানে অলৌকিক লাইনোতে ছাপা হচ্ছে তার কবিতার বই, লাইনো হচ্ছে কবিতা আর কবিতা হচ্ছে লাইনো, তাকে প্রুফ দেখতে হবে, প্রুফ দেখাটা তাকে শিখে নিতে হবে, আঙুল থেকে বের করতে হবে ওই চমৎকার ঐন্দ্রজালিক চিহ্নগুলো। সে গন্ধ পেতে থাকে নিউজপ্রিন্টের, তার বুক ভ'রে যায়, গোলাপের– যদিও সে ঠিক জানে না গোলাপের গন্ধ কেমন, কখনো ঘ্রাণ নেয় নি ওই প্রখ্যাত ফুলের– থেকেও অনেক অনেক সুগন্ধি ওই নিউজপ্রিন্ট, তা চোখের সামনে নক্ষত্রগুচ্ছের মতো জ্ব'লে ওঠে লাইনো পংক্তিমালা, ওই অপূর্ব অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে তার তুচ্ছ গরিব বিষণ্ন পংক্তিগুলো হয়ে উঠবে কবিতা, এই ভাবনা তাকে শিউরে দিতে থাকে।

একদিন গিয়ে দেখে কম্পোজ হচ্ছে তার কবিতা; চার পাতা কম্পোজ হয়েছে।

কম্পোজিটর তার হাতে চারটি পাতা দিয়ে কম্পোজ করতে থাকে, ঝনাৎ ঝনাৎ ক'রে ঝরতে পড়তে থাকে একেকটি পংক্তি, শব্দটাকে তার সিম্ফনির থেকে মধুর মনে হয়, ইচ্ছে হয় তাড়াতাড়ি পংক্তিগুলো তুলে দেখতে, কিন্তু সে কোনো কথা বলে না, সে দেখে তার লেখা কবিতা হচ্ছে, অমরতা পাচ্ছে।

একটি লোক এসে বলে, আপনে কি প্রুফ দ্যাখতে জানেন?

হাসান বলে, না।

লোকটি বলে, শিখ্খা লইয়েন, আবার সাত দিন পর আইয়েন।

বিকেলভর কাঁপতে কাঁপতে কবিতাগুলো পড়তে পড়তে ওগুলোর রূপ বদলে গেছে দেখতে দেখতে সন্ধ্যার পর হাসান চার পাতার প্রুফ নিয়ে উপস্থিত হয় শেখ সাহেব বাজার রোডের রিকশাঅলা রেস্তোরাঁর আড্ডায়; দেখে জমজমাট আড্ডা চলছে, আর প্রুফ দেখে চলছে সালেহ ফরিদউদ্দিন ও আহমেদ মোস্তফা হায়দার।

সালেহ বলে, দোস্ত, তোমার বই না কি কম্পোজ শুরু হইয়া গ্যাছে?

হাসান বলে, হ্যাঁ; চার পাতা প্রুফ দিয়েছে।

মোস্তফা হায়দার জিজ্ঞেস করে, কয়টা কবিতা দিলা, কি কি কবিতা দিলা, দোস্ত? পলিটিকেল কবিতা কয়টা দিলা? পলিটিকেল কবিতা ছাড়া আইজকাইল কবি হওন যায় না, দ্যাখছো না রাস্কেল বিভূতিভূষণটা থার্ডক্লাস পলিটিকেল কবিতা লেইখ্যা পপোলার কবি হইয়া গ্যালো। ওই শালা কোনো কবি না, কিন্তু আইজকাইল ওইটাই হইছে এক নম্বর কবি।

হাসান বলে, আশিটির মতো কবিতা দিয়েছি, কোনো পলিটিকেল কবিতা নেই, আমি তো অমন কবিতা লিখতে পারি না।

একটু থেমে হাসান বলে, বিভূতিভূষণ পপোলার হয়েই থাকবে, কোনো দিন কবি হবে না, সে আমাদের কবিয়াল।

মোস্তফা হায়দার বলে, তাইলে তুমি হইবা বালের কবি, যাও, দুই চাইরটা স্বাধীনতা, ফাদার অফ দি ন্যাশন, ড্যামোক্রেসি আর সোসিয়ালিজমের শ্লোগান ঢুকাই দেও, তাইলেই কবি হইবা।

হাসান বলে, আমি তা পারবো না তা তুমি জানো।

সালেহ জিজ্ঞেস করে, বই শুরু করলা কি কবিতা দিয়া আর শ্যাষ করলা কি কবিতা দিয়া? শুরু আর শ্যাষের কবিতা খুব ইম্পরটেন্ট, দোস্ত।

হাসান কয়েকটি কবিতার নাম বলে, এবং বলে, আমার শেষ কবিতাটির নাম 'হাসান রশিদ'।

গোলমালে তার কথা কেউ ভালোভাবে শুনতে পায় না ব'লেই মনে হয়; কিন্তু সালেহ ফরিদউদ্দিন তার দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে, বিচলিত হয়, কথা বলে না, ঢকঢক ক'রে চা শেষ করে, সে হয়তো এখনই তার প্রুফগুচ্ছ বুকে নিয়ে কেঁদে উঠব; এবং একটু পরেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যায়।

কয়েক দিন পর আবার হাসান যায় শেখ সাহেব বাজার রোডের রিকশাঅলা রেস্তোরাঁয়, যেটি তাকে এখন ডাকে, টানে, যার ধোঁয়া আর চিৎকার সুখকর মনে হয় তার কাছে। আড্ডা চলছে, ধোঁয়া আর প্রচণ্ড শব্দ উঠছে, প্রুফ দেখে চলছে সালেহ ফরিদউদ্দিন ও আহমেদ মোস্তফা হায়দার।

সালেহ ফরিদউদ্দিন বলে, আসো, আসো, দোস্ত, আমার কবিতা শোনো; যা ল্যাখছি জবাব নাই, নতুন বড়ো কবি আসতে আছে দ্যাশে, জীবনানন্দের পর দোস্ত আমিই একলা কবি, তোমরা কবি হইতে পার নাই।

হাসান হাসে, এবং বলে, তুমি আবার ছোটোখাটো জীবনানন্দ হয়ে উঠো না, সালেহ, বড়ো জীবনানন্দের পর ছোটো জীবনানন্দকে খুব করুণ দেখাবে।

সালেহ বলে, আরো দোস্ত, অইটারেও আমি ছারাই যামু, দেইখ্যো।

হাসান বলে, আচ্ছা, শুনি তোমার কবিতা।

সালেহ বলে, আমার বইর প্রথম কবিতাটা বদল করছি, এখন প্রথম কবিতাটার নাম 'সালেহ ফরিদ', সেইটাই তোমারে শুনাই।

হাসান সালেহর কথা শুনে নিথর হয়ে যায়, এক অসীম ভারি কর্কশ স্তব্ধতা ভর করে তার ওপর। সে কোনো কথা বলতে পারে না; বলতে পারে না যে এ-নামে তোমার কোনো কবিতা ছিলো না, সালেহ, তুমি সেদিন আমার শেষ কবিতাটির নাম শুনে এ-কবিতা লিখেছো; সালেহ, তুমি এ-অভ্যাস ছাড়ো।

সালেহ করুণ কাতর স্বরে তার কবিতা পড়তে থাকে, হাসানের দিকে তাকাতে পারে না, হাসান তার বিব্রত স্বরে অপরাধবোধের কণ্ঠ শুনতে পায়। সালেহ একটি বিষণ্ণ অহমিকাপূর্ণ নার্সিসীয় কবিতা লিখেছে নিজেকে নিয়ে, তার স্বভাব অনুসারে বসিয়েছে নানা এলোমেলো বাক্য আর ছবি, সতেরো বছরের কুয়াশাচ্ছন্নরা পছন্দ করবে এই কবিতা। সালেহর বই তো তার বইয়ের অনেক আগেই বেরিয়ে যাবে, সে কি তার শেষ কবিতাটি রাখবে বইয়ে? সবাই ভাববে না সে সালেহর দেখাদেখি নিজেকে নিয়ে নিজের নামে লিখেছে কবিতাটি? আর তার কবিতাটি তো সহজে পাঠকের ভেতরেও ঢুকবে না; সে কোনো কাতর হাহাকার করে নি, বিষণ্ণ অহমিকা দেখায় নি, সে লিখেছে একটি সময়ের আন্তর ইতিহাস।

আড্ডাটি তার চোখে ময়লা ঘোলাটে হয়ে ওঠে।

হাসান উঠে পড়ে আড্ডা থেকে, সে বাদ দেবে তার কবিতাটি বই থেকে।

হাসান একটি সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে থাকে, রাস্তার মানুষ আর যানবাহনকে তার ধূসর অপরিচিত মনে হয়,– সে বাদ দেবে তার কবিতাটি বই থেকে?

বাদ দেয়াই উচিত, বাদ তাকে দিতেই হবে, ওই কবিতাটিকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে হবে, যেনো ওটি কখনো লেখা হয় নি।

কেনো বাদ দেবে তার কবিতাটি? কেনো মুছে ফেলবে? অনেক খেটে সে লিখেছে কবিতাটি।

কবিতাটি আমার প্রিয় ছিলো, আজ থেকে আমি আর ওটি পড়তে পারবো না। সে হাঁটতে হাঁটতে নিজের সাথে কথা বলতে থাকে। কেনো আমি আমার কবিতার নাম ওদের বলতে গেলাম?

না, কবিতাটি থাকবে, যদিও ওটি আমার প্রিয় থাকবে না।

আমার জন্যে আর আড্ডা নয়, আমার জন্যে নিঃসঙ্গতা, আমার জন্যে একলা জীবন, আমার জন্যে শুধু কবিতা, আমার জন্যে ব্যর্থতা, আমার জন্যে দণ্ড।

হাসানের কবিতাগুলো কম্পোজ হ'তে থাকে, ধীরে ধীরে, মাসের পর মাস কেটে যেতে থাকে, সে প্রুফ দেখতে থাকে, আলেকজান্ড্রা প্রেসে যেতে থাকে, ফিরে আসতে থাকে, নিউজপ্রিন্টের গন্ধে তার বুক ভ'রে যেতে থাকে।

এর মাঝে আরেকটি আলোচনা অনুষ্ঠানে, আকস্মিকভাবেই, অংশ নিতে হয় তাকে। পঞ্চাশের এক কবির কাব্যসংগ্রহ বেরিয়েছে, তার প্রকাশনা উৎসব হবে, আয়োজকদের একজন তাকে অনুরোধ করে ওই উৎসবে সংগ্রহটি আলোচনা করার জন্যে। সে কি সম্মত হবে? হাসান প্রথম সম্মত হয় না, ওই কবিকে সে ঠিক কবি মনে করে না,– এই দেশে এমদাদ আলিও কবি বেগম রোকেয়াও কবি কাদের নওয়াজও কবি–, তাঁর কবিতার বিশেষ মূল্য নেই ব'লেই তার মনে হয়, সে প্রকাশনা উৎসবে

তাঁর কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে পারবে না, তাই তার তাতে না থাকাই ভালো। প্রকাশনা উৎসবের জন্যে দেশে খান জামান চৌধুরী মোল্লারা উল্লারা আছেন, তাঁরা সব কিছুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার বিনম্র উদার প্রতিভা নিয়েই জন্ম নিয়েছেন, কোনো কিছুই মূল্যহীন নয় তাঁদের কাছে, ছাইয়ের ভেতরে তাঁরা সব সময় অমূল্য রতন পেয়ে ধন্য হন, সব ছোটোবড়ো পংক্তিই তাঁদের কাছে মহৎ কবিতা, প্রতিগণ্ডা পংক্তিই উদ্ধৃতিযোগ্য তাঁদের কাছে, ওই মহৎ মৌলভিদের দিয়েই প্রকাশনা উৎসবের মতো বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করা ভালো। বিবাহোৎসবে বর যতোই অযোগ্য কুৎসিত হোক সে-ই নরোত্তম, প্রকাশনা উৎসবে কবিমাত্রই বড়ো কবি। সে কি থাকবে ওই উৎসবে? উচ্ছ্বসিত স্তব করবে ওই কবির? তাঁর নিকৃষ্ট পদ্যের? তার থাকা ঠিক হবে না, সে আয়োজকদের জানিয়ে দেয়; কিন্তু তাকে থাকতেই হয়, কবি নিজে তার বক্তব্য শুনতে চান।

কবি নিজে তার বক্তব্য শুনতে চান? এটা আরো বিব্রতকর তার কাছে। ওই কবির সাথে তার দু-একবার দেখা হয়েছে, তিনি লোক ভালো, তার কবিতার প্রশংসা করেছেন তিনি, নিজের কবিতা সম্পর্কেও জানতে চেয়েছেন; কিন্তু লোক ভালো হ'লেই কবি ভালো হয় না; ভালো লোকেরা সাধারণত জঘন্য খারাপ কবি হয়। ভালো লোকদের কবিতা লেখা অনুচিত, তাদের উচিত বিয়েসংসার ক'রে বাচ্চার পর বাচ্চা জন্ম দেয়া, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে শাশুড়িকে মা ব'লে সালাম করা।

প্রকাশনা উৎসব স্তব আর উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে।

এক আলোচক বলেন, এটা এক মহৎ কাব্যসংগ্রহ, এই কবির কবিতা চিরকালীনতা লাভ করেছে, তিনি বাঙলা ভাষার এক প্রধান কবি।

আরেক আলোচক বলেন, আধুনিক কবিতার ধারায় তিনি শুধু এক প্রধান কবিই নন, তিনি তিরিশের নষ্ট আধুনিকতা ত্যাগ ক'রে আধুনিক বাঙলা কবিতাকে পাশ্চাত্য থেকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছেন; তাঁর কবিতায় দ্যাশের মাটির গন্ধ পাওয়া যায়, তাঁর কবিতায় ঘাসের গন্ধ পাওয়া যায়।

হাসানকে যখন ডাকা হয় সে স্থিরভাবে মাইক্রোফোনের দিকে যায়, কিন্তু ভেতরে একটা তীব্র কম্পন অনুভব করে;– তাকেও বলতে হবে একরাশ মিথ্যে, উচ্চারণ করতে হবে নিরর্থক স্তবস্তুতি? যা কবিতা হয় নি, তা উদ্ধৃত ক'রে বলতে হবে এগুলো আধুনিক ও শাশ্বত?

সে জানে না সে কী ব'লে ফেলবে। ঠিক আছে সে মিথ্যে কথাই বলবে; কবি নিজে ব'সে আছেন মঞ্চে, তিনি মিথ্যে শুনে সুখী হবেন, মিথ্যে সাধারণত সুখকর; তাতে বাঙলা কবিতার কিছু যাবে আসবে না, হাজার বছর ধ'রেই তো কতো বাজে পদ্যে ভ'রে আছে বাঙলা কবিতার নদী? সরোবর? পুকুর? গোলা? ডোল? ঈশ্বরগুপ্ত রঙ্গলাল কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কায়কোবাদ এমদাদ আলি বন্দে আলি বাজে পদ্য লিখেছেন ব'লে কার কী ক্ষতি হয়েছে?

কিন্তু সে কথা বলতে গিয়ে দেখে সে মিথ্যে বলতে পারছে না; ওই কবির কবিতা মনোযোগের সাথে প'ড়ে তার যা মনে হয়েছে, তাই বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে তার ভেতর

থেকে। ওই কবির তো কবিতাই লেখা ঠিক হয় নি। ভালো পিতা আর শ্বশুর হিশেবে জীবন কাটিয়ে গেলেই ভালো করতেন তিনি।

হাসান বলে, কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ এক সুখকর আনন্দদায়ক ঘটনা, তাঁর কবিতার সংগ্রহ প্রকাশে কবি আনন্দিত, আমরাও সবাই আনন্দিত। তিনি এ-বয়সে যে পাঁচশো কবিতা লিখেছেন, তার জন্যে তাঁকে আমি অভিনন্দন জানাই।

হাসান বলে, কবিতা লেখা সকলের জন্যে জরুরি নয়, কারো কারো জন্যে জরুরি; কিন্তু পৃথিবীতে তারাই কবিতা লিখতে বেশি উদ্যোগী হয়, যারা অন্য কিছু করলেই ভালো হতো কবিতার জন্যে, এবং তাদের জন্যে।

হাসান বলে, আধুনিকতা বাঙালি মুসলমানের কাছে বড়ো ধাঁধা, মুসলমানের পক্ষে আধুনিক হওয়া প্রায় অসম্ভব, শিল্পকলা বোঝাও কঠিন।

হাসান লক্ষ্য করে চারদিকে একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ছে।

হাসান বলে, বাঙালি মুসলমান পঞ্চাশের দশকে আধুনিক হয়ে উঠতে পারে নি, কবিরাও প্রকৃত আধুনিক হয়ে উঠতে পারেন নি। আজ যাঁর কবিতা আমরা আলোচনা করছি, তাঁর কবিতায় আধুনিক চেতনার থেকে অনাধুনিক ইসলামি ও লৌকিক চেতনাই বেশি পাই। আমার মনে হয় তাঁর লেখা কবিতাও হয়ে উঠেছে খুবই কম। তাঁর কৃতিত্ব উৎকৃষ্ট কবিতা সৃষ্টির নয়, তাঁর কৃতিত্ব তিনি বাঙালি মুসলমানের কবিতার ধারাটিকে শুকিয়ে যেতে দেন নি, নিজেকে উৎসর্গ ক'রে তিনি পরবর্তীদের জন্যে কবিতার স্রোতকে অবারিত রেখেছেন।

আরো খোলাখুলিভাবে একথাগুলো তার বলতে ইচ্ছে করছিলো; কিন্তু কবির কথা মনে রেখে একটু রেখেঢেকেই বলার চেষ্টা করছিলো হাসান।

মঞ্চে তখন চিৎকার শুরু হয়ে যায়, কবি নিজে চেয়ার থেকে প'ড়ে যাওয়ার উপক্রম করেন, আর আয়োজনকারীদের একদল হৈচৈ ক'রে হাসানের সামনে থেকে মাইক্রোফোন টেনে নেয়, তার হাত থেকে কাব্যসংগ্রহটি কেড়ে নেয়। হাসান আস্তে আস্তে মঞ্চ থেকে নিচে নেমে আসে।

এক আয়োজনকারী তাকে আটকে বলে, এইসব বলার জইন্যে আপনেরে আমরা ডাকছি নি? আপনে কবিতার এইটা বোঝেন।

হাসান বলে, আমি যা বুঝি তাই বলতে চেয়েছি।

আরেক আয়োজনকারী বলে, আপনের মোখ ভাইঙ্গা দেঅন দরকার।

হাসান সভাকক্ষ থেকে ধীরেধীরে বেরিয়ে আসে, এবং দেখতে পায় তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে আসছে শ্রোতাদের অনেকে।

এক তরুণ দৌড়ে এসে একটি খাতা খুলে বলে, একটি অটোগ্রাফ দিন।

হাসান এক নতুন চাঞ্চল্য বোধ করে; এবং বলে, না, না, আমি এখনো অটোগ্রাফ দেয়ার উপযুক্ত হই নি।

তরুণটি তার খাতা বাড়িয়ে ধ'রে থাকে।

হাসান তার খাতাটি নিয়ে স্বাক্ষর দেয়, এবং নিচে একটি ধারালো দাগ দিয়ে দুটি ফোঁটা দেয়।

নতুন কাল এই প্রথম তার স্বাক্ষর চায়, নতুন সময়কে সে এই প্রথম স্বাক্ষর দেয়। এই শুরু; নতুন কাল তার দিকে শূন্যপৃষ্ঠা তুলে ধরতে শুরু করেছে।

তরুণটি জিজ্ঞেস করে, এই রেখা ও ফোঁটা দুটির কী অর্থ?

হাসান তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কোনো অর্থ নেই।

তরুণটি বলে, না, নিশ্চয়ই অর্থ আছে, আমাকে বলুন।

হাসান হেসে বলে, এটি তরবারি, যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি।

রাতে ঘরে ফিরে গিয়ে ওই কবির জন্যে তার খুব কষ্ট হয়, ভারি একটা যন্ত্রণা তাকে চেপে ধরে, ইচ্ছে হয় মাইল মাইল মাইল হেঁটে হেঁটে হেঁটে পা ক্ষতবিক্ষত ক'রে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে নদী পেরিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে মাটিতে মাথা নিচু ক'রে ব'সে থাকে সারারাত। তার মুখে কোনো কথা আসবে না, মাটিতে ব'সে থেকেই সে কবিকে জানাবে তার অশেষ বেদনা। ওই কবি ব্যর্থ, তাঁর কোনো কবিতাই সম্পূর্ণ কবিতা হয়ে ওঠে নি, কিন্তু তিনি তো কবিতার জন্যে ব্যয় করেছেন সারাটি জীবন। কবির কী আছে হৃদয়ের একগুচ্ছ খড়কুটো ছাড়া? ওই খড়ে আগুন? লাগলে ছাই হয়ে যায় মহাজগত, আবার শিশির জমলে মহাজগত জুড়ে ফোটে শিউলি কামিনী রক্তজবা। অন্য কিছুর জন্যে এভাবে জীবন ব্যয় করলে পার্থিব সোনায় তাঁর সব কিছু ভ'রে উঠতো, কখনো এমন যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না। তিনিও তো দণ্ডিত, প্রতিটি মুহূর্ত তিনি দণ্ড ভোগ করেছেন, জেগে থেকেছেন অজস্র রাত্রি, শুধু স্বপ্ন দেখছেন, ব্যর্থতার আগুনে পুড়েছেন, যেমন সে জেগে থাকছে রাতের পর রাত, স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্নগুলো দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠছে। তারও তো বেরোতে যাচ্ছে প্রথম কাব্যগ্রন্থ, তার বই নিয়ে যে উল্লাসে মেতে উঠবে না শহর, এটা সে জানে; অনেক আক্রমণ আসবে, তার কবিতাকে হয়তো ছিঁড়েফেড়ে ফেলবে অনেকে, হয়তো তার উৎকৃষ্টতম চিত্রকল্পটি দেখিয়ে বলবে এটা কিছুই হয় নি, এটা কষ্টকল্পনা। কবিতা তো মেপে দেখানো যায় না, কবিতাকে তো নম্বর দেয়ার কোনো উপায় নেই। সময়ই বিচার করবে কবিতা, এসব যদিও বলা হয়, তবু মানুষই বিচারক; এবং সব সময়ই মনস্বী বিচারকের খুবই অভাব, তুচ্ছদের বিচারই মেনে নিতে হয় যুগ যুগ। হাসান যন্ত্রণা বোধ করতে থাকে, ওই কবির জন্যে যন্ত্রণাটি রাতের গভীরতার সাথে সাথে পরিণত হয় নিজের জন্যে গভীর যন্ত্রণায়।

তার প্রথম কাব্যগ্রন্থটি বেরোতে আরো সময় লাগে, প্রুফে প্রচ্ছদে বাঁধাইয়ে আরো আট মাস কেটে যায়। কিন্তু সে কখনো উত্তেজিত হয় নি;– হবে, বেরোবে, সে মনে করেছে; এই যে দেরি হচ্ছে এটাকে সে উপভোগ করেছে প্রতিটি মুহূর্ত। একদিন চৌধুরী ব্রাদার্সে গিয়ে দেখে তার বই বাঁধাই হয়ে এসেছে, শেল্ফে জায়গা ক'রে নিয়েছে, বইটি বিব্রত বোধ করছে না; সে চঞ্চলতা বোধ করে, তার বইয়ের দিকে হাত বাড়াতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু সাহস হয় না। লাইনোতে ছাপা হয়ে যা বাঁধাই হয়ে এলো, শেল্ফে যা স্থান ক'রে নিলো, যার প্রচ্ছদে তার নাম মুদ্রিত, সেগুলো কী? কবিতা? গুরুত্বপূর্ণ? উল্লেখযোগ্য? নতুন?

শাজাহান চৌধুরী একটি বই তার হাতে দিয়ে বলে, দেখুন, খুব সুন্দর হয়েছে।

বইটি হাতে নিতে গিয়ে সে শিউরে ওঠে, তার রক্ত নিঃশব্দে বলতে থাকে, এ-কাব্য আমার, এর পংক্তি আর স্তবকগুলো আমার সৃষ্টি, আমার ভেতর থেকে এগুলো উৎসারিত হয়েছে, হয়তো এগুলো ব্যর্থ হয়তো সফল; এ-বই সাড়া জাগিয়ে চারদিকে আলোড়ন তুলে দেখা দেবে না, কিন্তু নিঃশব্দে ঢুকবে সময়ের বুকের ভেতরে।

হাসান হেসে বলে, বইটি ছুঁয়ে সুখ পাচ্ছি, আমিও হয়তো কবি হ'তে যাচ্ছি।

শাজাহান চৌধুরী বলে, আমি কবিতা ছাপি কিন্তু আমি কবিতা বুঝি না, তবে আমি বুঝি আপনি কবি, অন্যদের থেকে অনেক ভিন্ন।

হাসান জিজ্ঞেস করে, এজন্যে আমাকে খারাপ লাগে আপনার?

শাজাহান চৌধুরী বলে, কী যে বলেন কী যে বলেন, আব্বাও আপনাকে পছন্দ করে, সবচেয়ে পছন্দ করে।

চা খেতে হলো, অনেকক্ষণ বসতে হলো, ব'সে ব'সে সুখ পেতে হলো। হাসান বলে, আমাকে কয়েকটি বই দেবেন?

শাজাহান বলে, আজ পাঁচটি নিন, পরে আরো বিশটি পাবেন।

বইগুলো একটি মোড়কে ঢুকিয়ে, যেনো কেউ দেখতে না পায়, হাসান বেরিয়ে পড়ে। তার মনে হয় এ-মোড়কের ভেতরে এমন সোনা আছে, যা দেখানো যাবে না কাউকে; কিন্তু রিকশায় উঠে একবার মনে হয় একটি বই খুলে দেখি, টেনে বের করে একটি বই, পরমুহূর্তেই বইটি ঢুকিয়ে রাখে মোড়কে। যদি কেউ দেখে ফেলে তার বই বেরিয়েছে, তাহলে সে খুব বিব্রত বোধ করবে। অ্যাড ২০০০-এ পৌঁছে সে বইগুলো যত্ন ক'রে রেখে দেয় ড্রয়ারে, যেনো কেউ দেখতে না পায়। সে প্রকাশিত হয়েছে, সে প্রকাশিত কাব্যের কবি, এটা তাকে শিউরে দিতে থাকে, এটা তাকে হঠাৎ চুমো খাওয়া তরুণীর মতো সুখী বিব্রত স্বপ্নগ্রস্ত ক'রে তোলে।

সে নিজের সাথে, একটি সিগারেট ধরিয়ে, কথা বলতে থাকে।

হাসান, তুমি কেনো বিব্রত বোধ করছো প্রথম কাব্যগ্রন্থ নিয়ে? তুমি এর জন্যে মাসের পর মাস ব্যাকুল হয়ে ছিলে না, যেমন প্রেমিক থাকে প্রেমিকার জন্যে? তোমার তো এখন উচিত উল্লাসে ফেটে পড়া, চারদিক মাতিয়ে তোলা, যেমন প্রেমিকাকে পেলে মত্ত হয়ে ওঠে প্রেমিকের রক্তমাংস।

তোমার তো উচিত এখন সুখে আনন্দে খানখান হয়ে ডেস্ক থেকে ডেস্কে যাওয়া, সবাইকে বই দেখানো, কিন্তু তুমি যাচ্ছো না কেনো?

আজ সন্ধ্যায় আড্ডায় গিয়ে তুমি সবাইকে দেখাবে তোমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ, সালেহ আর মোস্তফা হায়দার যেমন বই নিয়ে ছুটছিলো, তুমিও তেমন ছুটবে।

ছুটতে হয়, নইলে হয় না; বই গোপন বস্তু নয়, তা সবাইকে জানানোর জন্যে।

কবিতার জন্যেও ফিল্ডওয়ার্ক দরকার হয়, হাসান, সবাই করে।

না, থাক, কয়েক দিন আমার বই একান্ত আমার হয়ে থাক; তারপর দেখাবো।

দেখাতে গিয়ে তুমি বিব্রত হয়ো না, হাসান।

সন্ধ্যায়, অন্যান্য দিনের থেকে অনেক আগে– আজ কেনো এতো আগে ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হলো, আপাদমস্তক বিশুদ্ধ আমহাজগত একলা হ'তে ইচ্ছে হলো

ব'লে?–, ঘরে ফিরে হাসানের মনে হয় সূচনা হলো এক নতুন সময়ের, আর কারো কাছে নয় হয়তো, কিন্তু তার কাছে। ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে, কে পড়তে পারে ভবিষ্যতের শাদা পৃষ্ঠা? বহু দিন পর সে মুগ্ধ হচ্ছে, একটা কিছুর দিকে সে তাকিয়ে থাকতে পারছে– সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সে কখনো তাকিয়ে থাকে প্রচ্ছদের দিকে– সুদূর নক্ষত্রের মতো অচেনা লাগে নিজের নামটি,– নাম, ওরে নাম, তোর জন্যেই কি এই নিরন্তর জাগরণ?–, সূচিপত্রের ওপর চোখ বোলাতে থাকে কখনো, একটি শিশু একটি কিশোর জেগে ওঠে তার ভেতরে, পুকুরে সাঁতার কাটতে থাকে, হিজলের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে, হঠাৎ বর্ষায় খলখল করছে মাঠ, উল্টেপাল্টে বারবার সে পড়ে কবিতাগুলো– এগুলো আমি লিখেছি? আমি লিখেছি? ন্যাংটো সাঁতার কাটতো যে একদিন, সে লিখেছে? হিজলের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতো যে হাফপ্যান্ট প'রে, সে লিখেছে?– কখনো একটি দুটি মুদ্রণক্রটি তাকে কষ্ট দেয়। একটি কবিতায় 'অন্ধ' হয়ে গেছে 'অন্য', আরেকটিতে 'নিশ্বাস' হয়ে আছে 'বিশ্বাস'– শব্দ দুটির ওপরই দাঁড়িয়ে ছিলো কবিতা দুটি অনেকটা, ভুল ছাপা হয়ে কবিতা দুটি যেনো কুঁড়েঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। পাঠক কি বুঝবে কী ছিলো এখানে? একটি কবিতা থেকে বাদ প'ড়ে গেছে একটি চাবিশব্দ। হায়!

আমার পংক্তিগুচ্ছ স্তবকমালা আমার কবিতা
জানি না তোমরা কবিতা কি না সত্যিই জানি না
জানি না তোমরা কী শুধু জানি তোমরা আমার সত্তা
তোমরা জন্মেছো আমার রক্ত থেকে মাংস থেকে আমার ক্ষুধা থেকে
স্বপ্ন থেকে আমার ব্যর্থতা থেকে সুখ থেকে দুঃস্বপ্ন থেকে
আমার প্রেম থেকে কাম থেকে আমার নিদ্রা থেকে অনিদ্রা থেকে
আমার শৈশব থেকে উঠে এসেছো আমার যৌবন থেকে দল মেলেছো
যখন ঝড়ে ভাঙাচোরা খড়ের ঘরের মতো প'ড়ে থেকেছি
তখন তোমরা জন্মেছো যখন অনন্ত নীলিমায় ঝড়ে বজ্রে বিদ্যুতে উড়েছি
একলা তখন তোমরা বিকশিত হয়েছো
তোমাদের পেয়েছি আমি হঠাৎ রাস্তায় পেয়েছি জনতাদূষিত রাজপথে
যখন নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থেকেছি
তোমাদের পেয়েছি ট্রাকের চাকার নিচে যখন রঙিন প্রজাপতির মতো প'ড়ে থেকেছে কোনো রিকশা
পেয়েছি যখন আমার চোখের সামনে দুলে উঠেছে
যমজ ভগিনীর মতো কোনো তরুণীর উদ্ধত স্তনযুগল
তোমাদের পেয়েছি যখন গাছের সবুজ গ'লে গ'লে ঝরেছে আমার চুলে
সবুজ হয়ে উঠেছে আমার চুল আমার মুখ আমার চোখ
তোমাদের মধ্যে আছি আমিই তোমরা আমিই
তোমরা আমারই শিল্পরূপ
সীমাহীন অতল অন্ধকারে তোমরা অন্য অন্ধকার

এই তো শুরু, এই তো ব্যর্থতার ঝুলি কাঁধে মহাকালের দিকে যাত্রা।
এই তো শুরু, পিছল মাটির ওপর দিয়ে অচেনা ভুবনের দিকে যাত্রা।
এই তো শুরু, নিষ্ঠুর রক্তপিপাসু শিখরের দিকে অবিরাম আরোহণ।
এই তো শুরু, এই তো শুরু, এই তো শুরু ...

আলাউদ্দিনই তো হবে প্রথম অভ্যর্থনাকারী, বই পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আলাউদ্দিন, দোস্ত, তুমি ত জানো তোমারে লইয়া দ্যাশ পাগল হইয়া ওঠবো না, তুমি তো কোনো লড়কে লেঙ্গে ল্যাখো নাই, কিন্তু এই কবিতা বুঝাই দিছে তুমি বড় কবি হইবা।

হাসান হেসে বলে, তার মানে আমার সামনে ভয়াবহ ভবিষ্যৎ?

আলাউদ্দিন হাসতে হাসতে বলে, আমার সেইটাই মনে হয়, দোস্ত।

হাসান ভয় পায়; সে ভেবেছিলো আলাউদ্দিন প্রতিবাদ করবে, কিন্তু আলাউদ্দিন প্রতিবাদ না ক'রে তাকে সমর্থন করে।

কেঁপে ওঠে হাসান, সত্যিই আমার সামনে ভয়াবহ ভবিষ্যৎ?

আড্ডায়ও বই নিয়ে যায় সে একদিন; বিব্রতভাবে বই দেখায়, সবাই বই দেখে প্রচ্ছদের আর ছাপার প্রশংসা করে, প্রচুর চা ও সিগারেট সমাপ্ত হয়, কিন্তু কবিতা সম্পর্কে কিছু বলে না।

কয়েকটি পত্রিকায় আলোচনার জন্যে সে বই পৌঁছে দেয়। প্রত্যেক সম্পাদক বলেন, কাউকে দিয়ে আলোচনা লিখিয়ে আনুন, ভালো আলোচনা।

সে কাকে দিয়ে লিখিয়ে আনবে তার প্রশংসা?

হাসান বলে, লিখিয়ে আনা প্রশংসা আমার ভালো লাগবে না। পারলে কাউকে দিয়ে আলোচনা করাবেন, ভালো লাগবে, অচেনা আলোচনাই আমি চাই।

এক সম্পাদক বলেন, অচেনা কাউকে দিলে গালাগালির সম্ভাবনাই বেশি, আমরা কেউ কারো প্রশংসা করি না, ভালো জিনিশের তো করিই না।

হাসান হেসে বলে, গালাগালি প্রাপ্য হ'লে তাই চাই।

একজন বলেন, আপনার কোনো শিক্ষককে দিয়ে একটা আলোচনা লিখিয়ে আনুন, শিক্ষকের প্রশংসাপত্র কাজে লাগবে।

হাসান বলে, আমার তো কোনো শিক্ষক নেই।

বেশ কয়েক মাস ধ'রে হাসান উপভোগ করতে থাকে প্রচুর তিরস্কার ও সামান্য প্রশংসা; সে ভ'রে উঠতে থাকে ওই তিরস্কারে ও প্রশংসায়– তার আরেকটি জীবন শুরু হয়ে গেছে, ক-শতাব্দী ধ'রে এটা চলবে? তাঁর ভেতরের খড়কুটোও পুড়তে শুরু করেছে, শিশিরে ভিজতে শুরু করেছে। নিরন্তর শীতল আগুনে পোড়া আর গনগনে শিশিরে ভেজা, এই তো কবির জীবন। তিরস্কার তার খারাপ লাগে না, ওগুলো প'ড়ে সে মনে মনে হো হো হাসে, রক্তে একটু বিষ ছড়িয়ে পড়ে, বিষ তো ছড়িয়ে পড়বেই, এমন কোন কবি আছে যার রক্তনালিতে হৃৎপিণ্ডে রক্তের থেকে বিষের পরিমাণ বেশি নয়, ফুসফুসে বাতাসের থেকে বিষপ্রবাহ অবিরাম নয়? কাহ্নপাদের রক্ত? চণ্ডীদাসের রক্ত? মধুসূদনের রক্ত? বিহারীলালের রক্ত? ওতে বিষ বেশি না রক্ত বেশি? রবীন্দ্রনাথের

রক্ত? জীবনানন্দের রক্ত? বুদ্ধদেবের রক্ত? সুধীন্দ্রনাথের রক্ত? ওতে বিষ বেশি না রক্ত বেশি? ওদের ফুসফুসে বাতাস বেশি না বিষকণিকা বেশি? আর সে তো সামান্য, তাই বিষকেই সুধায় পরিণত করতে হবে তার। সুধা? কোন কবি কবে তা পেয়েছে? তার সামনে বিষের পেয়ালা, কবিকে অনবরত পান করতে হয় বিষ, মৃত্যুময় গরল।

এই গরল সে পান ক'রে আসছে কতো দিন হলো? এক যুগ? দেড় যুগ?

পাঁচতলা থেকে হাসান তাকায় দক্ষিণের প্রসারিত ব্যাপ্ত আকাশচুম্বী মলস্তূপের দিকে। পৌরসভা নতুন সভ্যতা গড়ার জন্যে জমিয়ে তুলছে বর্তমান আবর্জনার পাহাড়; এই মলস্তূপ থেকে একটি একটি ক'রে উঠে এসেছে তার অনেক কবিতা। আরো আসবে। মলস্তূপের পাশে বস্তির শুয়োরগুলোকে তার মনে পড়ে, কী করুণ বিষণ্ন গরিব শুয়োর। মানুষও ওদেরই মতো, সেও কি ওগুলোরই সহোদর?

ফোন বাজছে, তার ধরতে ইচ্ছে করছে না, বেজে চলছে ফোন, ধরতে ইচ্ছে করছে না; সে জানে ফোনের ওই পাশে শ্যামলী ফরহাদ– তার একদা আনন্দ আর এখনকার অশেষ ক্লান্তি যন্ত্রণা রক্তক্ষরণ। তার ধরতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু সে ধরবে, না ধরলে কিছুক্ষণ পর সে শূন্যতা বোধ করবে।

হাসান বলে, হ্যালো।

শ্যামলী ফরহাদ বলে, তোমার এতো সময় লাগলো ফোন ধরতে?

হাসান বলে, আমি দুঃখিত, একটু দেরি হয়ে গেলো।

শ্যামলী বলে, কাজের মেয়েটিকে নিয়ে শুয়ে আছো না কি? তোমার কাজের মেয়েটি তো রূপসী আর যুবতী।

হাসানের রক্তের ভেতর দিয়ে একটি ছুরিকা তীব্র বেগে ছুটে চলে।

হাসান বলে, হ্যাঁ, সে রূপসী এবং যুবতী, আঠারো বছর।

একগুচ্ছ ছুরিকা হয়তো আরো তীব্র বেগে ছুটে চলছে শ্যামলীর রক্তের ভেতর দিয়েও; শ্যামলী বলে, এই জন্যেই তোমাকে ক্লান্ত লাগছে? কবার করলে? তোমার তো আবার ক্ষুধার শেষ নেই।

হাসান বলে, দু-বার, না তিনবার মনে নেই, আরেকবার উদ্যোগ নিচ্ছি, খুব ক্ষুধা, সারাজীবনেও মিটবে না।

হাসান ফোন রেখে দেয়, তবে আবার ফোন বেজে ওঠে, বাজতে থাকে, বাজতে থাকে, বাজতে থাকে; অথচ শ্যামলী ফরহাদের ফোনের জন্যে সে এক সময় ভোর হ'তে না হ'তেই অ্যাড ২০০০-এ গেছে, সন্ধ্যার অনেক পরে ফিরেছে অ্যাড থেকে; আর শ্যামলীর জন্যেই সে নিজের ফোন নিয়েছে, টাকা ছিলো না, ধার করতে হয়েছিলো শ্যামলীর থেকেই অর্থাৎ শ্যামলীই টাকাটা গুঁজে গিয়েছিলো তার হাতে, টাকাটা শ্যামলীকে আর ফেরত দেয়া যায় নি, যদিও হাসান বারবার চেষ্টা করেছে। ফোন এক সময় ভরা ছিলো সুধায়, আজ ভ'রে উঠেছে তীব্রতম কালকূটে– মানুষের সম্পর্কের এই অবধারিত পরিণতি। এটা বেজে উঠলে আজ সে ভয় পায়; মনে হয় মনসার হাজার হাজার সাপ ঢুকছে তারের ভেতর দিয়ে, ওই তার সাপের মতো ফণা

তুলছে, সেটটাকে মনে হয় কুণ্ডলিপাকিয়ে শুয়ে থাকা বিষধর; সে এক লখিন্দর, আটকা প'ড়ে আছে লোহার বাসরে।

শ্যামলী ফরহাদ, তার সুধা, তার একরাশ কবিতার অপার্থিব উজ্জ্বল প্রেরণা, তার কবিতাকে কাম থেকে প্রেমের দিকে নিয়ে আসার পার্থিব দেবী, তার প্রেম, তার কাম, আজ হয়ে উঠেছে আদিগন্ত বিভীষিকা। হায়, মানুষ, দণ্ডিত মানুষ, তোমার দণ্ডিত পরস্পরকে ছিন্নভিন্ন করার দণ্ডে; যেদিন তোমরা প্রথম চুম্বন করো সেদিনই তোমরা হনন শুরু করো।

হাসানের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে, আজ দশ বছর হলো, বেশ প্রশংসা এবং একটি দুটি ছোটোখাটো পুরস্কার পাচ্ছে; তবে সবচেয়ে অমূল্য যা সে পায় তার আটাশ বছর বয়সে, তা হচ্ছে শ্যামলী ফরহাদ, যে আকাশভরা চাঁদের মতো বনভরা পুষ্পের মতো ঢোকে তার জীবনে, সে ভ'রে ওঠে। শূন্যতায় মানুষ বাঁচতে পারে না, ভ'রে উঠতে হয় মানুষকে: শ্যামলী তার ভ'রে ওঠা।

এক বিকেলে একটি টেলিফোন আসে, আমি কবি হাসান রশিদের সাথে একটু কথা বলতে চাই।

হাসান বলে, আমি হাসান বলছি।

ওই কণ্ঠ বলে, আমি আপনার কবিতার একজন অনুরাগিণী।

শুধু কণ্ঠ, শুধু কণ্ঠস্বর, স্বরভরা শুধু অনুরাগ।

হাসান বলে, আপনার কথা শুনে আমি ধন্য হলাম, সুখী হলাম।

শুধু কণ্ঠস্বর, শুধু কণ্ঠ, কণ্ঠস্বরভরা শুধু অনুরাগ।

ওই কণ্ঠ বলে, আপনি আমার প্রিয় কবি, প্রিয়তম কবি।

হাসান বলে, আমি মুগ্ধ হচ্ছি ধন্য হচ্ছি ভ'রে উঠছি।

সে কি একটু বাড়িয়ে বলছিলো? না। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে তার এমনই মনে হয়েছিলো, কয়েক দিন ধ'রে এমনই মনে হয়েছিলো।

ওই কণ্ঠস্বর ফোন রেখে দেয়, হাসান তবু সারা বিকেল সন্ধ্যা মধ্যরাত স্বপ্নে জাগরণে ওই স্বর শুনতে পায়; মাটি নীলিমা জলভূমি বনভূমি ভ'রে যায় ওই স্বরে, সারা শহরে ওই স্বর ছাড়া কোনো স্বর নেই, ট্রাক কোনো শব্দ করছে না, গাড়িসব হর্নে চারপাশ জীর্ণ করছে না, শুধু একটি কণ্ঠস্বরই অসুস্থ শহরকে সুস্থ ক'রে রেখেছে, তার ভেতর থেকে জেগে উঠছে পংক্তি চিত্রকল্প ধ্বনিকল্প। শহরের কোন প্রান্ত থেকে আসতে পারে ওই স্বর? হাসানের মনে হয় ওই স্বরে সুগন্ধ আছে, সেই সুগন্ধের রেশ ধ'রে সে পৌঁছে যেতে পারে স্বরের দিকে। সে ওই স্বর দেখতে পায়, ওই স্বরের একটি শরীর কেঁপেকেঁপে ওঠে তার চোখে, সে স্বরের সুগন্ধ পায়, তার সুগন্ধ টেনে নিতে থাকে বুকের ভেতরে, জিভ দিয়ে সে চুষতে থাকে স্বরের জিভ আর ওষ্ঠ, সে আঙুল বোলাতে থাকে ওই স্বরের কোমল শরীরে, আঙুল পাহাড়ে উঠতে থাকে উপত্যকায় নামতে থাকে নদীতে ডুবতে থাকে।

কয়েক দিন হাসান ওই স্বরের মুঠোতে পালকের মতো প'ড়ে থাকে।

আবার এক বিকেলে স্বর বেজে ওঠে, আমি কবি হাসান রশিদকে চাই।

হাসান বলে, কতোখানি চান?

স্বর বলে, সম্পূর্ণ চাই।

হাসান বলে, আপনাকে সম্পূর্ণ দিলাম।

স্বর আমগাছের ঘন সবুজ পাতার ওপর বৃষ্টির ফোঁটার মতো হেসে ওঠে, পিচঢালা পথের ওপর জ্যোৎস্নার মতো ছড়িয়ে পড়ে, আমি আপনার অনুরাগিণী, অ-নু-রা-গি-ণী, আপনি আমার প্রিয়তম কবি।

হাসান বলে, সাত দিন ধ'রে আপনি আমার কাছে কণ্ঠস্বর হয়েই আছেন, কিন্তু আপনার তো একটা নাম আছে?

কণ্ঠস্বর বলে, আছে, কিন্তু সেটা তুচ্ছ।

হাসান বলে, কিন্তু নাম ছাড়া কাউকে কল্পনা করা যায় না, আপনাকে অন্তত আমি কল্পনায় দেখতে চাই।

কণ্ঠস্বর বলে, বাস্তবে দেখতে ইচ্ছে করে না?

হাসান বলে, করে।

কণ্ঠস্বর বলে, কখন?

হাসান বলে, এই মুহূর্তেই।

কণ্ঠস্বর বলে, আমি তো বাতাস নই যে এ-মুহূর্তেই উপস্থিত হবো, পাখি নই যে উড়ে যাবো।

হাসান বলে, আপনি যা সেভাবেই আসুন।

কণ্ঠস্বর বলে, অফিসে থাকবেন, আমি আসছি।

সেই শুরু, সেই জীবনের আশ্চর্য বদল, সেই গুচ্ছগুচ্ছ তারকাকে মুঠোতে পাওয়া, সেই অপূর্ব আলোকিত অন্ধকারের দিকে যাত্রা।

হাসানকে অ্যাড ২০০০-এ যেতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, বারবার টেলিফোন বাজছে, সে ধরছে না, ধরতে ইচ্ছে করছে না। কী হবে শ্যামলীকে ধ'রে, কী হবে সুন্দর ক্লান্তিকে ধ'রে?

অবশেষে সে টেলিফোন ধরে, এবং অপরপারে খুব উদ্বিগ্ন স্বর শুনতে পায়, কে বলছেন? হাসান রশিদ সাহেব বলছেন, হাসান সাহেব?

হাসান বলে, হ্যাঁ, হাসান বলছি।

আহমেদ মাওলা বলে, আপনেরে টেলিফোন কইর‍্যা কইর‍্যা আমরা পাগল হইয়া যাইতেছি, হার্ট অ্যাটাক হইয়া যাইতেছে, আপনে ধরতেছেন না ক্যান?

হাসান জিজ্ঞেস করে, কেনো, কী হয়েছে?

আহমেদ মাওলা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনে ভাল আছেন ত? বলেন, আপনে ভাল আছেন ত?

হাসান বলে, হ্যাঁ, ভালোই তো আছি; কিন্তু কী হয়েছে বলুন?

আহমেদ মাওলা বলে, এখন বলুম না, তাড়াতাড়ি আসেন, আসলে বলুম।

আবার টেলিফোন বেজে ওঠে, হাসান ধরতেই আলাউদ্দিন বলে, আরে দোস্ত, তাইলে তুমি আছো, বাচলাম, তোমারে ফোন কইর‍্যা শ্যাষ হইয়া যাইতেছি।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কেনো, কী হয়েছে?

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, তুমি তাড়াতাড়ি অ্যাডে আসো, আমিও যাইতেছি, তোমারে না দেখলে বিশ্বাস করুম না যে তুমি আছ।

চৌধুরী ব্রাদার্সের ছোটো পুত্রটি ফোন করে, কবি হাসান রশিদ বলছেন?

হাসান বলে, হ্যাঁ।

সে বলে, আপনি ভালো আছেন?

হাসান বলে, হ্যাঁ, ভালো আছি, কিন্তু কেনো বলুন তো?

ছেলেটি বলে না, এমনিই, না এমনিই।

সে ফোন রেখে দেয়। হাসান চঞ্চল বিচলিত হয়ে ওঠে, নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে তাকে ঘিরে, যার জন্যে এই উদ্বিগ্ন চাপা অস্বস্তিকর ফোন।

হাসান একটি বেবি নিয়ে দ্রুত অ্যাডে পৌছে, আরো দ্রুত পৌছতে পারলে সে এবং সবাই আরো বেশি স্বস্তি পেতো। অফিসে ঢুকতেই সবাই তাকে ঘিরে ধরে, জড়িয়ে ধরে, কেউ কেউ তার গালে গাল ঘষে, খুবই বিহ্বল বোধ করে সে।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, গুজব রটছে যে কবি হাসান রশিদ খুন হইয়া গ্যাছে, শুইন্যা আমরা পাগল হইয়া গেছি।

আলাউদ্দিন তাকে জড়িয়ে ধরেছে, আর ছাড়তে চায় না; সেও ধ'রে রাখে আলাউদ্দিনকে, তারও ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

হাসান মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞেস করে, আমি কি মৃত, আমি কি মৃত? শ্যামলীর সাথে এখন আমার যে-সম্পর্ক, তাতে আমি কি মৃত নই?

আহমেদ মাওলা বলে, গুজব শুইন্যা আমরা পাগল হইয়া গেছি, আপনেরে দেইখ্যা কানতে ইচ্ছা করছে।

আহমেদ মাওলা তাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে থাকে।

হাসান হেসে বলে, খুন আমি হ'তে পারি, তবে এখনো হই নি; আপনারা সবাই প্রস্তুত থাকুন।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত তুমি বাইচ্যা আছো তাতে আমরা বাইচ্যা আছি; তয় খুন একজন হইছে, আমি খবর লইয়া জানলাম কবি হাসান করিম খুন হইয়া গ্যাছে কাইল রাইতে।

হাসান বলে, তাই না কি? হাসান করিম খুন হয়েছে?

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, তোমাগো নামের মিল আছে, আর তুমিই বেশি বিখ্যাত বইল্যা গুজব ছড়াইয়া পড়ছে যে তুমি খুন হইয়া গ্যাছো।

হাসানের এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়, তার মনে হয় সেই খুন হয়ে গেছে। হাসান করিমের সাথে তার সামান্য হ'লেও একটা জীবন ছিলো, দেখা হ'লে অন্তত তারা একবার হাসতো পরস্পরের দিকে চেয়ে, তার সেই জীবনটি খুন হয়ে গেছে। তাদের

আর দেখা হবে না, মৃদু হাসা হবে না। কেউ খুন হ'লে সে একা খুন হয় না, তার পরিচিতরাও একটু একটু খুন হয়।

হাসান ও আলাউদ্দিন যায় হাসান করিমের বাসায়; গিয়ে দেখে ছোটোখাটো ভিড় জমেছে, কাঁদছে হাসান করিমের স্ত্রী, দুটি বাচ্চা, আর হাসান করিমের লাশ প'ড়ে আছে। কয়েকটি পুলিশও দাঁড়িয়ে আছে এখানে ওখানে।

হাসানকে অনেকেই জড়িয়ে ধরে, হাসান বিব্রত বোধ করে, তারা যেনো খুন হওয়া হাসান করিমকে জড়িয়ে ধরছে তাকে জড়িয়ে ধ'রে।

একজন তাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, আমি ভেবেছিলাম আপনিই খুন হয়েছেন, সারা রাইত ঘুমাইতে পারি নাই, আমি আপনার আরো কবিতা পড়তে চাই।

লোকটিকে সে দেখেছে আগে, চেনে না; লোকটি তাকে ধ'রে কাঁদতে থাকে, হাসানের মনে হয় সেও কেঁদে ফেলবে।

হাসান চেনা একজনকে জিজ্ঞেস করে, কেনো এমন ঘটলো?

তিনি বলেন, হাসান করিম সর্বহারা দলের সদস্য ছিলেন, তাঁদের দলে এখন ভাঙাভাঙি আর খুনাখুনি চলছে, শুদ্ধি অভিযান চলছে, তিনি হয়তো নিজের দলেরই কারো হাতে খুন হয়েছেন।

আরেকজন বলেন, কাল সন্ধ্যায় তার পরিচিত কয়েকজন তাঁর সাথে দেখা করতে আসে, তাদের সাথে তিনি বের হন, বের হওয়ার সাথে সাথেই তারা তাঁকে গুলি করে।

হাসান জিজ্ঞেস করেন, হাসান করিমের স্ত্রী তাদের চেনেন?

লোকটি বলেন, হয়তো চেনেন হয়তো চেনেন না; তবে তারা তাঁর দলেরই।

বিপ্লবীরা একে অন্যকে এখন সমাধান করছে, নিজেদের সমাধান ক'রে ক'রে একদিন তারা পৃথিবীতে সর্বহারার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করবে।

শ্যামলী ফরহাদ কিছুক্ষণ পরেই, যখন সন্ধ্যা নেমে আসছে, প্রথম এসেছিলো তার কাছে; এবং হাসান তাকে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলো।

কণ্ঠস্বর বাস্তব রূপ নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু ওটাকেই হাসানের মনে হয়েছিলো সবচেয়ে অবাস্তব ঘটনা, সবচেয়ে বড়ো বিস্ময়।

কণ্ঠস্বর এসে বলেছিলো, আমি এসেছি, একটু দেরি হয়ে গেলো।

হাসান স্থিরভাবে শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, হ্যাঁ, এক শতাব্দীর মতো দেরি, তবে আমি আরো কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে পারতাম।

কণ্ঠস্বর আনন্দে দিকে দিকে ছড়িয়ে প'ড়ে বলেছিলো, পারতেন কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে? দশ, বারো, তিরিশি শতাব্দী?

হাসান বলেছিলো, মহাজাগত ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারতাম, তারপরও মনে হতো খুবই কম অপেক্ষা করলাম।

কণ্ঠস্বর বলেছিলো, ততোদিনে আপনি আমাকে ভুলে যেতেন।

হাসান বলেছিলো, মৃত্যুর পরও মনে পড়তো যে আপনি আসবেন ব'লে কথা দিয়েছিলেন, তখনো অপেক্ষা ক'রে থাকতাম।

কণ্ঠস্বর বলেছিলো, চলুন আমার সাথে।

হাসান জিজ্ঞেস করেছিলো, কোথায়?

কণ্ঠস্বর বলেছিলো, আপনি যেখানে যেতে বলবেন।

হাসান ঠিক করতে পারে নি কোথায় যেতে বলবে, তার মনে হয় শহরের, দেশের, পৃথিবীর, মহাজগতের কোনো এলাকা সে চেনে না; তাই সে কোথাও যেতে বলতে পারে না। তার মনে পড়ে একটি হিজলগাছের ছায়াকে, তার লাল চেলিকে, সে কি সেই হিজলগাছের নিচে যেতে বলবে? সে কি বলবে, চলুন একটি পুকুরপারে, যেখানে ঢুকছে জোয়ারের জল?

হাসান বলেছিলো, আপনার যেখানে ইচ্ছে আমাকে নিয়ে চলুন, আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমাকে কেউ যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাক, যে-কোনো স্বর্গে যে-কোনো নরকে যে-কোনো আকাশে যে-কোনো পাতালে।

কণ্ঠস্বর বলেছিলো, আমিই তো এমন ইচ্ছে নিয়ে বেরিয়েছি, বলতে এসেছি যেখানে ইচ্ছে আমাকে নিয়ে চলুন, যে-কোনো আলোতে যে-কোনো অন্ধকারে যে-কোনো আগুনে যে-কোনো জ্যোৎস্নায়।

হাসান বলেছিলো, আমরা দুজনেই হয়তো মুক্তি চাচ্ছি চারপাশের শেকল থেকে, আমাদের ভেতরের শেকল থেকে।

কণ্ঠস্বর বলেছিলো, আমরা সবাই বন্দী, কেউ সুখকররূপে কেউ অসুখকররূপে; তবে আমি বন্দী, আপনি হয়তো বন্দী নন; কবিরা তো মুক্ত।

হাসান তাকে সেদিন যেখানে ইচ্ছে সেখানে নিয়ে যেতে পারে নি, শ্যামলীর গাড়িতে হিজলগাছের নিচে বা তীব্র জোয়ারভরা পুকুরের পারে যাওয়া সম্ভব ছিলো না, আর কোনো জায়গাও তার মনে পড়ছিলো না, যাওয়ার যোগ্য মনে হচ্ছিলো না, শ্যামলীই তাকে নিয়ে গিয়েছিলো এক অভিজাত রেস্তোরাঁয়। একটি নারী, সম্পূর্ণ নারী, সম্পূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠোঁট স্তন উরু বাহু গাল ভুরু নিয়ে তার মুখোমুখি ব'সে আছে, এটা পরম বিস্ময় মনে হচ্ছিলো তার; সে ধ'রে নিয়েছিলো সে শুধু নারীর স্বপ্ন দেখবে, স্বপ্ন দেখে কবিতা লিখবে, কোনো বাস্তব নারী দেখবে না; মুখোমুখি ব'সে হাসান তীব্র আকর্ষণ বোধ করছিলো শ্যামলীর প্রতি, যা কোনো স্বপ্নের নারীর প্রতিও সে বোধ করে নি–তার মুখে সে হিজল ফুলের লাল চেলি দেখতে পাচ্ছিলো, প্রবল বৃষ্টিতে হিজল ফুল ভেসে যাচ্ছে তার মুখের ওপর দিয়ে, বুকে বাহুতে দেখতে পাচ্ছিলো জৈষ্ঠের জোয়ার; তার মুখ চোখ ঠোঁট চুল আঙুল বাহু তাকে টানছিলো যেমন মেঘ জ্যোৎস্না আষাঢ় শ্রাবণ তাকে টানে। কী সে বোধ করছিলো? প্রেম? কাম? শরীরের জন্যে শরীর? সে শ্যামলীকে ছাড়া শ্যামলীর আর কিছু জানে না, জানার কোনো প্রয়োজন আছে ব'লে তার মনে হয় নি, শ্যামলীকে দেখার পর আর কিছু জানার থাকে না।

কয়েক দিন পরই এক দুপুরে সে শ্যামলীকে নিয়ে এসেছিলো তার ঘরে।

সে কি আনতে পারে ওই স্বপ্নকে? ওই স্বপ্নই এসেছিলো তার ঘরে; তার ঘর হয়ে উঠেছিলো অবাস্তব অলৌকিক অমরা।

সেটি ছিলো অনাদি মহাজগতের অনাদি প্রথম দুপুর, অনন্য দুপুর, শেষ ও আদি ও অনন্ত দুপুর; ওই দুপুরের আগে কোনো পূর্বাহ্ন নেই, পরে কোনো অপরাহ্ন নেই,

এক দুপুরের সমাপ্ত মহাকাল। সেই দুপুরে, হাসানের মনে হচ্ছিলো, সে যাপন করছে তার সমগ্র জীবন– সমগ্র জীবন আশি বা একশো বছরের যোগফল নয়, সমগ্র জীবন হচ্ছে বিশেষ মুহূর্তের তীব্র পরম অবর্ণনীয় রূপ, যার পর আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না; জীবন তার কাছে এতো তীব্র এতো সম্পূর্ণরূপে কখনো ধরা দেয় নি, হয়তো আর ধরা দেবে না। সেই দুপুরে সে মদ্যপান করে নি, কিন্তু তার মনে হচ্ছিলো সে অজস্র কাল ধ'রে মদ্যপান ক'রে কোনো আদিম দেবতার মতো বিভোর মাতাল হয়ে প'ড়ে আছে প্রান্তরে, তাকে ঘিরে চলছে উৎসব, সে শুধু পান ক'রে চলছে অশেষ অমৃত। শ্যামলী কি পদ্মানদী? মানসসরোবর? শ্যামলী কি বঙ্গোপসাগর? শ্যামলী কি জ্যৈষ্ঠের জোয়ার? শ্রাবণের আদিগন্ত বন্যা? শ্যামলী কি মেঘ ঝড় বিদ্যুৎ? তারা ডুবে গিয়েছিলো নুহের প্লাবনে, বিশ্ব জুড়ে জল জল জল ছাড়া আর কিছু ছিলো না, অবিরল বৃষ্টি ঝরছিলো সমস্ত আকাশ ভেঙে চল্লিশ রাত চল্লিশ দিন ধ'রে, তারা দুটি মহাদেশ হারিয়ে যাচ্ছিলো পারদের মতো অতল জলের তলে; তারা ভেঙে পড়ছিলো ব্যাবিলন জেরুজালেমের মতো, অজস্র শতাব্দী ধ'রে ভেঙে পড়া ছাড়া আর কিছু ছিলো না, শুধু ভেঙে পড়ার সুগম্ভীর শব্দ উঠছিলো তাদের শরীরের কক্ষের পর কক্ষ থেকে, গম্বুজ থেকে, মিনার থেকে, তোরণ থেকে; তারা গ'ড়ে উঠছিলো বিদিশা বিক্রমপুর ময়নামতি মহাস্থানগড়ের মতো, তাদের শরীরের পাশ দিয়ে বয়ে চলছিলো প্রমত্ত পদ্মা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা যমুনা, যেখানে এক বিষণ্ন কবি তার নৌকোয় ব'সে লিখে চলছিলো তার তীব্রতম কবিতা।

অজস্র শতাব্দী কেটে গেলে এক শরীর আরেক শরীরকে জড়িয়ে ধ'রে প'ড়ে ছিলো ক্লান্ত সুখী প্রসন্ন পরিতৃপ্ত জনপদের মতো; তাদের শরীরের পলিমাটিতে এসে পড়ছিলো ধানের বীজ, গমের অঙ্কুর, ছড়িয়ে পড়ছিলো কলমিলতা, শেকড় ছড়াচ্ছিলো উদ্ভিদগণ, দিকে দিকে ডেকে উঠছিলো শালিক চড়ুই চিল।

শ্যামলী নদীপারের জনপদের মতো কণ্ঠস্বরে তাকে বলেছিলো, হাসান, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

হাসান, আরেক জনপদ, পদ্মার জলকল্লোলের স্বরে বলেছিলো, আমি তোমাকে ভালোবাসি, শ্যামলী।

শ্যামলী বলেছিলো, আমাদের শরীর একথাই শুধু বলছে; আজই আমি প্রথম আমার যে শরীর আছে বুঝলাম।

হাসান বলেছিলো, একমাত্র শরীরই শুধু সত্য বলতে পারে, শরীরের থেকে বড়ো কোনো ঈশ্বর নেই।

শ্যামলী বলেছিলো, হাসান, তোমাকে একটি কথা বলার আছে আমার।

হাসান বলেছিলো, পরে বোলো, এই সুখকর ক্লান্তির পরে বোলো, আমি এখন ক্লান্তির পরম সুখ অনুভব করছি; আমি ক্লান্তি উপভোগ করতে চাই।

শ্যামলী বলেছিলো, না, এখনই আমি বলতে চাই, এখনই বলার সময়, যখন আমরা সুখে ক্লান্ত তখনই আমার কথাটি বলা ভালো।

হাসান বলেছিলো, বোলো।

শ্যামলী বলেছিলো, হাসান, আমি বিবাহিত।

হাসান চোখ বুজে শ্যামলীকে জড়িয়ে ধ'রে বলেছিলো, তাতে কিছু আসে যায় না, শ্যামলী।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করেছিলো, এরপরও আমাকে ভালোবাসবে?

হাসান বলেছিলো, হ্যাঁ।

শ্যামলী বলেছিলো, আমার দুটি শিশু আছে।

হাসান বলেছিলো, বেশ তো, নিশ্চয়ই তারা খুব সুন্দর।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করেছিলো, হুঁ, এরপরও আমাকে ভালোবাসবে?

হাসান বলেছিলো, হ্যাঁ, ভালো না বাসার কিছু নেই, শিশুরা চমৎকার।

শ্যামলী বলেছিলো, তোমার থেকে আমি ছয় বছরের বড়ো।

একটু চমকে উঠেছিলো হাসান, এবং বলেছিলো, মনে হয় না; তোমাকে তো আমার থেকে ছোটোই মনে হয়; তোমাকে যে আমি মুঠোর ভেতরে ভ'রে রেখেছি, ভেঙেছি পাপড়ির মতো, তোমাকে আমার বালিকা মনে হয়।

শ্যামলী বলেছিলো, তোমাকে আমি ভালোবাসি।

হাসান বলেছিলো, আমি তা অনুভব করছি।

শ্যামলী বলেছিলো, চিরকাল তোমাকে আমি চাই।

হাসান বলেছিলো, আমিও চাই।

শ্যামলী বলেছিলো, বলো, আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না।

হাসান বলেছিলো, কখনো ছেড়ে যাবো না, এভাবে জড়িয়ে থাকবো।

দশ বছর হলো, কখনো মনে হয় কয়েক মাস, কখনো মনে হয় শতাব্দীর থেকেও দীর্ঘ। এই দশটি বছর তুমুলভাবে যাপন করেছে হাসান, কবিতায় ও বিজ্ঞাপনে তার জীবন বেশ সফলই হয়ে উঠেছে। এখন সে অ্যাড ২০০০-এর একজন প্রধান ব্যক্তি, অন্যতম ব্যবস্থাপক: এখন আর তার অ্যাড লিখতে হয় না, বদমাশদের থেকে অ্যাড সংগ্রহ করতে হয়, লেখার থেকে অনেক সহজ।

কয়েক দিন ধ'রে একটা উৎকট বিচ্ছিরি ঝামেলায় রয়েছে হাসান; একটা নোংরা অশিক্ষিত কোটিপতিকে ধরেছে অচিকিৎসা কবিতাব্যারামে, কোটিপতিটা হাসানের সাথে অ্যাডের থেকে কবিতা আলোচনা করতেই বেশি পছন্দ করছে, সারাক্ষণ কবিতা, যেনো ওই কোটি কোটি টাকা, পাজেরো, কারখানা, আমদানিরপ্তানি, গাড়ির, চামড়ার ও আরো চৌত্রিশটা ব্যবসা কিছু নয়, কবিতাই সব, তাকে এখন অবিনশ্বর অমরতার রোগে ধরেছে। টাকা হয়েছে, এখন অমরতাও ওর চাই; পারলে কিনে ফেলতো, অমরতা যদি নিউইয়র্ক হনুলুলু সিডনি লন্ডনের একটা ফ্ল্যাট হতো, তাহলে এতো দিনে ও কিনে ফেলতো। ওর ফার্মের একটা অ্যাড পাওয়ার পরই হাসানের পরিচয় ওই মোটা গ্যালগ্যালে থুতুছিটোনো ঋণখেলাপিটার সাথে; হাসানকে পাওয়ার পর সে অ্যাডের কথা ভুলতেই বসেছে; জসীমউদ্‌দীন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো পদ্যে, 'আমার মাথা নত ক'রে দাও', 'মিলন হবে কত দিনে' ধরনের মরমী গানে দামি খাতা ভ'রে তুলছে, হাসানকে নিমন্ত্রণ ক'রে চলছে তার বনানীর বাড়ি গিয়ে পান করতে করতে

ওগুলো একটু দেখে দিতে। এই চোদানি পাছামারা কোটিপতিগুলোকে কেনো যে শেষ বয়সে চাকরানিরোগের মতো কবিতারোগে ধরে, হাসান বুঝতে পারে না; এই চার ডেঞ্চারঅলাটা একলাই নয়, আরো কয়েকটিকে দেখেছে হাসান, তারা কবিতা লিখে অমর রবীন্দ্রনাথ হ'তে চায়। কোটি কোটি বনানী পাজেরো ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদির পর কেনো এই পেটমোটা গাড়লগুলোর এই অমরতারোগ? ওরা পাক্কা ঝানু লোক, অঙ্কিসন্ধি সব জানে; কিন্তু হাসান ওদের পদ্য দু-একটি প'ড়ে দেখেছে, ভেতরে ভেতরে ওরা শিশু, ক্লাশ ফোরের শিশু, তুচ্ছ সরল মহান আবেগে ওরা ফুলেফেঁপে আছে। এক দিকে যারা ঈশ্বরের থেকেও এতো প্রাপ্তবয়স্ক অন্য দিকে তারা কীভাবে হয় এতো অপ্রাপ্তবয়স্ক? এই ঝানু পাক্কা কোটিপতিটাও একটা শিশু, বস্তি, ব্রিজ, রেলগাড়ি, ধর্ষিতা হালিমা রহিমা সালেহাকে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ জসীমউদ্‌দীনের মতো অনেক পদ্য লিখে ফেলেছে, জীবনে যে সে কিছুই করতে পারে নি, তার সোনার মানবজীবন যে ব্যর্থ গেছে, চাষটাষ কিছুই করতে পারে নি, তার জন্যে সে পাতায় পাতায় হাহাকার করেছে, 'প্রভু', 'প্রেম', 'হৃদয়' লিখতেও বানান ভুল করেছে, কিন্তু কবি তাকে হ'তে হবে, অমরতা তার চাই।

হাসানকে যেতেই হবে তার বনানীর বাড়িতে, একটু পানাহার করতে করতে দেখে দিতে হবে তার ওই অবিনাশী রচনাবলি; সে কিছু চায় না, একটু অমরতা চায়। হাসান একা যেতে রাজি হয় নি, বলেছে সে তার এক কবিবন্ধুকে নিয়ে যাবে, যে আরো বড়ো কবি, যে তার কবিতা দেখে দিলে সে কবি হবেই, এমনকি রবীন্দ্রনাথও হয়ে যেতে পারে। রাকিব সুলতানকেই মনে পড়েছে হাসানের, রাকিব পান করতে পছন্দ করে, এবং এসব কোটিপতির সামনে সহজেই জিপ টেনে খুলে অনায়াসে একটা পরম দীর্ঘ উত্তেজিত সত্য দেখিয়ে দিতে পারে।

গাড়লটা একটা বাড়ি করেছে বটে, আরেকটুকু হ'লেই বাড়িটার নাম তাজমহল রাখতে পারতো। না কি রেখেছে? হাসানদের গাড়ি যখন ভেতরে ঢুকছে পাঁচসাতটা দারোয়ান এসে টানাটানি ক'রে তোরণ খুলে দেয়, একটা ছোটোখাটো জাতীয় উদ্যানের ভেতর দিয়ে গাড়ি গিয়ে তাজমহলের দরোজায় থাকে; গাড়লটা লোক বেশ, মনেপ্রাণে কবি তো, গ্রহের চক্রান্তেই শুধু টাকাপয়সা করেছে, তার সম্পূর্ণ মোটা শরীরটা নিয়ে ছুটে আসে তাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে, যদিও একটা চাকর পাঠিয়ে তাদের ওপরে নিয়ে গেলেই হাসান যথেষ্ট ধন্য বোধ করতো। কিন্তু না, তারা তো কোনো কোটিপতির বাড়ি আসে নি, তারা দুজন বড়ো কবি এসেছে এক ছোটো অপ্রতিষ্ঠিত কবির বাড়িতে, তাদের এভাবেই অভ্যর্থনা করতে হবে, নইলে এ-বাড়িতে তারা পা ফেলবে কেনো?

রাকিব সুলতান কোটিপতিটার পেট হাত বুলোতে বুলোতে বলে, ভাই, আমরা দুইজন বড় কবি আসলাম একজন ছোট কবির বাড়িতে, রবীন্দ্রনাথরা আসলো কুমুদরঞ্জনের বাড়িতে, এই মহান ঘটনার কথা বাঙলা কবিতার ইতিহাসে বোল্ড টাইপে ল্যাখা থাকবো।

কোটিপতিটা বলে, হ, কবিভাই, ল্যাখা থাকবো; জীবন আমার ধইন্য হইল।

রাকিব সুলতান বলে, কিন্তু দুইজন বড় কবি আসলো, তাগো অভ্যর্থনা করার জন্যে আপনে সেইরকম আয়োজন ত করেন নাই। বড় কবিগো সম্মান না দিলে ছোট কবিরা কবি হইবো কিভাবে?

কোটিপতিটি মেঝে গ'লে পড়ার ভঙ্গিতে বলে, আমার ভুল হইয়া গ্যাছে, বলেন কবিভাই, কি আয়োজন করতে হইবো?

হাসান অত্যন্ত কষ্টে হাসি চেপে রেখে বলে, না, না, আপনি বিচলিত হবেন না, কোনো ভুল হয় নি, আর কোনো আয়োজন করতে হবে না।

রাকিব বলে, আমরা দুইজন বড় কবি একটা ছোট কবির বাড়িতে আসলাম, এই ঘটনা ত শতাব্দীতে একবারই ঘটবো, দুইবার ঘটবো না, আপনের উচিত আছিল আমরা যেই পথ দিয়া উপরে যামু যেই পথে আমাগো পায়ের ধুলা পরবো সেই পথে বিশ পঁচিশ কেজি গোলাপের পাপড়ি ছরাই ছরাই রাখন।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে কোটিপতি কবি, চিৎকার ক'রে ডাকতে থাকে ডজনখানেক চাকরবাকরকে, খুবই বিব্রত হয়ে বলতে থাকে, কিছু মনে কইরেন না কবিভাইরা, কিছু মনে কইরেন না, আমার ভুল হইয়া গ্যাছে, এখনই আমি এক মোন গোলাপের পাপড়ি আইন্যা আপনাগো পথে ছরাই দিতেছি।

ওপরে গিয়ে দেখে বসার একশোবর্গমাইল ঘরটিতে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ সমস্ত শিল্পকলা সমস্ত সৌন্দর্য গাদাগাদা জড়ো করা আছে, মাটির নিচের মাটির ওপরের সমুদ্রের ভেতরের উত্তর মেরুর দক্ষিণ মেরুর বিষুব রেখার কর্কট ক্রান্তির পর্বত চূড়োর আকাশের ওপরের আফ্রিকার জঙ্গলের আমেরিকার শহরের ইউরোপের বন্দরের সব কিছুর আবর্জনাস্তূপ সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাকিব বলে, এইখানে ত বসনের কোনো জায়গা নাই।

কোটিপতি কবিটি বুঝতে না পেরে বলে, এই যে সোফাগুলি দেখতেছেন, এইগুলিতেই বসেন কবিভাই, পাঁচলাখ দিয়া বানাইছি।

রাকিব বলে, এইগুলি বসনের লিগা বুঝি, কবিভাই? আমি ত ভাবতেছিলাম হাগনের লিগা।

লোকটি চমকে উঠে বলে, কি কইলেন কবিভাই, কি কইলেন?

রাকিব বলে, না, কবিভাই, কিছু কই নাই; কিন্তু কথা হইছে আমি আবার মহাকবি মধুসূদনের মতো পিঁড়ি না হইলে বসতে পারি না, মহাকবিরা পিঁড়িতে বসতে পছন্দ করে।

লোকটি বলে, ফিরি? ফিরি? ফিরি কই পামু? গ্যারামে ফিরিতে বইতাম, আমাগো অনেক ফিরি আছিল, এইখানে ত ফিরি নাই। দুইটা ফিরি কিন্যা আনুম?

হাসান কার্পেটের ওপর বসতে বসতে বলে, এখানেই বসি, বিলের ঘাসের মতো মনে হচ্ছে।

লোকটি বলে, কার্পেটের ওপরই বসবেন, কবিভাই? বসেন।

হাসান আর রাকিব কার্পেটের ওপর ব'সে পড়ে।

রাকিব বলে, লগে একটা লুঙ্গি আর গামছা লইয়া আসলেই ভাল হইত।

কোটিপতি কবিটি দৌড়ে গিয়ে গোটাচারেক মোটাগাটা দামি ডায়েরি এনে রাখে তাদের সামনে, এবং ডাকতে থাকে, ও মনোরা, ও হালিমা, ও রোকেয়া, এইদিকে আসো।

তার ডাকের সাথে সাথে বেশ তরতাজা বেশ টাটকা বেশ সুগন্ধি বেশ মাংস মনোরা, হালিমা, রোকেয়া এসে হাজির হয়।

কোটিপতি কবি বলে, আমার বড় কবিভাইরা আসছে, দ্যাশের দুইজন অইত্যান্ত বড় কবি, বোতল আর পারোটা গোস্ত, প্লেট, গেলাশ লইয়া আসো, বাইর‍্যা দেও।

মেয়ে তিনটি গোটাচারেক ব্ল্যাক লেবেলের বোতল, পারোটা, গোস্ত, কাবাব, প্লেট, চামচ, ধবধবে শাদা পানপাত্র নিয়ে আসে। তারা ছুরি নিয়ে কাটা কুমড়োর ফালির মতো হেসে হেসে প্লেটে প্লেটে মাংস পরোটা কাবাব বেড়ে দিতে থাকে, রাকিব গেলাশে গেলাশে ব্ল্যাক লেবেল ঢালতে থাকে।

ঢেলেই রাকিব এক গেলাশ ঢক ঢক ক'রে গিলে ফেলে, এবং বলে, ও মিস মনোরা মিস হালিমা মিস রোকেয়ারা, বোঝলা আমরা বড় কবি।

মেয়ে তিনটি নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি ক'রে ইলশের ঝোলে হলদে কুমড়োর ফালির মতো হাসতে থাকে।

কোটিপতি কবিটি ডায়েরি খুলে তার নারীবাদী একটি কবিতা পড়তে থাকে, হায়রে নারী, তোমরা সতী, তোমরা হইলে মায়ের জাতি, তাই ত আমরা পুরুষগণ তোমার পায়ে মাথা পাতি। তোমরা ছারা ক্যামন হইত, এই দুনিয়া খালি রইত।

রাকিব পান করতে করতে জিজ্ঞেস করে, কবিভাই, আপনের ইস্ত্রী আর পোলাপানরা কই?

কবি বলে, অহ, আমার ইস্ত্রী ত আমরিকায় থাকে, আর এক পোলা থাকে লন্ডনে, একপোলা নিউইয়র্কে, আরেকপোলা সিডনিতে, এক মাইয়া থাকে ওয়াশিংটনে, আরেক মাইয়া থাকে টরন্টোতে...

রাকিব বলে, আর আপনে কবিভাই কষ্ট কইরা মিস মনোরা মিস হালিমা মিস রোকেয়ারে লইয়া এই গরিবকুটিরে একলাই থাকেন?

কবি বলে, কি আর করুম কবিভাই, অগো লইয়াই আছি।

হাসান বলে, ধনীদের নিঃসঙ্গ দুঃখ খুবই ব্যাপক, ধনীরা খুবই দুঃখী।

রাকিব কয়েক গেলাশ গিলে ফেলেছে, খুবই চমৎকার আছে, জিজ্ঞেস করে, কবিভাই, মাইয়াগুলিরে আপনে একলাই ইউটিলাইজ করেন, না অন্য কবিগোও ব্যবহার করতে দেন?

কবিও এর মাঝে তার পাঁচ সাতটি কবিতা পড়তে পড়তে দু-তিন গেলাশ গিলে ফেলেছে, তার কণ্ঠে কবিতা জড়িয়ে আসছে।

কবি বলে, বয়স হইলেও তিন চাইরটা মাইয়া আমার একলাই লাগে, আমার প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড ঠিক আছে।

রাকিব বলে, দুইটা আইজ বড় কবিগো ইউটিলাইজ করতে দেন, পত্রিকায় আপনের কবিতা ছাপাই দেঅনের ব্যবস্থা করুম।

মেয়ে তিনটি ঘোরাঘুরি করছে, হাসছে, গেলাশে ব্ল্যাক লেবেলও ঢেলে দিচ্ছে, মনে হচ্ছে বড়ো কবিদের ওরা অপছন্দ করছে না।

কবি একটু রেগে ওঠে, কবিভাইরা, আমার কবিতা শোনেন, কবিতা শোননের লিগা আপনাগো দাওয়াত দিয়া আনছি, ব্ল্যাক লেবেল খাওয়াইতেছি।

রাকিব বলে, আপনের ওই বালের কবিতা শুনতে শুনতে আমার প্যাট ভইর‍্যা মুতে ধরছে।

কোটিপতি কবি রাকিবকে টয়লেট দেখানোর জন্যে একটি মেয়েকে ডাকাডাকি করতে থাকে।

রাকিব বলে, বড় কবিরা ছোট কবির বাসায় আইস্যা টয়লেটে মোতে না, তাগো কার্পেটে মোতে সোফায় মোতে লাখট্যাকার ফুলদানিতে মোতে রঙিন মাছের বাক্সে মোতে তাগো মোখে মোতে।

রাকিব দাঁড়িয়ে জিপ খুলতে থাকে, এবং এক সময় শা শা ক'রে এদিকে সেদিকে প্রস্রাব করতে থাকে, তার ধারা থামে না।

কোটিপতি কবিটি চিৎকার ক'রে ওঠে, এ আপনে কি করতেছেন, এ আপনে কি করতেছেন? এইটা বাথরুম না, এইটা বাথরুম না, এইটা আমার দশ লাখ ট্যাকার কাশ্মিরি কার্পেট।

রাকিব বলে, হাসান, এই ভাগাড়ে তুমিও একটু মোতো, মোতার জইন্যে এর থিকা ভাল জায়গা আর পাইবা না, বড় কবিরা কোটিপতির বাড়িতে এইভাবেই মোতে, মোতো হাসান মোতো।

রাকিব সুলতান যেনো পাঁতাগ্রুয়েল হয়ে উঠেছে।

হাসানেরও তীব্র প্রস্রাবে ধরেছে, তার তলপেট ফেটে যাচ্ছে, শিশ্ন শক্ত হয়ে প্রচণ্ড ব্যথায় ভেঙে পড়ছে, তার মাথার চারদিকেও সবুজ কুয়াশা জ'মে আসছে গোলাপি গন্ধ জ'মে আসছে রুপোলি জল টলমল করছে; সে টয়লেটে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ায়, বসার একশোবর্গমাইল দশকোটি টাকার ঘরটিকে তার রেলস্টেশনের রাস্তার পাশের একটা নোংরা প্রস্রাবখানা মনে হয়, যার দেয়ালে লেখা আছে 'এখানে প্রস্রাব করিবেন না', কিন্তু যাকে দেখলেই রিকশাঅলা পকেটমার ভিখিরি পিয়ন হকারদের তীব্র প্রস্রাবে ধরে। পচা ইঁদুর প'ড়ে আছে এখানে ওখানে, ছড়িয়ে আছে পাতলা পায়খানা, পাগলের বমি, ভজভজ ক'রে ময়লা ছুটছে, ছড়িয়ে আছে মাসিকভেজা ত্যানা, কুকুরের গু; এতো ঘিনঘিনে জায়গায় সে প্রস্রাব করে কী করে? তার একটি পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে টয়লেট দরকার।

হাসান বলে, আমার একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন টয়লেট দরকার, বড্ডো প্রস্রাবে ধরেছে, আমার একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন টয়লেট দরকার।

কোটিপতি কবি বলে, ওই দিকে যান, একটা বড়ো টয়লেট আছে।

হাসান তলপেট চেপে একলা হাঁটতে হাঁটতে একটি পাঁচকোটি টাকার ঘরে ঢোকে, মনে হয় এখানে প্রস্রাব করতে পারবে, কিন্তু ঘরটি দেখে তার শরীর ঘিনঘিন করতে থাকে, সে বলে, 'এতো নোংরায় আমি প্রস্রাব করতে পারি না'; সে আরেকটি পাঁচকোটি টাকার ঘরে ঢোকে, সেটা দেখেও বলে, 'এতো নোংরায় আমি প্রস্রাব করতে পারি না'; সে আরেকটি পাঁচকোটি টাকার ঘরে ঢোকে, এবং বলে, 'এতো নোংরায় আমি প্রস্রাব করতে পারি না'। সে ঘর থেকে ঘরে ঘুরতে থাকে, কোটি কোটি টাকায় সাজানো প্রত্যেকটি ঘরকে তার নোংরা আবর্জনাস্তূপ ব'লে মনে হয়, এবং সে বলতে থাকে, 'এতো নোংরায় আমি প্রস্রাব করতে পারি না'। ঘুরতে ঘুরতে সে আবার একশোবর্গমাইল বসার ঘরটিতে এসে উপস্থিত হয়, দেখে প্রস্রাবের ওপর গড়াচ্ছে রাকিব সুলতান।

হাসান বলে, রাকিব ওঠো, বাইরে চলো, প্রস্রাবের জন্যে একটি পরিচ্ছন্ন জায়গা দরকার।

রাকিব বলে, চলো, এই ভাগাড়ে দম বন্ধ হইয়া আসতেছে।

হাসান রাকিবকে টেনে তুলে ওই আবর্জনাস্তূপ থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসে; এবং বলতে থাকে, একটি পরিচ্ছন্ন টয়লেট দরকার, একটা পরিচ্ছন্ন টয়লেট দরকার, খুব প্রস্রাবে ধরেছে।

শ্যামলীকে ভালোবাসার প্রথম চারটি বছর হাসানের কেটে যায় এক নিশ্বাসে, সময়টাকে একটি দুপুরের মতো মনে হয়, যার সকাল নেই সন্ধ্যা নেই রাত্রি নেই, শুধুই দুপুর; সে কবিতার পর কবিতা লিখতে থাকে, মাঝেমাঝে দু-একটি গদ্য, তার কবিতার ভেতরে মেঘ বৃষ্টি নদী নগর গ্রাম সন্ধ্যা রাত্রি অগ্নি বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হয়ে ঢুকে থাকে শ্যামলী, ছড়িয়ে থাকে তার মুখ, তার চোখ, তার চুল, তার আঙুল, তার স্তন; অ্যাডেও সে সফল হ'তে থাকে, পদোন্নতি ঘটতে থাকে। সে পাচ্ছে, তার মনে হ'তে থাকে সে পাচ্ছে, যদিও কিছুই সে পেতে চায় না, পাওয়ার কিছু নেই; কবি হয়ে উঠেছে সে, তাকে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই, দুটি-একটি পুরস্কারও হাস্যকরভাবে পেয়ে যাচ্ছে, ভালো সিগারেট খেতে পাচ্ছে, স্কচ পান করতে পারছে, এবং শরীরটিও তার সুখে আছে, মনটিও সুখে আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শরীর, ওটি যদি খাদ্য পায় তাহলে সব কিছু সুস্থ থাকে, শহর গ্রাম মহাজগত ধানক্ষেত, এমনকি কবিতাও সুস্থ হয়ে ওঠে। শ্যামলী জুগিয়ে চলছে তার শরীরমনের খাদ্য; তার শরীর ও কবিতা বদলে যাচ্ছে ওই খাদ্যে, শ্যামলী ছাড়া তার শরীর এতোদিনে কুষ্ঠরোগে ভ'রে যেতো।

হাসানের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ বেরোনোর পর এক দীর্ঘ দুপুরে বিছানায় নগ্ন গড়াতে গড়াতে শ্যামলী বলেছিলো, তোমার কবিতার চরিত্র খুবই বদলে গেছে, তোমার কবিতা একটা বড়ো বাঁক নিয়েছে।

হাসান বলেছিলো, সব কিছুই বদলে যায়, জীবন বাঁক নেয়, কবিতাও বাঁক নেয়, কিছুই স্থির হয়ে থাকে না তুমি তো জানোই।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করেছিলো, আমরাও কি বাঁক নিচ্ছি? আমাদের সম্পর্কও কি বদলে যাচ্ছে?

হাসান বলেছিলো, হ্যাঁ, বদলে যাচ্ছি আমরাও।

শ্যামলী বলেছিলো, আগে তোমার কবিতা ভরা ছিলো প্রবল কামে, মনে হতো সব কিছুর সাথে তুমি সঙ্গম করছো, এখন সেই কাম নেই, প্রেম আছে।

হাসান বলেছিলো, প্রত্যেকের জীবনে একটা সুন্দর অসহ্য ষন্ত্র ্নে প্রবল ঝকঝকে সোনার মতো অগ্নিশিখা বর্শাফলক বোশেখের রোদ জ্যৈষ্ঠের জোয়ারের মতো মোহন কাম দেখা দেয়, সে কবি হ'লে ওই কাম কবিতা হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, জীবনানন্দে তা ঘটেছে, ঘটেছে আমার কবিতায়ও।

শ্যামলী তার একটি প্রচণ্ড প্রত্যঙ্গ ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, এখন কাম নেই?

হাসান হেসে বলেছিলো, এটা কতো বড়ো মূর্খ চাষা তা তো তুমি জানোই।

শ্যামলী বলেছিলো, এই চাষাটা আমার জীবন, এই চাষাটার সাথে দেখা হওয়া আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা।

হাসান বলেছিলো, চাষ কেমন লাগে?

শ্যামলী বলেছিলো, এই চাষ ছাড়া আমি বুঝতাম না আমি মাটি।

হাসান হেসে বলেছিলো, তোমাকে তো এটা আমি দানই করেছি।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করেছিলো, কতোটা ক্ষুধা ছিলো তখন?

হাসান বলেছিলো, ক্ষুধা ছাড়া আর কিছু ছিলো না, তখন ক্ষুধাই ছিলো খাদ্য ক্ষুধাই ছিলো পানীয়। ওই অপূর্ব ক্ষুধা মেটানোর জন্যে তুমি ছিলে না, কেউ ছিলো না, নিজের বর্শাফলকের ক্ষুধা অগ্নিগিরির ক্ষুধা আকাশফাড়া বিদ্যুতের ক্ষুধা মেটাতে হতো নিজেকেই, মেটাতে হতো কবিতার পর কবিতায়।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করেছিলো, এখন কবিতায় ওই কাম কমলো কেনো?

হাসান বলেছিলো, তুমি আছো ব'লে, কাম বদলে প্রেম হয়ে উঠছে।

শ্যামলী বলেছিলো, আমি তোমাকে চিরকাল ভালোবাসবো।

হাসানের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ বেরোনোর সাফল্যের কয়েক মাস পর এক নতুন বিমর্ষকর ক্ষুধা একটু একটু যন্ত্রণা দিতে শুরু করে হাসানকে; অস্পষ্ট অবোধ্যভাবে তার মনে হ'তে থাকে তার অপূর্ব ক্ষুধা সম্পূর্ণ মিটছে না, সে সম্পূর্ণ পাচ্ছে না, যেমন নদী পায় ইলিশকে আকাশ মেঘকে জমি শস্যকে, তাকে পেতে হবে সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ পদ্মায় সম্পূর্ণ ইলিশ সম্পূর্ণ আকাশে সম্পূর্ণ মেঘ সম্পূর্ণ জমিতে সম্পূর্ণ শস্য, এক দুপুর তার জন্যে যথেষ্ট নয়, তার চাই সম্পূর্ণ দিন সম্পূর্ণ রাত্রি সম্পূর্ণ মহাকাল, সম্পূর্ণ শরীর সম্পূর্ণ নারী। বিস্মিত হয় হাসান, এমন ক্ষুধা এর আগে জাগে নি, শ্যামলীকে ফোন ক'রে, শ্যামলীর ফোন পেয়ে, মাঝেমাঝে দুপুরে তার শরীর পেয়েই মিটতো তার ক্ষুধা, মনে হতো সুখী পরিতৃপ্ত মহাজগত, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মিটছে না; এ এক ভিন্ন ক্ষুধা, শ্যামলীকে তার পেতে ইচ্ছে করছে ভোরে, যখন সে দাঁত ব্রাশ করছে, বিচ্ছিরি দাড়ি কামাচ্ছে; দেখতে ইচ্ছে করছে ভোরের ছায়াচ্ছন্ন বাথরুমে, তাহাকে দেখতে ইচ্ছে করছে স্নানাগারে শাওয়ারের বর্ষণের নিচে নগ্ন; তার পেতে ইচ্ছে করছে দুপুরে, ভাজা চিংড়ি ধনেপাতা ইলিশ কাঁচামরিচ পেঁয়াজ টমেটো রেজালার গন্ধে পরিপূর্ণ খাবার

টেবিলে; তার পেতে ইচ্ছে করছে সূর্যের সম্পূর্ণ দিন ভ'রে, পূর্ণ চাঁদ ও অচাঁদের অন্ধকার রাত ভ'রে; শ্যামলীর সাথে একটি সম্পূর্ণ রাত একটি সম্পূর্ণ দিন কেমন হ'তে পারে, ভেবে ভেবে সে কেঁপে ওঠে; শ্যামলীকে তার রাতভর দশ আঙুলে ছুঁতে ইচ্ছে করে, শ্যামলীর দু-পা সারারাত নিজের দু-পা দিয়ে জড়িয়ে রাখতে ইচ্ছে হয়, তার ইচ্ছে করে মধ্যরাতে শেষরাতে শ্রাবণের বৃষ্টির শব্দে হঠাৎ জেগে উঠে শ্যামলীর মুখ দেখতে। সারা দিন ভ'রে কীভাবে বদল ঘটে শ্যামলীর, ফ্রিজ খোলার সময় তাকে দেখতে কেমন লাগে; কেমন লাগে দেখতে সে যখন স্নানাগার থেকে বেরোয়? কতোটা সুগন্ধ তার পেছনে পেছনে লেগে থাকে? শ্যামলী যখন শরীরে সাবান মাখে স্নানাগারে, চুলে শ্যাম্পু ঘষে, তখন তাকে কেমন লাগে? দেখতে ইচ্ছে করে বিছানার অন্ধকারে কেমন লাগে শ্যামলীর ওষ্ঠ নাক গাল স্তনের চারদিকের শ্যামল জ্যোতির্ময় জ্যোৎস্না। শ্যামলী কীভাবে রাতে, মধ্যরাতে, শেষরাতে ঘুমোয়? রাতগুলোতে শ্যামলীকে নিশ্চয়ই উরুর ভেতর গেঁথে রাখেন মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন খান, শ্যামলীর বিবাহিত স্বামী; হয়তো রাখেন, হয়তো রাখেন না, বিবাহিত স্বামীদের ঘুমোনোর রীতি হয়তো ভিন্ন; হাসান যন্ত্রণা বোধ করে যে সে শ্যামলীর স্বামী নয়, শুধুই প্রেমিক। স্বামী তো সে কখনো হ'তে চায় নি; এখন কি তার স্বামী হ'তে ইচ্ছে করছে? শ্যামলীর স্বামী? অন্য কোনো তরুণীর স্বামী? কবি কি স্বামী হ'তে পারে? স্বামী মানেই তো পেটমোটা নিরানুভূতি এক অনস্তিত্ব, এক চমৎকার সামাজিক জন্তু, এক শোচনীয় সাফল্য, যার কাজ সংসার চালানো, রাতে স্ত্রীর সাথে স্বল্প সঙ্গম, স্বস্তি, সন্তান, এবং নাক ডেকে ঘুমোনো; স্বামী মানেই তো বাজার, হাউজিং সোসাইটিতে প্লট, পাঁচতলা বাড়ির ফাউন্ডেশন, সোফাসেট, গাড়ি, স্ত্রীর শাসন। সে কি ওই শ্রদ্ধেয় স্বামী হ'তে চায়? স্বামী হ'তে হ'লে কবুল কবুল বলতে হয়, বিয়ে করতে হয়; সে কি বিশ্বাস করে ওই নিরর্থক কবুল কবুলে, বিশ্বাস করে বিয়ে নামের হাস্যকর প্রথায়? সে কি স্বাক্ষর দিতে চায় ঘিনঘিনে নোংরা কাবিনে? একটি গাড়ল, একটা আধামধ্যযুগীয় আধাআধুনিক, কাবিনকে সোনালি ব'লে গুচ্ছের কবিতা লিখেছে, ওই গ্রাম্যতা নিয়ে মেতে উঠেছে অর্ধশিক্ষিতরা, তাতে হাসি পায় হাসানের। নির্বোধরা মেতে উঠতে পারে কতো কিছু নিয়েই– বলো কন্যা, কবুল কবুল, হা হা হা হা হা। কাবিন সোনালি নয়, কাবিন প্রেম নয়, কাবিন শেকল; বিয়েতে প্রেম নিষিদ্ধ; বিয়ে হচ্ছে সঙ্গম, সংসার সন্তান। সে কি ওই বিয়ে চায়, বিয়ে ক'রে স্বামী হ'তে চায়?

কবি অর্থই কি শুধু প্রেমিক, শুধু হৃদয় শরীরের শাশ্বত হাহাকার, শুধু ব্যর্থতার কর্কশ অমরতা? শুধু কবিতার মতো ছন্দবিন্যস্ত চিত্রকল্পময় প্রতীকরূপকপরিবৃত জীবনযাপন? শুধু এক দুপুর? শুধু চুম্বন, আলিঙ্গন, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর আশ্লেষ? আর কিছু নয়? কবির কি গৃহ থাকবে না, বিকেলে কবি কি ফিরে আসবে না গৃহে; কোনো ফ্ল্যাটে কোনো দোতলা তেতলা নিজের বাড়িতে? গৃহহীন থাকাই কবিত্ব? কবি কি ইলিশ শোল বোয়াল পাংগাশের পেটি কিনবে না, ধনেপাতা কিনবে না, বেছে বেছে কিনবে না কাগজি গোরা লেবু? কেনার আগে ভেঙে দেখবে না ঝিংগে টাটকা আছে কি না? কবি

কি লাউডগা কইমাছ খাবে না? খাবে না কইয়ের দোপেঁয়াজা? কবি কি স্ত্রীকে চেপে চেপে চেপে গর্ভবতী করবে না, স্ত্রীকে নিয়ে ম্যাটারনিটিতে যাবে না, জন্ম দেবে না একটির পর একটি অমৃতের দণ্ডিত উপহার, লিকলিকে গাবদাগোবদা স্টুপিড মেধাবী? স্ত্রী রাজি না হ'লেও সে কি জোর ক'রে উপগত হবে না যখন তার দুর্বল উত্তেজনা জাগবে? কবি কি স্ত্রীর বগলের মুখের তলপেটের গন্ধে বমি চেপে রাখতে রাখতে সমাপ্ত করবে না তার কাম? তারপর কি স্ত্রীকে দূরে ঠেলে দিয়ে পা ছড়িয়ে ঘুমোবে না নাক ডেকে? কবি কি একটা প্লটের জন্যে ছোটাছুটি করবে না, হাউজ বিল্ডিংয়ের ঋণ নেবে না একটা পাঁচতলা বাড়ির জন্যে; ঘুষ দেবে না বিদ্যুতের গ্যাসের পানির টেলিফোনের কেরানিকে আয়করের উপকরকমিশনারকে? কবি কি শুধু তার কবিতার মতো শিল্পকলা চিত্রকল্প যাপন ক'রে যাবে? জীবন কি শুধুই শিল্পকলা শুধুই উপমা চিত্রকল্প? জীবন কি থুতু মল প্রস্রাব স্যানিটারি টাওয়েল নয়? স্ত্রী ব্যাপারটিকেই হাসান ঘেন্না করে; স্ত্রী অর্থই তো স্তব্ধ রান্নাঘর, ঘোলা ধুঁয়ো, হলুদ, মরিচ, মশলা, কোমরে বাহুতে তলপেটে ধীরস্থির বর্ধমান মেদের ঘোলাটে মহাবন্যা, একশো কেজি ক্লান্তি, বিমর্ষ ঠোঁটে বিমর্ষতর লিপস্টিকের দাগ, অবিরাম অনন্ত শাসন, কবিতা থেকে সহস্র বর্ষের দূরবর্তিতা; সে কি একটি স্ত্রী চায়? শ্যামলীকে কি সে স্ত্রী হিশেবে চায়, বা অন্য কোনো তরুণীকে, অন্য কোনো নারীকে?

এক দুপুরের পর বিকেলে যখন তারা ক্লান্তি থেকে ফিরে এসেছে অক্লান্তিতে, গড়াচ্ছে বিছানায়, শ্যামলী উঠি উঠি করছে, তাকে বাসায় ফিরে যেতে হবে, আর দেরি করতে পারবে না, সে, হাসান বলে, শ্যামলী, এখন উঠো না।

শ্যামলী একটু চমকে উঠে বলে, আমাকে এখন যেতে হবে।

হাসান বলে, না, তুমি এখন যাবে না।

শ্যামলী বলে, এখন তো যেতেই হবে, একটু পর ফরহাদ সাহেব বাড়ি ফিরবে, আর দেরি করা ঠিক হবে না।

হাসান বলে, কে ওই ফরহাদ সাহেবটি?

শ্যামলী বলে, কেনো, আমার হাজব্যান্ড।

হাসান বলে, ওটি তোমার কেউ নয়, তুমি তো সব সময় বলো ওই লোকটিকে তুমি ভালোবাসো না, তাই ওর জন্যে তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।

শ্যামলী বলে, তা তো সত্যিই তাকে আমি ভালোবাসি না, তার জন্যে আমার আবেগ নেই, কিন্তু আমি তার ওয়াইফ।

হাসান জিজ্ঞেস করে, আমাকে তুমি ভালোবাসো?

শ্যামলী বলে, হ্যাঁ, তুমি তো জানোই তোমাকে আমি কতোখানি ভালোবাসি, তোমাকে ছাড়া আমার জীবন শূন্য।

হাসান বলে, তাহলে এটা কী ক'রে হয় যাকে ভালোবাসো না তার জন্যে তুমি যাকে ভালোবাসে তাকে ছেড়ে যাচ্ছো?

শ্যামলী বলে, আমি যে তার সংসারে আছি; তাই তার ফেরার আগে আমাকে বাসায় ফিরতেই হবে, নইলে সে রাগ করবে।

হাসান বলে, ফিরুক, রাগ করুক, তুমি যাবে না।

শ্যামলী বলে, না গেলে কী ক'রে চলবে?

হাসান বলে, তুমি আজ বিকেল ভ'রে থাকবে, সারারাত আমার সাথে থাকবে।

শ্যামলী বিস্মিত হয়ে বলে, সারারাত?

হাসান বলে, হ্যাঁ, সারারাত।

শ্যামলী বলে, তা কী ক'রে হয়? বাসায় ফরহাদ সাহেব আছে, ছেলেমেয়েরা আছে; আমি কী ক'রে সারারাত থাকি?

হাসান বলে, থাকুক, তুমি আমার সাথে সারারাত থাকবে।

শ্যামলী বলে, না, এটা হয় না, হাসান।

হাসান বলে, আমি সারারাত তোমাকে দেখতে চাই, সারারাত তোমাকে জড়িয়ে ধ'রে ঘুমোতে চাই, তুমি থাকবে।

শ্যামলীর সময় নেই, তাকে এখনি বেরিয়ে যেতে হবে, নিচে গিয়ে স্কুটার ধরতে হবে, বাড়ি পৌঁছোতে হবে ফরহাদ সাহেবের ফেরার আগে। শ্যামলী উঠে ঠিকঠাক হয়ে হাসানকে একটি চুমো দিয়ে বেরিয়ে যায়। হাসান শুয়ে থাকে, শ্যামলী যে বেরিয়ে যাচ্ছে সেদিকেও তাকিয়ে দেখে না।

সালেহ ফরিদউদ্দিন কবি হিশেবে নাম করেছে, এর মাঝে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ বের ক'রে ফেলেছে, কবিতা ছাড়া আর কিছু সে বোঝে না; তার এলোমেলো কাতর হাহাকারভরা পংক্তির সমষ্টি খুব আলোড়িত করছে তরুণদের; মাঝেমাঝে সালেহ আসছে হাসানের অফিসে; আজও এসেছে। খুব শুকিয়ে গেছে সালেহ, হাসানের প্যাকেট থেকে একটির পর একটি সিগারেট টানছে, চা খাচ্ছে কাপের পর কাপ, কেঁপে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে, নিজের কবিতা আবৃত্তি করছে একটির পর একটি, ভুল করছে আবার সংশোধন করছে।

সালেহ বলে, দোস্ত, মনে হইতেছে আমি পাগল হইয়া যাইতেছি।

হাসান বলে, না, না, তুমি পাগল হবে কেনো? তোমাকে আরো অনেক কবিতা লিখতে হবে, তুমি চমৎকার লিখছো।

সালেহ বলে, কবিতা লেখনের থিকা পাগল হইতেই আমার বেশি ভাল লাগতেছে। পাগল হওন অনেক সুখের, গাঁজা খাওনের মতন, মাথার ভিতর মাঘের কুয়াশার মতন শাদা হইয়া কবিতা নামতেছে, ম্যাঘের মতন কবিতা জমতেছে, এত ভাল কবিতা হয় না, জীবনানন্দের থিকা অনেক ভাল।

হাসান জিজ্ঞেস করে, সেগুলো লিখে ফেলছো না কেনো?

সালেহ বলে, আরে দোস, ল্যাখতে গ্যালেই দেখি সেইগুলি নাই, কুয়াশা নাই, ম্যাঘ নাই, কবিতা নাই, খালি আজেবাজে লাছ। কিন্তু পাগল হওন মায়ের প্যাটে ঘুমাই থাকনের মতন, পাগল হওয়াই হইব আমার শ্রেষ্ঠতম কবিতা।

সালেহ চোখ বন্ধ ক'রে নিজের কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে।

হাসান বলে, তোমার ডাক্তার দেখানো দরকার, সালেহ।

সালেহ বলে, ডাক্তার দেখাইছি, ডাক্তার বলছে আমার সিফিলিসের সিম্পটম দেখা দিছে, শুইন্যা আমার ভাল লাগতেছে। একদিন আমি নিজের নাম ভুইল্যা যামু, আয়নায় নিজেরে দেইখ্যা সালাম দিমু, বইর প্রচ্ছদ দেইখ্যা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিজের নাম লেখুম।

হাসান চমকে ওঠে, বলে, তোমার ভালো চিকিৎসা দরকার।

সালেহ বলে, বড় কবিগো সিফিলিস হইতেই হয়, দোস্ত, সিফিলিস হইল বড় কবিগো রোগ, সিফিলিস হইল কবিতার গডেজ, তোমরা বড় কবি হইতে পারবা না, বদলেয়ারের সিফিলিস হইছিল, হেল্ডার্লিনের সিফিলিস হইছিল, নজরুলের সিফিলিস হইছিল, আমারও সিফিলিস হইছে।

হাসান বলে, না, সালেহ, সব বড়ো কবির সিফিলিস হয় নি; কালিদাস, দান্তে, চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, এলিয়টের সিফিলিস হয় নি; এবং হেসে বলে, আমারও সিফিলিস হয় নি; কবিতার সাথে সিফিলিসের কোনো সম্পর্ক নেই; তুমি চিকিৎসা করাও।

সালেহ বলে, চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা হয় না; আমার তরুণ কবি হিশাবে মইর‍্যা অমর হইতে ইচ্ছা হয়; তুমি আমারে লইয়া একটা কবিতা একটা প্রবন্ধ ল্যাইখ্যো, আমি অমর হমু।

সালেহ বছরখানেক ধ'রে আছে ফরিদা খানমের সাথে। ফরিদা দশটি বছর ও তিনটি দেশিবিদেশি বিয়ে কাটিয়ে এসেছে আমেরিকায়, প্রচণ্ড রূপসী ও প্রচণ্ড দানবী সে, ফিরে এসেই তার পরিচয় হয়েছে সালেহর সাথে, এবং উন্মুল উদ্বাস্তু অসহায় সালেহকে তুলেছে নিজের ফ্ল্যাটে। সালেহর কাতর কবিতার সে তীব্র অনুরাগী, বেশ কিছু অনুবাদ করেছে ইংরেজিতে এবং নিজেও লিখেছে একগুচ্ছ তীব্র কবিতা।

হাসান জিজ্ঞেস করে, ফরিদা কেমন আছে?

সালেহ বলে, ওই মধুর ডেঞ্জারাস ডাইনিটা আমারে মাইরা ফ্যালতেছে; ওই ডাইনিটার রূপসী আগুনে আমি জ্বইল্যা যাইতেছি; তয় আমি তারে ভালবাসি, সে আমারে ভালবাসে, আমার কবিতারে ভালবাসে।

হাসান জিজ্ঞেস করে, ভালোবেসে সে তোমাকে কীভাবে মেরে ফেলছে?

সালেহ বলে, সিফিলিসে আমি পাগল হইয়া যাইতেছি, কিন্তু দুই তিনবার ওই ডাইনিটার ক্ষিধা আমার মিটাইতে হয়, তার ক্ষিধার শ্যাষ নাই।

হাসান জিজ্ঞেস করে, তুমি পারো?

সালেহ বলে, পারি না, তয় পারতে হয়; অরাল, দোস অরাল, আসলটা ত বেশি পারি না।

হাসান জিজ্ঞেস করে, ফরিদা তোমার অসুখের কথা জানে না?

সালেহ বলে, খুবই জানে, সে-ই বলে যে বড় কবিগো সিফিলিস হইতে হয়, সেও সিফিলিস চায়, দিনরাইত বলে আমারে সিফিলিস দেও, আমিও সিফিলিসে মরতে চাই, সিফিলিস তার কাছে গোল্ডেন ডিজিজ।

হাসান সালেহর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে; আর সালেহ নিজের নখের দিকে স্মিত হেসে তাকিয়ে বলতে থাকে, সিফিলিস সিফিলিস, সবচেয়ে মধুর শব্দ, শ্রেষ্ঠ শব্দ শ্রেষ্ঠ ধ্বনিগুচ্ছ সি-ফি-লি-স সি-ফি-লি-স সি-ফি-লি-স ...

দু-দিন পরই ফরিদার সাথে একই রিকশায় যাচ্ছিলো, সালেহ, একটির পর একটি নিজের কবিতা আবৃত্তি করছিলো সে, ফরিদাকে বলছিলো জীবন তার কাছে এতো সুখের আর কখনো লাগে নি, আর তখনি একটি দ্রুত ছুটে আসা ট্রাক দেখে সে রিকশা থেকে ট্রাকের সামনে লাফিয়ে পড়ে। ফরিদা প্রথম বুঝতেই পারে নি কী ঘটেছে, তার রিকশা বেশ এগিয়ে যাওয়ার পর পেছনে হৈচৈ শুনে সে বুঝতে পারে সালেহ লাফিয়ে পড়েছে ট্রাকের সামনে।

হাসান সংবাদ পাওয়ার পর বুঝতে পারে না সালেহকে দেখতে যাবে কি যাবে না। কী হবে গিয়ে, যাকে দেখতে যাবো তার সাথে যদি দেখা না হয়? সালেহর সাথে তো আর কখনো দেখা হবে না, যদি তার সাথে কাফন প'রে কবরেও নেমে যাই, পাশাপাশি শুয়ে থাকি। সালেহর কথা ভাবতে ভাবতে হাসান একটা অ্যাড সংশোধন করে, একটি মেয়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কবি সালেহ, তার বন্ধু, মারা গেছে; তাতে হাসানের মুখে কোনো করুণ রেখা না দেখে মেয়েটি ভয় পায়। হঠাৎ হাসান উঠে দাঁড়ায়, কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে পড়ে; হাসপাতালে গিয়ে দেখে থ্যাৎলে প'ড়ে আছে কবি, যে পেরিয়ে যেতে চেয়েছিলো জীবনানন্দকে, এবং জীবনানন্দের মতোই লাফিয়ে পড়েছে কোনো এক নিস্তব্ধতা দেখে।

সালেহ, অমরতা কি তোমার এতো শিগগিরই দরকার ছিলো? সালেহর লাশের পাশে দাঁড়িয়ে সালেহর সাথে কথা বলতে থাকে হাসান।

সালেহ, তোমাকে নিয়ে একটি কবিতা একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে আমাকে? আমি কি পারবো? মনে হয় পারবো না, আমি পারবো না।

সালেহ, আমি যে শোকার্ত হ'তে পারছি না, দ্যাখো, এই মুহূর্তে শোকের বদলে আমার ভেতরে একটি প্রেমের কবিতার পংক্তি ঢুকে গেলো, পংক্তিটি ঘুরে ঘুরে উড়ছে, পংক্তিটিকে আমি কবিতা করবো।

সালেহ, এমন মুহূর্তে কেনো বুকে প্রেমের কবিতা আসে?

সালেহ, তুমি কি কবিতা আবৃত্তি করছো? আমাকে একটি কবিতা শোনাও।

সালেহ, তুমি কি ব্যঙ্গ করছো আমার বেঁচে থাকাকে, আমাদের বেঁচে থাকাকে?

সালেহ, সত্যিই আমি কষ্ট পাচ্ছি না; যদি তোমার মতো আমি থ্যাৎলে প'ড়ে থাকতাম আর তুমি দেখতে আসতে আমাকে, তাহলে তুমিও কষ্ট পেতে না। আমি কোনো ঘন্টাধ্বনি শুনছি না, মনে হচ্ছে না যে আমার ওপর ঝরছে কবরের মাটি।

আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে, দেশে গণতান্ত্রিক মুক্তসমাজ গ'ড়ে উঠবে, স্বাধীনতাটি নিয়ে আসবে সব দিকে মুক্তি, এমন একটি লঘু আশা সে পোষণ করেছিলো; আর অন্যরা যখন পথেঘাটে মেতে উঠেছিলো রাজনীতিক কবিতায় শ্লোগানে লঘু আশাবাদে, জনপ্রিয়তার ঘিনঘিনে পথে একে একে নেমে যাচ্ছিলো সবাই, তার থেকে সেও একেবারে দূরে থাকতে পারে নি, দু-একটি আশাবাদী কবিতা লিখেছিলো সেও, স্বপ্ন

দেখেছিলো প্রেমিকার লাল নখের মতো উজ্জ্বল দিন আসবে, ওসবের কথা মনে হ'লে খুব করুণ একটা হাসিতে তার ভেতরটা ছেয়ে যায়। নির্বোধ, নির্বোধ, হাসান তুমিও নির্বোধের মতো আশা পোষণ করেছিলে? অন্ধকার নেমে আসছে ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল ভ'রে। এতো রক্ত ঢালা হলো এই অন্ধকারের জন্যে? রক্ত কি চিরকাল ব্যর্থ হয় এভাবেই? কোথায় মুক্তি, কোথায় প্রাণভ'রে নিশ্বাস নেয়ার মতো বিশুদ্ধ বাতাস?

দিকে দিকে রক্তপিপাসু নিশ্বাসরোধকারী সংস্কৃতিহীন বর্বরগণ। এরা কবিতার কথা জানে না; কবিতা এদের কাছে তুচ্ছ, মানুষই এদের কাছে মূল্যহীন। কী ক'রে এদের ছুরিকার ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবে মানুষ? কবিতা? শিল্পকলা?

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে হাসানের, দেশে বায়ু নেই নিশ্বাস নেয়ার।

সর্বহারাদের কয়েকজন দেখা করেছে তার সাথে, তারা দেশকে আমূল বদলে দিয়ে, তার ছালবাকল তুলে ফেলে, মাংস কেটে ফেলে, হাড্ডি টেনে খুলে, প্রতিষ্ঠা করবে সর্বহারার একনায়কত্ব।

একজন বলে, আপনারে আমাগো পক্ষে থাকতে হইব, আপনারে সর্বহারাগো পক্ষে কবিতা লেখতে হইব, শ্লোগান দিতে হইব।

হাসান বলে, আমি তো পক্ষবিপক্ষের কবিতা লিখি না, শ্লোগান দিই না।

আরেকজন বলে, এইটা পক্ষ লওয়ার সময়, নিউট্রাল আপনে থাকতে পারবেন না, আমাগো পক্ষ না লইলে বুঝুম আপনে শ্রেণীশত্রুগো পক্ষে আছেন।

আরেকজন বলে, এই বছরই সর্বহারাগো একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হইব। আমাগো বন্দুক আছে, আমাগো সামনে শ্রেণীশত্রুরা দারাইতে পারব না।

হাসান বলে, আমি যে একটি মুক্তসমাজ চাই, যেখানে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা আছে, স্বপ্ন আছে, কারো একনায়কত্ব নেই।

একজন বলে, মুক্তসমাজ পুঁজিবাদী ইম্পিরিয়ালিস্টগো কথা। আমরা ক্ষমতায় আইসা মুক্তসমাজের কথা যারা কয় তাগো সাফ কইরা ফেলুম; কোটি দুই কমাইয়া ফেলতে হইব। একনায়কত্ব ছারা মানুষের কল্যাণ নাই।

হাসান বলে, আমার রক্ত পেলে কি দেশে সর্বহারার একনায়কত্ব আসবে, সব মানুষ ভাত পাবে, কাপড় পাবে? আমি কবিতা না লিখলে কি সবাই ঘর পাবে, ভাত পাবে, চিকিৎসা পাবে? তাহলে না হয় আমি কবিতা লেখা ছেড়েই দেবো।

তারা যাওয়ার সময় বলে, বিপ্লবের কথা মনে রাইখেন, ভাইব্যাচিন্তা কইর‍্যা কাম কইরেন, বাচতে চাইলে আমাগো পক্ষে থাইকেন।

তারা চ'লে যাওয়ার পর থেকেই হাসানের মনে হ'তে থাকে তার দিকে উদ্যত হয়ে আছে একরাশ রাইফেল; সে শ্রেণীশত্রু, সে মুক্তি চায়, স্বাধীনতা চায় ব্যক্তির। তাকে সাফ ক'রে ফেলাই ভালো। কিন্তু ওরা পারবে তো? পারবে তো সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে? দেশে এখন কতোগুলো সর্বহারার একনায়কত্বের দল রয়েছে? দশ, বিশ, পঁচিশ, তিরিশ? তারা একে অন্যকে সাফ করবে না তো? তার আগে তাকে সাফ ক'রে নেবে? তারা কি তার জন্যে একটা বুলেট খরচ করবে? সে কি এতো মূল্যবান? তাকে খুঁচিয়ে মারবে? তাকে খুঁচিয়ে মেরে কী লাভ? তার মূল্য না থাক,

তার হাত আর পা দুটির তো মূল্য আছে। সে-চারটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এই অ্যাড আর কবিতা লেখার পাপের শাস্তি হিশেবে তাকে তো খালটাল কাটার কাজে লাগানো যেতে পরে, বাঁধে মাটি ফেলার কাজে লাগানো যেতে পরে, গরুর রাখালের কাজ দেয়া যেতে পারে। সে কি ওই কাজের উপযুক্ত নয়? ভাবতে ভাবতে হাসানের হাসি পায়, ভয়টা কেটে যেতে থাকে, হঠাৎ একটি কবিতার পায়ের শব্দে সে চোখ বোজে।

কয়েক দিন পর আসে জাতীয় সাম্যবাদীদের কয়েকজন; দেশে বিপ্লবের, আমূল বদলে দেয়ার, সর্বগ্রাসী প্রেরণা দেখা দিয়েছে।

একজন বলে, আপনে জানেন দ্যাশ জুইর‍্যা শ্রেণীশত্রু খতম করন চলছে, দ্যাশে আমরা অবিলম্বে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

হাসান বলে, সেটা খুবই ভালো কাজ হবে; কিন্তু এভাবে খতম ক'রে কি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন?

আরেকজন বলে, বেশি দিন লাগব না, শিগ্রই আমরা দ্যাশে বিপ্লব ঘটাইতে যাইতেছি, সর্বহারার একনায়কত্ব অবিলম্বেই প্রতিষ্ঠিত হবে। আপনের উপর আমরা চোক রাখছি, সেইজন্যই দেখা করতে আসলাম।

হাসান জিজ্ঞেস করে, আমাকে কি আপনাদের শ্রেণীশত্রু মনে হয়?

একজন বলে, অইরকমই আমাগো মনে হয়; তয় আপনেরে সাবধান করতে আসলাম। বিপ্লবের পক্ষে কবিতা ল্যাখলে আপনের ভয় নাই।

হাসান বলে, আমি তো কারো পক্ষে কবিতা লিখি না।

একজন বলে, এখন থিকা ল্যাখতে হইব, নাইলে বাচন নাই।

তারা চ'লে যায়; হাসান একবার নিশ্বাস নিতে গিয়ে দেখে সে সহজে নিশ্বাস নিতে পারছে না।

নিশ্বাস নেয়া এবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। মানুষ পরিণত হলো কেঁচো, তেলাপোকা, পিঁপড়ে, গুবরেপোকায়; না কি আরো শোচনীয় কিছুতে? হাসান, তুমি আর মানুষ নও, স্বাধীন সন্তান নও তোমার জন্মভূমির; তুমি দাস, তোমার অধিকার নেই, ওরা চাইলে তুমি থাকবে, না চাইলে থাকবে না। গুজব চলছিলো বেশ কিছু দিন ধ'রেই দিন দিন সেই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাটি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছিলো, অবশেষে বাস্তবায়িত হলো : দেশে প্রতিষ্ঠিত হলো একদলপদ্ধতি– শাসনের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। প্রচণ্ড বজ্রের গর্জনের সাথে প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন গণতন্ত্র, যাতে জনগণ নয় একটি ব্যক্তিই সব, সে-ই রাষ্ট্র সে-ই সমাজ সে-ই দেশ, সে-ই বর্তমান সে-ই ভবিষ্যৎ; আর কারো কোনো অধিকার দরকার নেই, শুধু তার অধিকার থাকলেই চলবে, তার অধিকারই সকলের অধিকার; হাসান ভেবেছিলো প্রতিবাদ উঠবে চারদিকে, দেখলো প্রতিবাদ উঠছে না, বরং দলে দলে উল্লাসে লোকজন যোগ দিতে শুরু করেছে একদলে– শুরু হয়ে গেছে পতনের শোচনীয় উৎসব; রাজনীতিক অধ্যাপক লেখক শ্রমিক সাংবাদিক আমলা দোকানদার দলে দলে মালার বোঝা মাথায় ক'রে গিয়ে যোগ দিচ্ছে একদলে,

বিশেষণের পর বিশেষণে সৃষ্টি ক'রে চলছে মহামানব মহানায়ক মহাকালের মহত্তম। হাসান দু-একজনের সাথে কথা বলতে গিয়েছিলো, দেখতে পায় তারা নিশ্চুপ প্রশান্ত থাকতেই পছন্দ করছে, আর যখনই কথা বলছে তখনই বিশেষণ তখনই অতিশয়োক্তি। কে বলেছে মানুষকে ধ্বংস করা সম্ভব, কিন্তু পরাজিত করা সম্ভব নয়? মানুষকে পরাজিত করা যেমন কঠিন তেমনি সহজ মানুষকে পরাজিত করা; ওটা নির্ভর করে সময়ের ওপর, যে-মানুষ এক সময় উদ্ধত অপরাজিত আকাশস্পর্শী, আরেক সময়ে সে পরাভূত মেরুদণ্ডহীন মস্তকছিন্ন পদতলচুম্বী। নিজেকে হাসানের একটা পাহীন পোকা মনে হয়; ইচ্ছে করে কোনো ছিদ্র খুঁজে তার ভেতরে লুকিয়ে পড়তে; তার মেরুদণ্ড নেই, মাথা নেই, পা নেই; শুধু সে পারে বুক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অন্ধকার গর্তে ঢুকে যেতে।

হায় জনগণ, আজ কে বলবে তোমরা একদিন বিদ্রোহ করেছিলে; কে বলবে তোমরা একদিন স্বাধীনতা চেয়েছিলে।

হায় জনগণ, কী সহজে তোমরা বিদ্রোহী থেকে পরিণত হও ক্রীতদাসে।

হায় জনগণ, যারা একদিন রক্ত দিতে ভয় পেতে না, তারা আজ চেটে খাচ্ছো পায়ের ধুলো; রক্ত তোমাদের আজ পুঁজে পরিণত।

হায়, জনগণ, হায় সিংহ, এতো সহজে পরিণত হও শুয়োরে।

হায় মহানায়ক, তুমি বুঝতে পারছো না আত্মহত্যা করেছো তুমি; তোমার জীবনে শুরু হলো ধারাবাহিক আত্মহত্যা।

হায় মহানায়ক, ইতিহাস থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছো তুমি।

হায় মহানায়ক, বুঝতে পারছো না তুমি এখন কী।

হায় মহানায়ক, তোমার পতনে আমি গভীর বেদনা বোধ করছি; তোমার এমন পতনের কথা ছিলো না।

কয়েক রাত ধ'রে ঘুমোতে পারছে না হাসান; নিশ্বাস বন্ধ, চারদিকে অন্ধকার, স্তব এবং স্তব এবং স্তব, বিশেষণ এবং বিশেষণ এবং বিশেষণ, অতিশয়োক্তি এবং আরো অতিশয়োক্তি এবং আরো অতিশয়োক্তি, মালা, দলে দলে গিয়ে একদল।

শ্যামলী ফোন করেছে, অনেক দিন তোমাকে দেখি না, কাছে পাই না, খুব শূন্য হয়ে আছি, আমি বেঁচে নেই।

শ্যামলীর কণ্ঠস্বরটাকে একটি ছোট্ট বালিকার স্বর মনে হয় হাসানের, অনেক দিন পর তাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে, মনে হয় ওই স্বর তাকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করছে, তাকে নিশ্বাস ফিরিয়ে দিচ্ছে।

হাসান বলে, আমিও তোমার অভাব খুব বোধ করছি, তুমি কি আসতে পারো?

শ্যামলী বলে, আসার জন্যেই তো পাগল হয়ে আছি, তুমি তো ডাকো না।

হাসান বলে, এসো, আমি অন্ধকারে আছি, আমাকে উদ্ধার করো, আলো জ্বালো, নিশ্বাস ফিরিয়ে দাও আমাকে।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করে, কেনো, কী হয়েছে?

হাসান বলে, তুমি কি দেশ জুড়ে একদলের অন্ধকার দেখতে পাচ্ছো না?

শ্যামলী বলে, চুপ, চুপ, কেউ শুনতে পাবে, তোমার বিপদ হবে।

হাসান বিছানা থেকে ওঠে না, গড়াতে থাকে, উঠতে তার ইচ্ছে করছে না; আজ সে অফিসে যাবে না, জানিয়ে দিলেই চলবে। অন্ধকার কাটানোর জন্যে শুয়ে শুয়ে সে নিজের নগ্নতা উপভোগ করতে থাকে; ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শ্যামলী এসে ঘণ্টা বাজালে সে নগ্নদেহেই গিয়ে দরোজা খুলে দেয়।

শ্যামলী তাকে দেখে মধুর চিৎকার ক'রে ওঠে, হায়, তুমি যে উস্থুর ন্যাংটা।

হাসান বলে, আমার ইচ্ছে হয় প্রত্যেক ভোরে তুমি আমাকে এভাবে দেখো।

শ্যামলী বলে, আর তুমিও আমাকে প্রতিভোরে এভাবে দেখতে চাও?

হাসান বলে, হুঁ, চাই; শুধু ভোরে নয়, দুপুরে, বিকেলেও, সন্ধ্যায়ও রাতেও।

শ্যামলী হেসে, হাসানের একটি প্রত্যঙ্গ ছুঁয়ে বলে, তোমাকে এভাবে দেখতে আমার ভালোই লাগছে, চমৎকার শরীর তোমার। একটু দাঁড়াও দেখি।

হাসান বলে, তোমাকে এভাবে দেখতেও আমার ভালো লাগবে; তোমার শরীরও চমৎকার।

শ্যামলী হেসে সুখে বলে, জানো তো আমি তোমার ছ-বছরের বড়ো?

হাসান বলে, কিন্তু তুমি এখনো বিশ বছরের মতো দেখতে, আমার সাথে তোমাকে বেশ মানায়।

শ্যামলী বলে, তুমি বোধহয় একটি বউ চাও।

হাসান বলে, তা জানি না, হয়তো চাই, হয়তো চাই না।

শ্যামলী বলে, আমাকে তুমি তোমার বউ হিশেবে চাও?

হাসান বলে, তাও জানি না, হয়তো চাই, হয়তো চাই না।

শ্যামলী বলে, তোমার বউ হ'তে পারলে বেশ হতো।

হাসান গড়াতে থাকে; দেখে অবাক হয় যে শ্যামলী তার পাশে বসছে না, খুঁজে খুঁজে পাউরুটি, ডিম, মাখন, জ্যাম বের করছে, টোস্টারে পাউরুটি সেঁকছে, মাখন লাগাচ্ছে, কেটলিতে পানি গরম ক'রে চা বানাচ্ছে।

শ্যামলী দূর থেকে চিৎকার ক'রে বলে, মুখ ধুয়ে নাও, শেভ ক'রে নাও, তোমার ব্রেকফাস্ট প্রায় তৈরি।

হাসান বলে, আজ মুখ ধুবো না, শেভ করবো না, আজ নতুন জীবন শুরু।

হাসান, তুমি এই চাও শ্যামলীর সাথে? এই জীবন তোমার কাছে অপূর্ব লাগে? এক নারীর হাতে ব্রেকফাস্টে, যে-নারী তোমার স্ত্রী? স্ত্রী কি অপূর্ব?

হাসান এটুকু ভাবতে না ভাবতে শ্যামলী ব্রেকফাস্ট এনে রাখে বিছানার পাশের ছোট্ট টেবিলে।

শ্যামলী হেসে, হাসানের মুখের কাছে তার টলটলে মুখটি এনে, বলে, মনে করো আমি তোমার বউ।

হাসান ব্রেকফাস্টে হাত লাগায় না, হাত লাগায় শ্যামলীর শরীরে; তাকে টেনে এনে চুমো খায়, বলে, আজ আমি মেল শভিনিস্ট পিগ, পুংগবী শুয়োর, আজ নারী,

আমার রমণী, আজ তুমিই আমার ব্রেকফাস্ট, তুমিই আমার মাখনমাখা পাউরুটি, তুমিই আমার কাঁচা ওমলেট।

শ্যামলী বলে, না, না, এখন নয়, আগে খেয়ে নাও।

হাসান বলে, না, আগে আমি বউ খাবো।

যখন তারা সুখকরভাবে ক্লান্ত হয়, বন্যার ধীর জলে ভেসে যাওয়া খড়ের ঘরের মতো সুন্দরী কাঠের কোশানৌকোর মতো কলাগাছের ভেলার মতো এদিক সেদিক ভাসতে থাকে, তখন দুপুর।

হাসান শ্যামলীর তলপেটে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলে, আমি চাই আজ এখানে একটি ভ্রূণ জন্ম নিক।

শ্যামলী অন্য জগত থেকে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করে, কী চাও, তুমি কী চাও?

হাসান বলে, আমি চাই এখানে একটি ভ্রূণ জন্ম নিক।

শ্যামলী বলে, না, না, আমি আর সন্তান চাই না।

হাসান বলে, আমি দেখতে চাই কীভাবে তোমার ভেতরে বেড়ে ওঠে তোমার আমার সন্তান।

শ্যামলী বলে, তোমার সন্তান তো আমি নিতে পারি না।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কেনো পারো না? আমার সন্তান কি চণ্ডাল?

শ্যামলী বলে, আমার হাজব্যান্ড আছে; তোমার আমার সন্তান হ'লে তা হবে অবৈধ, লোকে বলবে জারজ।

হাসান বলে, সন্তান হচ্ছে সন্তান, সন্তানের আবার বৈধ অবৈধ কি?

শ্যামলী বলে, বিয়ের বাইরে সন্তান অবৈধ।

হাসান বলে, ক্লান্তিকর অপ্রেমের বিয়ের সন্তান বৈধ, আর সুখকর সুন্দর প্রেমের সন্তান অবৈধ? এটা কী ক'রে হয়?

শ্যামলী বলে, হ্যাঁ, প্রেম সমাজে স্বীকৃত নয়, বিয়ে স্বীকৃত।

হাসান বলে, তাহলে চলো, আমরা বিয়ে করি; আজই করি।

শ্যামলী বলে, কী ক'রে করবো? আমি তো বিবাহিত, বিয়ে তো আমার একটা হয়েছে, আমার হাজব্যান্ড আছে।

হাসান বলে, তাহলে তাকে ছেড়ে দাও, তাকে তো তুমি ভালোবাসো না।

শ্যামলী বলে, হ্যাঁ, তাকে ভালোবাসি না; তবে তাকে ছেড়ে দিলে স্ক্যান্ডাল হবে, আমার ছেলেমেয়েদের জীবন কষ্টে ভ'রে যাবে, তারা আমাকে ঘেন্না করবে।

হাসান বলে, তাহলে সে তোমার স্বামী থাক, আর আমিও তোমাকে বিয়ে করি, আমিও স্বামী হই; তুমি দুজনের স্ত্রী হও।

হো হো ক'রে হেসে ওঠে শ্যামলী, তুমি কি পাগল হ'লে? মেয়েদের একসঙ্গে দুটি স্বামী থাকতে পারে না; মেয়েদের জরায়ু একজনের জন্যে।

হাসান বলে, আমরা শুরু করলেই থাকতে পারে।

শ্যামলী বলে, তুমি তো পাগলা আউলবাউল কবি ছিলে না, কিন্তু এখন তো তোমারও পাগলামো দেখা দিচ্ছে।

হাসান বলে, আমি তো তাকে বেশ ছাড়ই দিচ্ছি, তুমি কয়েক দিন তার সাথে থাকবে কয়েক দিন আমার সাথে থাকবে।

শ্যামলী বলে, আমার হাজব্যান্ড তাতে রাজি হবে কেনো? জেনেশুনে তার জমিতে সে অন্যকে চাষ করতে দেবে কেনো?

হাসান বলে, রাজি না হ'লে তাকে ছেড়ে দাও, তুমি তো তাকে ভালোবাসো না, তার সাথে শুতে তো তোমার ঘেন্না লাগে। জমি চিরকাল একজনের থাকে না।

শ্যামলী বলে, বিয়েতে ভালোবাসা লাগে না, গাড়িবাড়ি সন্তানেই চলে।

হাসান বলে, তাহলে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

কেঁদে ওঠে শ্যামলী, না, তোমাকে ছাড়তে আমাকে বোলো না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে ছাড়া আমি শূন্য হয়ে যাবো।

হাসান বলে, তাহলে আমিই শুধু শূন্য থাকবো?

শ্যামলী হাসানকে আদর করতে করতে বলে, মনে করো আমি তোমার বউ, তুমি আমাকে বউ ব'লেই ডেকো।

হাসান বলে, আর আমি তোমার?

শ্যামলী একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তারপর বলে, ঠিক আছে তোমাকে আমি আমার হাজব্যান্ডই মনে করবো, তুমি আমার হাজব্যান্ড।

হাসান বলে, বাইরে এ-পরিচয়টা তুমি দিতে পারবে?

শ্যামলী কেঁপে ওঠে, বাইরে এটা বলতে হবে কেনো? এ-পরিচয়টা শুধু তোমার আমার মধ্যে।

হাসান বলে, বিয়ে, স্বামী, স্ত্রী, সংসার এসব হাস্যকর আমার কাছে, কিন্তু আমি তোমাকে কাছেই চাই, সব সময় পেতে চাই।

শ্যামলী বলে, আমিও চাই, আমি যে কী করি।

হাসানের ওপর একটি চাপ এসেছে, কবিলেখকদের একটা জরুরি অবধারিত সভায় যেতে হবে, সেখানে একটা শক্তিমান ছোকরা লেখককবিদের জ্ঞান দেবে, বোঝাবে কেনো একদল করতে হলো, কেনো তাদের অবশ্যই ওই দলে যোগ দিতে হবে; হাসানকেও একদলে যোগ দিতে হবে। হাসান ওই পেশল মূর্খ ছোকরাকে চেনে, সে খুনটুন করতে দ্বিধা করে না, ছোকরা শিগ্রি মন্ত্রীটন্ত্রী হবে, মহানায়কের একান্ত পেশি সে, এবং খুবই শক্তিমান, তার আদেশ মেনে চলতে হবে কবিলেখকদের।

হাসান ফোন করে কবি কামর আবদিনকে, আপনি কি শহিদালি সাহেবের সভায় যাচ্ছেন?

কামর আবদিন তোতলাতে থাকেন, তিনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন. বলেন, আআমি বুবুঝতে পারছি না, কিকিন্তু না গিয়ে উউপায় নেই, আমি বেঁচে থাথাকতে চাই, শুনেছি না গিয়ে উউপায় নেই, আআমি বেঁচে থাকতে চাই, কককবিতা লিখতে চাই।

হাসান জিজ্ঞেস করে, আপনি কি একদলে যোগ দিচ্ছেন?

কামর বলেন, দলটল তো আমি বুঝি না, কিন্তু যোগ দিতে বললে যোগ তো দিতেই হবে; এটা প্রতিবাদ করার সময় নয়, বেঁচে থাকার সময়, কবিদের জীবনে একটা সময় আসে যখন বেঁচে থাকাই কবিতা।

হাসান বলে, একাত্তরেও তো আপনি বেঁচে ছিলেন।

কামর কাঁপতে কাঁপতে বলেন, আমি কবিতা লিখতে চাই, কবিতা লেখার জন্যে বেঁচে থাকা দরকার, আমি প্রেমের ভাষা জানি প্রতিবাদের ভাষা জানি না, আমি কবি, পলিটিশিয়ান নই, বীর নই, বিপ্লবী নই।

খুব সুখে আছে মনে হচ্ছে রাকিব সুলতান; হাসানকে সে ফোন করেছে, দোস্ত, শ্রদ্ধেয় শ্যাক শহিদালি সাব যে কবিল্যাখকগো ডাকছেন, চিঠি দিছেন, তুমি তার চিঠি পাইছো নি? তোমারে বাদ দেয় নাই তো?

হাসানের বলতে ইচ্ছে করে সে কোনো চিঠি পায় নি, পাওয়ার সে যোগ্য নয়, কিন্তু ভুল বাঙলায় ধমকের পর ধমকের ভাষায় লেখা চিঠিটি তার সামনে প'ড়ে আছে, এবং তাকে ধমকাচ্ছে।

সে বলে, পেয়েছি।

রাকিব জিজ্ঞেস করে, তুমি নিশ্চয়ই যাইবা?

হাসান বলে, আমি জানি না।

রাকিব বলে, কও কি, দোস্ত, তুমি জানো না? আমাগো যাইতেই হইবো, সব কবিল্যাখকরাই যাইবো, তোমারেও যাইতে হইবো। রাজাবাদশারা ডাকলে যাইতে হয়, কবিগো কাম ত তাগো বন্দনা করা।

হাসান বলে, হয়তো আমি যাবো না।

রাকিব বলে, কও কি দোস্ত? তোমারে যাইতেই হইবো, দ্যাশে, নতুন দিন আসছে, আমরা কবিরাও নতুন দিন রচনা করবো। কবিগো খালি কবিতা ল্যাখলে চলবো না, দ্যাশে নতুন সোসাইটিও ইস্টাবলিশ করতে হইবো। মহানায়কের প্রত্যেকটি কথা কবিগো মাইন্যা চলতে হইবো, তিনি ত সম্রাট।

হাসান বলে, তুমি যেয়ো।

আলাউদ্দিন রেহমান উদ্বিগ্ন হয়ে চ'লে এসেছে, বলছে, দোস্ত, তুমি নিশ্চয়ই শ্যাক শহিদালির চিঠি পাইছো?

হাসান বলে, হ্যাঁ, পেয়েছি।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, এখন কী করবা? দ্যাশে ত ফ্যাশিবাদ শুরু হইয়া গ্যাছে, তোমারে ত বাইচ্যা থাকতে হইবো।

হাসান বলে, আমি বেঁচে থাকতে চাই, কিন্তু ওই সভায় আমি যাচ্ছি না।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, কবিল্যাখকরা সবাই যাইতেছে, দুইচাইরজন মহানায়করে লইয়া পইদ্যও লেইখ্যা ফ্যালছে, আরও হাজার হাজার পইদ্য লিখবো; অরা কায়দে আজম কায়দে মিল্লাতরে বাবা বাবা ডাইক্যা পদ্য লেইখ্যা বাঙলা ভাষার পাছা ফাটাইছে। অরা আইউব খাঁর বুনিয়াদি গণতন্ত্র লইয়া পাগল হইছে, দাউদ আদ-মজি পাইছে; আইউব খাঁর দিকে চাইয়া ক্রীতদাসের মতন হাইস্যা প্রাইজ লইছে। তার

রেভোলেশন টেরেনে ওঠছে, আইজ আবার বিপ্লবের নাওয়ে ওঠবো। তুমি না গ্যালে বিপদে পড়বা, সময় ভাল মনে হইতেছে না, সব সলিউশন কইর‍্যা ফ্যালবো।

হাসান চুপ ক'রে থাকে; যদি সে বোবা হয়ে যেতে পারতো!

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, লও, বিয়ার খাইয়া আসি, বিয়ারই তোমারে বইল্যা দিবো তুমি বাচতে চাও না মরতে চাও।

হাসান ওই সভায় যায় না; কিন্তু রাতেই শুনতে পায় শহিদালি কবিলেখকদের ধমকে, দাঁড় করিয়ে, মহানায়কের নামে শ্লোগান দিয়ে, বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের একদলে যোগ দেয়া ছাড়া কোনো পথ নেই; কবিতা উপন্যাস নাটক কিছু না, এখন সবই হচ্ছে মহানায়ক, এবং একদল। যারা গিয়েছিলো, তারা সবাই একদলে যোগ দিয়ে এসেছে; অনেকে মঞ্চে উঠে একদল ও মহানায়কের জয়গানও গেয়ে এসেছে, বলেছে মহানায়কই দেশ, রাষ্ট্র, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, তিনিই মহাকাল।

শ্যামলী ফোন করেছে, হাসান, তোমাকে অনেক দিন দেখি না; তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে, শুতে ইচ্ছে করছে।

হাসান বলে, তুমি কিছু মনে কোরো না, আমার কাউকে দেখতে ইচ্ছে করছে না, আমার অন্ধ হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

শ্যামলী বলে, শুতেও ইচ্ছে করছে না?

হাসান বলে, আমার নপুংসক হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, হয়তো হয়ে গেছি।

শ্যামলী বলে, তা তুমি কখনো হবে না, হাসান, তোমার ওটি কেটে ফেলে দিলেও তুমি পুংসক থাকবে; তোমার একটা না, বারোটা।

হাসান বলে, তোমার এমন কেনো মনে হয়?

শ্যামলী বলে, আমি তোমাকে জানি ব'লে; তোমার বারোটা আছে, তোমার বারোটাই আমার ভালো লাগে।

হাসান বলে, আমি চাই একটিও না থাক।

শ্যামলী বলে, সত্যিই কি আমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে না?

হাসান বলে, মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

শ্যামলী বলে, আমি জানতে চেয়েছি আমাকে কি দেখতে ইচ্ছে করছে না?

হাসান বলে, মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করে, তোমারও একজন মা আছে?

হাসান বলে, তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেনো?

শ্যামলী বলে, তুমি তো কোনোদিন মাবাবার কথা বলো নি। আমার বুড়ো হাজব্যান্ডটাও মাবাবার কথা ব'লে কাইন্দা জারে জার হইয়া যায়, বারবার ডান হাতে বাঁ হাতে চোখ মোছে, তার কান্দন দেখে মনে হয় তার মা তারে দুই দিন আগে বিইয়েছে, কিন্তু তুমি তো কখনো বলো নি।

হাসান বলে, আমি তো তোমার হাজব্যান্ড নই।

শ্যামলী বলে, কেনো, আমি তো তোমাকে বলেছি তোমাকে আমি আমার হাজব্যান্ডই মনে করি।

হাসান বলে, তোমাকে ধন্যবাদ যে অন্তত তুমি ওটা মনে করো।

শ্যামলী বলে, সত্যিই বিশ্বাস করো তোমাকে আমি হাজব্যান্ডই মনে করি।

হাসান বলে, আমার খুব ভালো লাগে যে সারাদেশে শুধু আমারই একটি অবিবাহিত স্ত্রী আছে, যে অন্যের স্ত্রী কিন্তু আমাকে হাজব্যান্ড মনে করে।

শ্যামলী বলে, আমি নিজেকে সত্যিই তোমার স্ত্রী মনে করি।

হাসান বলে, সারাদেশে একমাত্র আমার স্ত্রীই অন্য পুরুষের সাথে ঘুমোয়, অন্য পুরুষের সন্তানের জননী হয়।

শ্যামলী বলে, আমার সমস্যা তো তুমি বোঝো।

হাসান বলে, তা বুঝি।

শ্যামলী বলে, তাহলে আমাকে এমন কষ্ট দাও কেনো?

হাসান বলে, আমি খুব খারাপ মানুষ ব'লে।

শ্যামলী বলে, আমার আসতে ইচ্ছে করছে, আমি কি আজ দুপুরে আসবো?

হাসান বলে, এসে কী হবে?

শ্যামলী বলে, হাজব্যান্ডকে কি আমার দেখতে ইচ্ছে করে না, তার সাথে শুতে ইচ্ছে করে না?

হাসান বলে, তারচেয়ে বরং আমিই আসি।

শ্যামলী আঁতকে উঠে বলে, না, না, ফরহাদ সাহেব এসে পড়লে বিশ্রী ঘটনা ঘটবে, জানো তো সে তোমাকে সহ্য করতে পারে না।

হাসান বলে, তাহলে তুমি এসে পড়ো, সারারাত আমার সাথে থাকবে।

শ্যামলী বলে, তুমি তো আমার সমস্যা জানো।

হাসান বলে, সমস্যা সহজেই সমাধান করা যায়।

শ্যামলী বলে, অতো সহজ নয় জীবন, খুবই জটিল।

হাসান বলে, আমি জটিল কবিতা আর সহজ সরল জীবন পছন্দ করি।

শ্যামলী বলে, জানো, গতকাল কী হয়েছে?

হাসান জিজ্ঞেস করে, কী?

শ্যামলী বলে, ফরহাদ সাহেব আমার ওপর উপগত হ'তে চেয়েছিলো।

হাসান বলে, তাহলে নিশ্চয়ই একটি জমজমাট রাত কাটিয়েছো।

শ্যামলী বলে, না, না, আমি রাজি হই নি; তাকে ঢুকতে দিই নি।

হাসান বলে, দিলেও পারতে, তার দাবি আছে, সে তোমার বিবাহিত হাজব্যান্ড, তার কাবিন আছে, ফেরেশতারা ওই ময়লা কাবিন হাতে সারারাত তোমাকে অভিশাপ দিয়েছে।

শ্যামলী বলে, আমি দিতে পারি না; আমি তোমার প্রতি ফেইথফুল থাকতে চাই, অনেস্ট থাকতে চাই।

হাসান বলে, তোমার সতীত্বে প্রাচীন দেবতারা মুগ্ধ হবেন, সতী হিশেবে তোমার নাম দ্যুলোকে ভূলোকে কীর্তিত হবে; স্বর্গলোকে তোমার নাম হবে সতী শ্যামলী, বিশশতকের একমাত্র সতী।

শ্যামলী বলে, আমার সমস্যা তুমি বুঝতে চাও না।

হাসান বলে, আমি মাকে দেখতে যেতে চাই।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করে, এখনি?

হাসান বলে, তা জানি না।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করে, মায়ের মুখ তোমার মনে আছে তো, তাকে চিনতে পারবে তো?

হাসান বলে, আমার মুখ মা নিশ্চয়ই চিনতে পারবে।

শ্যামলী বলে, আমার তা মনে হয় না।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কেনো?

শ্যামলী বলে, আমার মনে হচ্ছে এখন আমিই হয়তো তোমার মুখ চিনতে পারবো না।

হাসান মায়ের মুখটি মনে করতে চেষ্টা করে, কিছুতেই মনে করতে পারে না; মায়ের মুখটি দেখতে ইচ্ছে করলেই ঘুরেফিরে নানা মুখ আসতে থাকে, শ্যামলীর মুখ আসে, অ্যাডের কয়েকটি মডেলের মুখ আসে, অনেক আগে মরে-যাওয়া পাশের বাড়ির এক মহিলার মুখ মনে আসে, যে একবার তার গাছ থেকে বরই পাড়ার জন্যে তাকে 'চোরা দারোগার পো' ব'লে বকেছিলো; কিন্তু মায়ের মুখটি আসে না। মায়ের মুখটি কেমন? মায়ের মুখটি কেমন? মায়ের মুখটি কেমন? সে কল্পনা করার চেষ্টা করে মা তাকে ভাত বেড়ে দিচ্ছে, কিন্তু মায়ের মুখ আসে না; সে কল্পনা করে মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরছে, কিন্তু মায়ের মুখ সে দেখতে পায় না; সে কল্পনা করে ইস্কুল থেকে দেরি ক'রে ফিরছে সে, আর তার মা আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে আছে তাকে দেখবে ব'লে, কিন্তু সে মায়ের মুখটি দেখতে পায় না। আমার মায়ের মুখটি কেমন ছিলো? তার গালে কি কোনো দাগ ছিলো? মার কি জোড়া ভ্রূ ছিলো? মা হাসলে কি গালে টোল পড়তো? মার চোখ দুটি কি তাদের পুকুরের মতো ছিলো? মায়ের মুখে কি একটা অমোচনীয় বিষণ্ণতা ছিলো? কপালে একটা দুঃখের দাগ ছিলো? তাঁর ঠোঁট কি শুকনো ছিলো, যাতে কখনো চুম্বনের ছোঁয়া লাগে নি?

হাসান জিজ্ঞেস করে, শ্যামলী, তুমি কি বলতে পারো?

শ্যামলী জিজ্ঞেস করে, কী, বলো?

হাসান বলে, আমার মার মুখটি দেখতে কেমন?

শ্যামলী বলে, আমি তো তাকে দেখি নি।

হাসান জিজ্ঞেস করে, আমার মার চোখ কেমন?

শ্যামলী বলে, আমি তো তাকে দেখি নি।

হাসান জিজ্ঞেস করে, আমার মার ঠোঁট কেমন?

শ্যামলী বলে, আমি তো তাকে দেখি নি।

হাসান জিজ্ঞেস করে, আমার মার ভ্রূ কেমন?

শ্যামলী বলে, আমি তো তাকে দেখি নি।

হাসান বলে, তুমি দেখো নি কেনো? তুমি দেখো নি কেনো? দেখো নি কেনো?

কয়েক দিন পর চারজন শক্তিমান জিন্স্ ট্রাউজার পাজামা পাঞ্জাবি কৃষকশ্রমিক আসে হাসানের অফিসে; তাদের চেনে হাসান, তারাও ভালো ক'রেই চেনে হাসানকে। তারা অফিসে ঢোকার পর কলরবিত বর্ণাঢ্য অফিসটি প্রাচীন অরণ্যের মতো নীরব নিঝুম হয়ে ওঠে, বিবর্ণ হয়ে ওঠে; মনে হয় সবাই গঙ্গার তীরে পদ্মাসনে ব'সে সমাধিমগ্ন ধ্যান করতে শুরু করেছে, চঞ্চল বালিকাদের মতো মুখর বাচাল টেলিফোনগুলোও বটগাছের নিচে সমাধিমগ্ন, দেয়ালের রূপসী মডেলটি হঠাৎ হাসি বন্ধ ক'রে টানটান দেয়াল হয়ে গেছে।

একজন বলে, আপনে শ্রদ্ধেয় শ্যাক শহিদালি সাহেবের সভায় যান নাই।

হাসান বলে, হ্যাঁ, আমি সাধারণত নিমন্ত্রণে যাই না।

আরেকজন বলে, ওইটা নিমন্ত্রণ ছিল? বোঝতে পারেন নাই ওইটা অর্ডার?

হাসান বলে, না, আমি বুঝতে পারি নি।

একজন বলে, দলের অর্ডার অমান্য কইর‍্যা আপনে অপরাধ করছেন।

হাসান বলে, আদেশ আমার ভালো লাগে না।

আরেকজন বলে, বাচতে হইলে অক্ষরে অক্ষরে অর্ডার মানতে হইবো।

হাসান কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে, বাঁচা সম্ভবত আমার হবে না।

একজন বলে, বেশি সময় আমাগো নাই, একদলে যোগ দ্যাওনের ফর্ম আমরা লইয়া আসছি, একটা সাইন কইর‍্যা দ্যান সে আপনে একদলে যোগ দিলেন।

হাসান বলে, আমি তো রাজনীতি করি না, তাই আমার দলে যোগ দেয়ার তো কোনো দরকার নেই।

আরেকজন বলে, রাজনীতি আপনের করতে হইবো না, পলিটিক্স আমরাই করবো, আপনেগো কাম আমাগো সাপোর্ট করা, আমাগো নামে শ্লোগান দেওয়া।

হাসান বলে, আমি কী ক'রে স্বৈরাচারকে সমর্থন করি?

একজন বলে, সাবধান হইয়া কথা কইয়েন, এইটা স্বৈরাচার না, এইটা গণতন্ত্র এইটা সমাজতন্ত্র, দ্যাশের জইন্যে এইটা দরকার।

আরেকজন বলে, আপনের কোনো ফিউচার নাই মনে হইতেছে, এমন করলে খরচ হইয়া যাইবেন।

একজন বলে, আমাগো টাইম নাই, তরাতরি একটা সাইন দ্যান।

হাসান বলে, এখন সম্ভবত আমি সাইন দিতে পারবো না।

আরেকজন জিজ্ঞেস করে, কখন পারবেন?

হাসান বলে, একদিন নিশ্চয়ই পারবো, তখন আমি না করবো না, যেখানে সাইন দিতে বলবেন সেখানেই দেবো, তবে তখন হয়তো আমি থাকবো না।

তারা ওঠে, তার চেয়ারেটেবিলে লাথি মারে, বলে, মনে করেন আপনে নাই।

একটি কবিতা কয়েক দিন ধ'রে তার ভেতরে ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে হারিয়ে যাচ্ছে প্রজাপতির মতো, ফিরে আসছে ডানায় পরাগ মেখে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে; আজ তার ইচ্ছে করছে প্রজাপতিটি ধরতে কবিতাটি লিখে ফেলতে, নইলে হয়তো চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে; সন্ধ্যায় সে বসে কবিতাটি লিখে ফেলতে; অবাক হয় যে সে ঠিকমতো বলপেন ধরতে পারছে না। আমি কীভাবে ধরি বলপয়েন্ট, নিজেকে সে জিজ্ঞেস করে, কীভাবে ধরি? আজ ধরতে পারছি না কেনো? এতো দিন কি আমি বলপয়েন্ট ধ'রে লিখি নি? কলম ধরা কি ভুলে গেছি আমি? হাসান বলপয়েন্টের ঢাকনা খুলে পাশে রেখে বলপয়েন্ট ধরতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঠিকমতো ধরতে পারে না। আমি কি লেখার সময় ঢাকনাটা পেছনের দিকে লাগিয়ে নিই? তাতে সুবিধা হয়? পেছনের দিকে লাগিয়ে না নিলে কি আমি লিখতে পারি না? হাসান ঢাকনাটি তুলে বলপয়েন্টের পেছনে লাগিয়ে বলপয়েন্টটি ধরতে চেষ্টা করে; কিন্তু ঠিকমতো ধরতে পারে না। আমি প্রথম কীভাবে লিখতে শিখেছিলাম? একটি মাটির পেন্সিল, তার মনে পড়ে, একটি মাটির স্লেট, চারদিকে সোনালি কাঠের ঘের, তার মনে পড়ে; বাবা তাকে পেন্সিল ধরতে শিখিয়েছিলেন, বাবার হাত কাঁপছিলো, কিন্তু তার হাত কাঁপছিলো না। সে তো শুরুতেই ঠিকমতো পেন্সিল ধরেছিলো; আজ কেনো পারছে না? আচ্ছা, বলপয়েন্টটাকে যদি আমি মাটির পেন্সিল আর ডায়েরিটাকে স্লেট মনে করি, তাহলে কি ধরতে পারবো? গোড়া থেকে শুরু করবো আবার? হাসান পারে না, তার মনে হয় কলম সে আর ধরতে পারবে না; বলপয়েন্টটিকে তার অচেনা মনে হয়। এরকম কোনো বস্তু আমি আগে কখনো ধরি নি, ধরার অভ্যাস নেই আমার, হাসানের মনে হয়, আমি লেখনি ধরতে জানি না, আমার আদিম পূর্বপুরুষ যেমন এটা ধরতে জানতো না তার মতো আমিও এটা ধরতে জানি না। এটা ভেবে তার ভালো লাগে; হাসান তাকিয়ে থাকে বলপয়েন্টটার দিকে, বলপয়েন্টটিকে তার অচেনা থেকে অচেনাতর মনে হয়, বলপয়েন্টটি একটি লিকলিকে সরীসৃপ হয়ে তার আঙুলে জড়িয়ে যেতে থাকে, তার শরীর কেঁপে ওঠে, ঝাঁকুনি দিয়ে হাসান সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

আলাউদ্দিন রেহমান হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলে, দোস্ত, তুমি মাসখানেক ঢাকার বাইরে চুপচাপ বেড়াই আসো।

হাসান চুমুক দিতে দিতে বলে, কিন্তু তাতে কী হবে?

আলাউদ্দিন বলে, ক্লাইমেইট একটু সফ্‌ট্ হইবো এইর মইধ্যে।

হাসান বলে, আমার মনে হয় কিছুই কোমল হবে না, আমরা ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার দিকে যাচ্ছি।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, আমারও সেই রকমই মনে হইতাছে।

হাসান বলে, আমি দিকে দিকে রাইফেলের নল দেখতে পাচ্ছি, লেফরাইট লেফরাইট শুনতে পাচ্ছি।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, লও, আমিও তোমার লগে বেড়াই আসি।

হাসান কি মাকে দেখতে যাবে আলাউদ্দিনকে নিয়ে? কিন্তু মায়ের মুখই তো মনে পড়ছে না। যদি সে মাকে চিনতে না পারে? মা যদি তাকে চিনতে না পারে?

কোথায় যেতে পারি আমি? আমি কি পরিচিত প্রিয়দের মুখ দেখতে চাই? আমার পরিচিত কারা? প্রিয় কারা? আমার কি কোনো পরিচিত আছে, প্রিয় আছে? মায়ের মুখ দেখলে কি সুখী হবো? মায়ের মুখটি কেমন? আমার যেতে ইচ্ছে করছে এমন কোথাও যেখানে আমাকে কেউ চেনে না, আমি কাউকে চিনি না; সেটা যদি হতো কোনো প্রাচীন আদিম অরণ্য নির্জন দ্বীপ ধুধু চর, সুখী হতাম। সুখী? আমি কি সুখী হ'তে চাই? কোথায় পাবো প্রাচীন অরণ্য? কোথায় নির্জন দ্বীপ? ধুধু চর? কেমন হয় হাতিয়া? সন্দ্বীপ? মহেশখালি? পদ্মার চর? সেখানে কি নির্জনতা আছে? সেখানে কি মানুষহীনতা আছে? মানুষের মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে না; আমি দেখতে চাই পাহাড়, বন, কুঁড়েঘর, নদীর বিষণ্ন তীর, কাশবন, পালে পালে গাভীর মুখ, সবুজ ঘাসের প্রান্তর।

পদ্মার একটি চরে একটা উঁচু কুঁড়েঘরে যখন তারা সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি কাটাচ্ছিলো, এপাশে ওপাশে কাশবন দেখছিলো, হারিয়ে যাচ্ছিলো কাশফুলের শাদা মেঘের মধ্যে, কাশ ভেঙে চিবোচ্ছিলো, মোটা ভাত আর ইলিশের গনগনে ঝোল ডিম খেয়ে জিভের স্বাদ ফিরে পাচ্ছিলো, এক সন্ধ্যায় একটা ছোটো ডিঙ্গিতে দুই মাঝির সাথে ইলিশ ধরতে গিয়ে ইলিশের ধবধবে শাদা নাচ আর মৃত্যু দেখে সুখী ও কাতর হয়ে উঠছিলো, তখন তারা সংবাদটি পায়। তারা তখন সভ্যতা থেকে বহু দূরে, সভ্যতাকে তারা পায়ের ময়লার মতো ধুয়ে এসেছে; সংবাদ, অ্যাড, রাজনীতি থেকে দূরে থেকে সুস্থ হয়ে উঠছে, তখন সংবাদটি তারা পায়।

এক মাঝি তার ছোটো ট্রানজিস্টরে প্রথম সংবাদটি পায়।

মাঝি ছুটে এসে সংবাদ দেয়, ছার, দ্যাশে খুনাখুনি শুরু অইয়া গেছে, সবতেরে মাইর‍্যা ফ্যালাইছে, সবতেরে মাইর‍্যা ফ্যালাইছে।

হাসানের মাথার ভেতরে তীব্র অন্ধকারের ঝাঁকঝাঁক ছুরি ঢুকে যায়; সে নদী জুড়ে কলকল খলখল অন্ধকার বয়ে যেতে দেখে।

আলাউদ্দিন বলে, না, এইটা হইতে পারে না, এইটা সম্ভব না।

মাঝি বলে, না, ছার, হইছে, অন্যরা দ্যাশ দখল করছে।

আলাউদ্দিন বারবার ঘোষণা শোনে, আর বলে, না, এইটা হইতে পারে না, এইটা সম্ভব না।

হাসান অন্ধকারের কলকল খলখল শুনতে পায়, কলকল খলখল দেখতে পায়।

হাসান বলে, হয়তো অসম্ভবই ঘ'টে গেছে, কিছুই অসম্ভব নয়।

আলাউদ্দিন বলে, তাইলে এখন দ্যাশের কি হইবো?

হাসান বলে, আমি দেশ জুড়ে রক্তাক্ত অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি, বুট দেখতে পাচ্ছি, বুটের শব্দ পাচ্ছি, দশকজোড়া বুট।

আলাউদ্দিন আর মাঝিটি ভয় পায়; হাসান বলে, আমি একটু একা থাকতে চাই, নদীর পারে একা হাঁটতে চাই।

আলাউদ্দিন বলে, সাবধানে হাইটো।

হাসান হাঁটতে থাকে, যেনো সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু একটি বিশাল লাশ দেখতে পায়; লাশটি একবার নদী হয়ে ওঠে নদীটি একবার লাশ হয়ে ওঠে, চরটি একবার লাশ হয়ে ওঠে লাশটি একবার চর হয়ে ওঠে।

হাসান নদীকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, এরকম কি কথা ছিলো?

হাসান চরকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, এরকম কি কথা ছিলো?

নদী আর চর শুধু তার দিকে একটি বিশাল লাশ তুলে ধরে।

অনেক দিন কবিতা লেখি নি হাসান; তার ভেতর গুঞ্জন করে নি কোনো পংক্তি, কোনো চিত্রকল্প জ্ব'লে ওঠে নি স্থির বিদ্যুতের মতো, ঝিলিক দেয় নি কোনো নাচ; মগজটাকে তার মনে হচ্ছে ঝামাপাথর, যেখানে কোনো গুল্ম জন্মে না, যার ভেতর দিয়ে কোনো নদী বয় না, যার ভেতরে কোনো মেঘ নেই। কিন্তু কবিতা তো লিখতে হবে তাকে– আমাকে কবিতা লিখতে হবে, আমি কবিতা লেখার জন্যে দণ্ডিত, কবিতা লেখাই আমার দণ্ড, আমি যদি এই দণ্ডকে অস্বীকার করি তাহলে অস্বীকার করি নিজেকেই, নিজের জীবনকেই। সব কিছু অস্বীকার করতে পারি আমি, কিন্তু জীবনকে পারি না, তাই কবিতা লেখাকে অস্বীকার করতে পারি না, হয়তো জীবনকেও পারি অস্বীকার করতে, কিন্তু কবিতা লেখাকে পারি না– জানি আমি জানি এটা সিসিফাসের শ্রম, যে-পাথর গড়িয়ে প'ড়ে যাবে তাকে গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের শিখরে নেয়া; স্বেচ্ছায় আমি, আমার রক্তধারা, এই দণ্ডকে বেছে নিয়েছি, এই দণ্ডের প্রতি সৎ থাকতে হবে আমাকে। আমি জীবনের প্রতি সৎ থাকতে না পারি, জীবনকে আমি শুয়োরের খাদ্যে পরিণত করতে পারি, ঢেলে দিতে পারি নর্দমায়; কিন্তু সৎ থাকতে হবে আমার দণ্ডের প্রতি, কবিতার প্রতি, আর প্রতিটি পংক্তি, ধ্বনি, রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্পের প্রতি। কবিতার প্রতি সৎ থাকাই আমার সততা। মানুষের প্রতি মানুষের সৎ থাকা সম্ভব নয়, আমি হয়তো সৎ থাকতে পারি নি মানুষের প্রতি, আমি সৎ নই শ্যামলীর প্রতি, শ্যামলী সৎ নয় আমার প্রতি, অসততাই জীবনের দণ্ড; কিন্তু শিল্পের দণ্ড সততা, তার প্রতি আমাকে সৎ থাকতে হবে, আমাকে সৃষ্টি ক'রে যেতে হবে।

আমি কেনো সৃষ্টি করতে পারছি না? নিষ্ফলা সময় আমার এতো শীঘ্র এসে গেছে? এখনো তো কোনো অনশ্বর মুক্তো ফলাতে পারি নি, ভেতরে তো অনেক রোগ জন্মালো ময়লা ঢুকলো, কিন্তু সেগুলো ঘিরে তো সৃষ্টি হলো না সেই সৌন্দর্য, যা অক্ষয় হয়ে জ্বলজ্বল করবে ভবিষ্যতের অন্ধকার ভ'রে। আমি কি জীবন দ্বারা আক্রান্ত, জীবন দিয়ে পর্যুদস্ত? মাছি পোকা পশু বেড়াল মানুষের জীবন দিয়ে? ওটা আমি কাউকে বকশিশ দিয়ে দিতে পারি? শিল্পকলার প্রতিপক্ষ কি জীবন? তাই মনে হচ্ছে আমার– মাছির জীবন আছে, শিল্পকলা নেই; ওই কুকুরগণের জীবন আছে, শিল্পকলা নেই; আর

মানুষও সামান্যই দাম দেয় শিল্পকলাকে, তারা চায় ভাত, জল, বিছানা, সঙ্গমের পর সঙ্গম এবং আরো সঙ্গম। আমি, এই আমি, যখনই জীবনের জন্যে বেশি ব্যাকুল হয়েছি, দূরে স'রে গেছে শিল্পকলা; কিন্তু জীবন ছাড়া কার গর্ভে জন্ম নেবে শিল্পকলার ভ্রূণ, বাড়বে কার জরায়ুতে, প্রসবিত হবে কার যোনিদ্বার দিয়ে? এখন যে আমি সৃষ্টি করতে পারছি না, তার অর্থ কি এই নয় যে জীবন আমাকে আলোড়িত করছে না, জীবন আমাকে ক্ষুধার্ত করছে না? ক্ষুধা বোধ করছি না ব'লেই লিখতে পারছি না কবিতা? আমি চমৎকার ঘুম যাচ্ছি? আমার ঘুমের ক্ষুধা নেই? আমি নিয়মিত পান করছি? আমার পানের ক্ষুধা নেই? আমি মানুষের সঙ্গ পাচ্ছি? আমার সঙ্গলাভের ক্ষুধা নেই? আমি সুস্থ আছি? আমার সুস্থ হওয়ার ক্ষুধা নেই? আমি সঙ্গম করছি? আমার সঙ্গমের ক্ষুধা নেই? কিন্তু কয়েক মাস তো হলো আমি নারী ছুঁই নি ওষ্ঠ ছুঁই নি অভ্যন্তর ছুঁই নি? তবু আমার কেনো ক্ষুধা নেই? তাই কি আমার ভেতর কবিতা নেই?

ভোরে ঘুম ভেঙে হাসান বিছানায় গড়াচ্ছে, মনে মনে বলছে, আজ আটত্রিশ পূর্ণ হলো, কিন্তু কী করতে পেরেছি আমি?

আজ যদি মরে যাই, কী থাকবে? কটি পংক্তি, কটি চিত্রকল্প, কটি রূপক, কটি উপমা? কটি দীর্ঘশ্বাস? কটি চন্দ্রোদয়? কটি সূর্যাস্ত কটি কবিতা?

কিছুই থাকবে না। কিছুই ক'রে উঠতে পারি নি। ব্যর্থতা, শুধু ব্যর্থতা।

মাত্র চারটি কাব্য, দেড় শোর মতো কবিতা। ওগুলার কটি কবিতা?

একজন কবির পক্ষে লেখা সম্ভব কটি কবিতা? দশটি? একশোটি? পাঁচশো?

ব্যর্থতায় কাটিয়ে দিলাম একটি সম্পূর্ণ জীবন?

আমার জীবন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, আজ যদি ম'রে যাই, তাহলে এটাই আমার সম্পূর্ণ জীবন, যার অর্থ শূন্যতা।

কিন্তু আমি সত্যিই বেঁচে থাকতে চাই, কবিতা লিখতে চাই, আরো, আরো।

কিন্তু কবিতা কি আবার আসবে আমার কাছে?

হ'তে হবে সুচারুরূপে দণ্ডিত, বদমাশ? তাহলেই আসবে কবিতা?

কবিতা এখন বদমাশের জঘনেই আটকে থাকতে পছন্দ করে?

কখন আমি হবো বিশুদ্ধ দণ্ডিত, এবং কবি?

বারান্দায় কাজের মেয়েটি প'ড়ে গেছে, হয়তো ইচ্ছে ক'রেই হয়তো অনিচ্ছায়, এবং গোঙাচ্ছে, তার শব্দ শুনতে পায় হাসান। শব্দটি বেশ ভারিই হয়েছে, চমকে বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে সে; গিয়ে দেখে মেয়েটি বসার চেষ্টা করছে, গোঙাচ্ছে, এবং কাঁদছে। মেয়েটিকে কি সে ধ'রে তুলবে? না; মানুষের মাঝেমঝে পতন দরকার, পতন থেকে ওঠা দরকার। হাসানকে দেখে মেয়েটি ভালোভাবে বসার চেষ্টা করছে, পারছে না। মেয়েটি মাথা নিচু ক'রে কাঁদতে থাকে। মাথা নিচু ক'রে কাঁদা হাসান পছন্দ করে না; এভাবে যারা কাঁদে তারা কাঁদতে কাঁদতে জানায় যেনো তারা পুণ্যে পরিপূর্ণ, একটুও পাপ জানে না, পাপী শুধু অন্যরা, অন্যদের জন্যেই তাদের জীবনটা শেষ হয়ে গেলো।

হাসানের ইচ্ছে হয় বলে, গেট আউট, গেট আউট, এসব কান্দাকান্দি আমার ভালো লাগে না, বেরিয়ে যাও; তবে সে তা বলতে পারে না।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে তোমার?

মেয়েটি কোনো কথা বলে না; হাসান মেয়েটির মুখ দেখতে পায় না, কিন্তু সে বোঝে কাঁদছে মেয়েটি।

নিষ্পাপ, আহা নিষ্পাপ, পবিত্র মেরি– ঘেন্না লাগে হাসানের।

এই মেয়েটির কান্না কি গুরুত্বপূর্ণ তার কাছে? কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়; অজস্র মেয়ে কাঁদছে পৃথিবীতে, সে তাদের সবাইকে কান্না থেকে মুক্তি দিতে পারে না; যার কাঁদার সময় এসেছে, সে কাঁদুক; প্রত্যেককে নিজের জন্যে নিজেকেই কাঁদতে হয়। মেয়েটি কাঁদুক, এটা তার জীবন, সে-ই যাপন করুক।

হাসান বাথরুমে ঢুকে সকালের বিরক্তিকর ক্লান্তিকর কাজগুলো করে, মেয়েটির কান্নার কথা তার মনে থাকে না, বেরিয়ে খাবার খায়, জন্মদিন উপলক্ষে টেলিফোনে তিন চারটি শুভেচ্ছা গ্রহণ করে, নিজেকে পরিহাস করে বুড়ো আর ব্যর্থ হওয়ার জন্যে, বেরোনোর জন্যে প্রস্তুত হয়, কিন্তু মেয়েটি তখনও ব'সে আছে বারান্দায়; এবং কাঁদছেও। কান্নাটি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না, মেয়েটি যে যায় নি, সেটাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

হাসান জিজ্ঞেস করে, তুমি এখনো যাও নি?

মেয়েটি আবার কেঁদে ওঠে। হাসান কান্নার দর্শক, সে কান্নার অন্তর্ভুক্ত নয়, তার কাছে মেয়েটির কান্নাকে শিল্পিত ও অ্যাডসম্মত মনে হয় না।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে বলো।

মেয়েটি বলে, আমার মরতে হইবো, ভাইজান।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কেনো?

মেয়েটি বলে, আমার আর ইজ্জত নাই, আমার প্যাট হইছে।

হাসান বলে, পেটে জিনিশ ঢুকলে তো পেট হবেই। কিন্তু কাঁদছো কেনো, তাতে তো আনন্দ করার কথা। বাসায় গিয়ে লালপেড়ে শাড়ি পরে হাসো।

মেয়েটি বলে, আমার ত বিয়া অয় নাই।

হাসান বলে, পেট হ'তে বিয়ে লাগে না, জিনিশ ঢুকলেই পেট হয়।

মেয়েটি কেঁদে বলে, আমার জাইত গ্যাছে, ভাইজান।

হাসান জিজ্ঞেস করে, লোকটি কে?

মেয়েটি বলে, তা বোজতে পারি নাই, তিন চাইর খালুই ত করছে, খালুগো দুই পোলারাও করছে।

হাসানের প্রচণ্ড ঘেন্না লাগে; মেয়েটিকে কি সে লাথি মেরে বের ক'রে দেবে?

হাসান, ঘেন্নায় সে ভ'রে গেছে, জিজ্ঞেস করে, তখন তো খুব সুখ পেয়েছিলে, তখন তো কাঁদো নি।

মেয়েটি কথা বলে না; দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হাসান জিজ্ঞেস করে, বলো, সুখ পেয়েছিলে কি না?

মেয়েটি বলে, না, ভাইজান, পাই নাই।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কেনো পাও নি?

মেয়েটি বলে, আমারে টাইন্যা ফেইল্যা কি করছে আমি বোজতে পারি নাই, খালি কষ্ট পাইছি, ব্যাদনায় প্যাট ফাইট্যা পরছে।

মেয়েটিকে আর পীড়ন করতে ইচ্ছে করে না হাসানের। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি তাদের বলো নি?

মেয়েটি বলে, কইছি, তারা আমারে মাইর‍্যা খেদাই দিছে।

হাসান জিজ্ঞেস করে, এখন কী করবে?

মেয়েটি কেঁদে ওঠে, মরুম, ভাইজান।

হাসান জিজ্ঞেস করে, মরতে হবে কেনো?

মেয়েটি বলে, আমারে অহন কে জায়গা দিবো?

হাসান জিজ্ঞেস করে, তুমি কি পেটের জিনিশটা ফেলে দিতে চাও?

মেয়েটি বলে, হ, ভাইজান, তয় কই ট্যাকা পামু, কোনহানে গিয়া ফালামু?

হাসান বলে, একটি মানুষ আসবে, তাকে তুমি ফেলে দিতে চাও?

মেয়েটি বলে, অইটা ত মানুষ হইব না, ভাইজান, অইটা জাউরা হইব; অইটারে আমি কোনহানে গিয়া ফালামু?

হাসান কি নিজেই জানে কোথায় গিয়ে ফেলতে হয়? এটা না ফেললে মরতে হবে মেয়েটিকে? পেটের ভেতর এমন ভয়ঙ্কর বস্তু ঘনীভূত হয়? জন্ম নেয় সাপ? সে কি মেয়েটিকে বাঁচাবে? কীভাবে বাঁচাবে? ওর বাঁচার কী দরকার?

হাসান বলে, তুমি একটি কাজ করতে পারো।

মেয়েটি বলে, কি কাম, ভাইজান?

হাসান বলে, রেল ইস্টেশনে গিয়ে গাড়ির নিচে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো।

মেয়েটি বলে, ভাইজান, আমার বাইচ্যা থাকতে মন লয়।

হাসান বলে, তুমি কাল এসো, দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না।

হাসান দুপুরে অফিস থেকে বেরোয়; তার মনে পড়ে আজ তার জন্মদিন, সে বেরোচ্ছে একটি জন্মকে প্রতিহত করার জন্যে, তার বেশ ভালো লাগে, জন্মে জন্মে জন্মে জন্মে দুঃখে দুঃখে দুঃখে দুঃখে পৃথিবী ভ'রে গেছে, আর জন্মের দরকার নেই, নিজেকে তার বুদ্ধ মনে হয়, সে জন্মচক্র থেকে একটি আত্মার নির্বাণ লাভের উপায় খুঁজতে বেরিয়েছে, কোনো অরণ্যে নয় মহাশহরে, উপায় তাকে বের করতেই হবে, নির্বাণ, অন্তত একজনের মহানির্বাণ, যে আসে নি তার নির্বাণ, সমস্ত দুঃখ কামনা বাসনা ক্ষুধা তৃষ্ণাহীন অপাপবিদ্ধ নির্বাণ। জন্ম এমন কি মহান বাপার? জন্মই তো একমাত্র বিশুদ্ধ দুর্ঘটনা। মানুষ, করুণ মানুষ, দুর্ঘটনা ও দুঃখের সন্তান, তুমি কি জানো না সব কিছুর শ্রেষ্ঠ হচ্ছে জন্ম না নেয়া, কখনো ভ্রূণ না হওয়া, কিছুই না হওয়া; আর

দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ হচ্ছে জন্মের পরপরই ম'রে যাওয়া? রিকশা নিয়ে মগবাজার হাতিরপুল মোহাম্মদপুর গুলিস্থান আজিমপুর লালমাটিয়ার পথে পথে সে জন্ম প্রতিহত করার অ্যাড দেখতে পায়, এককেবার রিকশা থেকে নেমে পড়তে চায়, কিন্তু নেমে পড়তে পড়তে নামে না; অ্যাডগুলো সে মুগ্ধ হয়ে পড়তে থাকে, এমন অ্যাড সে কখনো লেখে নি, এমন উপকারী অ্যাড, নির্বাণলাভের অ্যাড, বুদ্ধের সক্রিয়তা দেখে সে মুগ্ধ হয়, শেষে সে একটি ক্লিনিকের সামনে নেমে পড়ে।

রিসিপশনিস্ট মেয়েটি তার দিকে গোলগোল চোখে তাকায়।

হাসান বলে, এখানে কি নির্বাণলাভের উপায় আছে?

মেয়েটি তার কথা বুঝতে পারে না, জিজ্ঞেস করে, কিসের উপায় আছে?

হাসান বলে, এমআর, এখানে কি এমআর করানো সম্ভব?

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, কবে করাইবেন? আইজই করাইতে চান?

হাসান বলে, না, আজ না।

মেয়েটি একটি ফর্ম বের ক'রে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, এইটা ফিলাপ কইর‍্যা দ্যান।

কী নাম লিখবে সে মেয়েটির? সে কি তার নাম জানে? কী নাম মেয়েটির? কী নাম মেয়েটির? সে মেয়েটির নাম মনে করতে পারে না; সে কি মেয়েটির নাম কখনো শুনেছে? কিন্তু একটা নাম তো লাগবে, নাম ছাড়া তো ফর্ম পূরণ হবে না; হাসান ধীরেধীরে লেখে– শ্যামলী ফরহাদ।

হাসান অবাক হয়, এ-নামটি অনেক দিন তার মনে পড়ে নি, এইমাত্র মনে পড়লো, এবং অবলীলায় লিখে ফেললো।

স্বামী? হাসান ধীরে ধীরে লেখে– মোহাম্মদ ফরহাদ আলি।

এটা কি শ্যামলীর হাজব্যান্ডের নাম? তার কি ঠিক মনে পড়ছে না, না কি সে ইচ্ছে ক'রেই ভুলে যাচ্ছে?

ফর্মটি পূরণ ক'রে সে রিসিপশনিস্টের হাতে দেয়।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, আপনের ওয়াইফ?

হাসান বলে, হ্যাঁ।

মেয়েটি ফর্মে একরাশ লেখা লেখে, শেষ হ'লে একটা অংশ ছিঁড়ে তার হাতে দিয়ে বলে, আইজ পাশশ ট্যাকা লাগবো, করনের দিন তিন হাজার ট্যাকা লাগবো।

হাসান পকেট থেকে বের ক'রে তার হাতে টাকাটা দেয়।

মেয়েটি বলে, পাচ দিন পর ডেট দিলাম, আপনের ওয়াইফের প্র্যাগনেন্সি রিপোর্ট লইয়া আসবেন।

পাঁচটি দিন খুব চমৎকার লাগতে থাকে হাসানের; দুটি শব্দ তার মাথার ভেতরে ঘুরে ঘুরে তাকে সুখে ভরিয়ে রাখে : বুদ্ধ, নির্বাণ। আমি বুদ্ধ, আমি নির্বাণদাতা; যে-জন্মে নি, তাকে নির্বাণের উপায় বের ক'রে দিচ্ছি আমি; তার কোনো দুঃখ থাকবে না,

তাকে ঘুরতে হবে না জীবনচক্রে, বন্দী হবে না, সে, বন্দী হবে না তার আত্মা, থাকবে চিরমুক্ত; তার নির্বাণের উপায় বের করেছি আমি, লোভ কামনা বাসনা তাকে পীড়িত করবে না, সে হবে নির্লোভ নিষ্কাম, তাকে জন্ম দিতে হচ্ছে না, তাকে দিচ্ছি আমি পরিনির্বাণ, জন্মের আগেই সে অর্জন করবে বুদ্ধত্ব, অর্জন করবে শূন্যতা; সে জানবে না ক্লান্তি জ্বর যন্ত্রণা, তাকে কোনো ব্যাধি দহন করবে না; চিরশান্তির শূন্যতায় সে থাকবে চিরপরিপূর্ণ। সে জন্ম নেবে না, সব কিছুর শ্রেষ্ঠ যা, সে তা অর্জন করবে। আমি কি এমন নির্বাণ লাভ করতে পারি, পেতে পারি চিরশূন্যতা, মহাশূন্যতা? পারি না? আমার জন্যে নির্বাণ নয়? অনির্বাণ? অনির্বাণ জন্মচক্র? দুঃখচক্র? সব কিছুর শ্রেষ্ঠ আমার জন্যে নয়? এমনকি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠও নয় আমার জন্যে?

পাঁচদিন পর সন্ধ্যায় সে কাজের মেয়েটিকে নিয়ে ক্লিনিকে উপস্থিত হয়।

ডাক্তার মেয়েটি বেশ স্বাস্থ্যবতী, তাকে দেখেই বিশ্বাস হয় সে পারবে, সে নির্বাণ দিতে পারবে; তার হাত টেনে বের ক'রে ফেলতে পারবে সব কিছু।

ডাক্তার মেয়েটি বলে, আপনে চিন্তা করবেন না, ওয়েটিংরুমে ওয়েট করেন, পাচ মিনিটের ব্যাপার।

নার্সটি বলে, আপনে বইস্যা থাকেন, আপনের ওয়াইফের হইয়া গেলেই আপনেরে ডাকুম।

ওরা মেয়েটিকে নিয়ে ও-টিতে ঢুকে যায়; হাসান ওয়েটিংরুমে ব'সে থাকে। বেরিয়ে পড়ি, হাসানের মনে হয়, বেরিয়ে পড়ি, প্রতিটি মিনিটকে আমার এক্কেকটি জন্ম মনে হচ্ছে, আমি জন্মচক্রে আটকে গেছি, আমি মুক্তি পাচ্ছি না, আমার নির্বাণ দরকার, বেরিয়ে পড়ি আমি।

পনেরো মিনিটে হাসান পনেরো হাজার পনেরো লক্ষ পনেরো কোটি জন্মচক্র অতিবাহিত করে; তারপরও তার জন্মচক্র থামে না।

নার্সটি দৌড়ে এসে বলে, হইয়া গ্যাছে, আপনের ওয়াইফের পাশে আসেন।

নির্বাণ, নির্বাণ। পনেরো মিনিটেই নির্বাণ লাভ হয়ে গেছে?

একটি ছোটো ঘরে হাসানকে নিয়ে যায় নার্স, দেখে মেয়েটি একটি বেডের ওপর শুয়ে থরথর ক'রে কাঁপছে, গোঙাচ্ছে।

নির্বাণ, নির্বাণ। নির্বাণদানের একটু যন্ত্রণা তো থাকবেই।

নার্স বলে, আমি যাই, আধঘণ্টার মইধ্যেই সব ঠিক হইয়া যাইবো। আপনে আপনের ওয়াইফের শরিলটা টিপ্পা দ্যান।

নির্বাণ, নির্বাণ। আমি কি নির্বাণ, পেতে পারি?

মেয়েটি গোঙাচ্ছে, থরথর ক'রে কাঁপছে, ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

সে কি কখনো কারো শরীর টিপেছে? সে কি টিপতে পারবে? তার হাতের ছোঁয়ায় মেয়েটি যদি লাফিয়ে ওঠে? মেয়েটির শরীরের ছোঁয়ায় তার হাত যদি বমি করতে শুরু করে? হাসান মেয়েটিকে টিপতে শুরু করে– বেশ মসৃণ মেয়েটি; তার পায়ের পাতা

থেকে শুরু ক'রে ওপর থেকে ওপরের দিকে টিপতে থাকে, মেয়েটির শরীর থেকে একটা থরথর কম্পন ঢুকতে থাকে তার চামড়ার ভেতরে; হাসান তার পা, উরু, বুক, মুখ, হাত, পিঠ, কাঁধ ধীরেধীরে টেপে, মেয়েটি আরো থরথর কাঁপতে থাকে।

কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটি বলে, আমারে জোরে জরাইয়া ধরেন।

জোরে ধরতে হবে মেয়েটিকে? হাসানের মনে পড়তে থাকে খালু, খালু, খালু; খালুর পোলারা। তারাও হয়তো জোরে ধ'রেই চিৎ করেছিলো তাকে, তারপর হয়তো একমিনিট দুই মিনিট। না কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা? রান্নাঘরে? বাথরুমে? বারান্দায়? বেডরুমে? মেয়েটি তখন চিৎকার ক'রে ওঠে নি কেনো? সুখ লাগছিলো? তীব্র সুখ? পরম সুখ? চরম সুখ? শীৎকারে চিৎকারে অন্য রকমে থরথর করছিলো সে? চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিলো? খালুদের, খালুদের পোলাদের সে জড়িয়ে ধরেছিলো? এখন তাকে জড়িয়ে ধরতে হবে হাসানকে? হাসানের ইচ্ছে হয় মেয়েটিকে ঠেলে ফেলে বেরিয়ে যেতে; কিন্তু সে পারে না, মেয়েটিকে জোরে জড়িয়ে ধ'রে ব'সে থাকে, তার হাত দুটি যেনো মাংসের নয়, জংধরা লোহার, ডাইনামোর মতো কাঁপছে মেয়েটি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মেয়েটি উঠে বসে; হাসানের ইচ্ছে হচ্ছিলো মেয়েটি অনন্তকাল ধ'রে কাঁপুক এভাবে, তার সমস্ত সুখ অনন্তকাল ধ'রে কাঁপাক তাকে; কিন্তু যন্ত্রণাও চিরস্থায়ী নয়। নির্বাণলাভের উপায়ের খুবই উন্নতি ঘটেছে– বুদ্ধ এটা খুবই পছন্দ করতেন; জন্মজন্মান্তর লাগে না, গরু মেষ কুকুর হয়ে জন্মাতে হয় না, এক জন্মেই পরিনির্বাণ। একটু পরেই মেয়েটি স্বাভাবিকভাবে হেঁটে বেরোয় ক্লিনিক থেকে।

হাসানের ইচ্ছে হয়, মেয়েটিকে নিয়ে সে বারে গিয়ে বিয়ার খায়, মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করে, জিজ্ঞেস করে তার এখনো কষ্ট হচ্ছে কি না, ইচ্ছে হয় তার সাথে কবিতা নিয়ে কথা বলে, মেয়েটিকে একটির পর একটি কবিতা শোনায়, বদলেয়রের কবিতা মেয়েটির কেমন লাগে জিজ্ঞেস করে; কিন্তু হাসান এসব করে না, সে মেয়েটির হাতে একটি একশো টাকার নোট দিয়ে বলে, তুমি যাও, কাল থেকে আর এসো না।

মেয়েটি একবার পথে ব'সে পড়ে; কোনো কথা বলে না।

হাসান হাঁটতে থাকে; বেশ লাগছে তার, সে একজনকে নির্বাণ দিয়েছে, কিন্তু তাকে হাঁটতে হবে নির্বাণলাভের জন্যে। সে নির্বাণের জন্যে হাঁটছে, তখন অনেক দিন পর একটি কবিতার পংক্তি স্বপ্নের মতো আসে তার কাছে, গাছপালার অন্ধকারের ভেতর দিয়ে জোনাকির মতো আসে চিত্রকল্পের গুচ্ছ। সে হেঁটে হেঁটে মনে মনে কবিতাটি লিখতে থাকে, তাকে কয়েক মাইল হাঁটতে হবে, সে দেখতে পায় তার হাঁটার সাথে সাথে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে শব্দ, বাক্য; পুরো কবিতাটিই লেখা হয়ে যাচ্ছে যেনো মাথার ভেতরে; এবং সে ভয় পেতে থাকে, মাথার ভেতরে লেখা এই কবিতা যখন কাগজে লিখবো, তখন এটি থাকবে তো, থাকবে তো? কবিতাটির সাথে খেলতে খেলতে সে হাঁটছে, তখন আকাশে অসংখ্য বজ্র বেজে উঠতে থাকে, বিদ্যুতে ফালাফালা হয়ে যেতে থাকে আকাশের অন্ধকার, এবং আকাশ ভেঙে গ'লে উপচে বৃষ্টি নামে। এটা কী মাস? আসাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র? বৃষ্টির কথা মনে হ'লেই মাসের বাঙলা

নামগুলো মনে পড়ে কেনো? অন্য সময় যে মনে পড়ে বিদেশি নামগুলো? পুরো শহর ভয় পেয়ে গেছে, সবাই ছুটছে, রিকশাগুলো চলছে ট্রাকের সাথে পাল্লা দিয়ে; হাসান হাঁটছে, কয়েক মিনিটেই থৈথৈ পথঘাট, বৃষ্টির কালো উজ্জ্বল আদরে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে সে, তার মনে হয় জ্যৈষ্ঠের জোয়ার এসেছে, শহরের পথেপথে ঢুকছে জোয়ারের জল, এখনই হয়তো সামনে লাফিয়ে উঠবে একটি বোয়াল। কবিতাটি ভিজছে তার মাথার ভেতরে, একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়লো তার সামনে, এবং অনেক দিন পর তার মনে পড়লো গাছের পাতার রঙ সবুজ। অনেক দিন আমি সবুজ দেখি নি, সে একগুচ্ছ পাতা কুড়িয়ে নিয়ে বুকপকেটে রাখলো, মনে মনে বললো, সবুজ, আমার বুকের ভেতর ঢোকো। সারা শহর বৃষ্টিতে অন্ধকার হয়ে গেছে, সারা জগত বৃষ্টিতে আলোকিত হয়ে গেছে; অপূর্ব অন্ধকার ঢুকছে তার মগজে অপূর্ব আলো ঢুকছে তার মাংসে, ভেতরে ঢুকছে বজ্র বিদ্যুৎ জল মেঘ। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে জলের ওপর দিয়ে ভিজে ভিজে একটি কবিতা মাথায় নিয়ে এগোতে থাকে হাসান; সে জামা খুলে ছুঁড়ে দেয় রাস্তায়, ইচ্ছে হয় জিন্সটিও খুলে ফেলতে, সম্পূর্ণ নৈসর্গিক হয়ে যেতে, একবার হাত রাখে বেল্টে, হাত সরিয়ে নেয়, সরাসরি বৃষ্টি এসে অজস্র আঙুলে আদর করতে থাকে তার শরীর, তার মনে হয় বৃষ্টি প্রবল হয়ে উঠেছে তার বেল্ট ছিঁড়েফেড়ে জিপ টেনে তার জিন্স খুলে ফেলার জন্যে, তার সর্বাঙ্গ ধুয়ে দেয়ার জন্যে; ধুয়ে যাচ্ছে তার ঊর্ধ্বাঙ্গের ময়লা, সজীব হয়ে উঠছে তার ত্বক, তার রক্তের ভেতরে বৃষ্টি, বৃষ্টি।

কয়েকটি দিনে হাসান একগুচ্ছকবিতা লিখে ওঠে; একটির পর একটি কবিতা আসতে থাকে, সে লেখে। এমন স্রোত অনেক দিন আসে নি; সে স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। হাসান অবাক হয় তার কবিতা অনেক সরল হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার প্রতিটি সরল পংক্তি ভ'রে আছে জটিল যন্ত্রণায়। আমি তো সরল পংক্তিতে সরল কবিতা লিখতে চাই, সুখ লিখতে চাই; কিন্তু আমি যন্ত্রণা লিখছি কেনো?

আমার উক্তি ও উপলব্ধির মধ্যে কি অভেদ ঘটছে না? তাই তো মনে হচ্ছে, সরল পংক্তিতে সরল সুখ আসছে না কেনো?

আমি সৎ হয়ে উঠতে চাই, আন্তরিক হ'তে চাই।

আমি কি সৎ হয়ে উঠছি, আন্তরিক হয়ে উঠছি? সততা সততা আন্তরিকতা আন্তরিকতা কবিতা কবিতা।

এখন থেকে আমার কবিতা হবে সততার কবিতা, আন্তরিকতার কবিতা।

আগে কি আমি ছিলাম না, সৎ, ছিলাম না আন্তরিক?

ছিলাম, কিন্তু দ্বিধা ছিলো, একটা দ্বিধা ছিলো, দ্বিধা ছিলো।

এখন আমি অনেক বেশি সৎ, অনেক বেশি আন্তরিক।

কিন্তু জীবনে কি আমি সৎ হ'তে পেরেছি, আন্তরিক হ'তে পেরেছি?

শ্যামলীর সাথে আমার সম্পর্ক কি সৎ, শ্যামলীর সাথে আমার সম্পর্ক কি আন্তরিক?

জীবন সততার স্থল নয়? আন্তরিকতার অঞ্চল নয়? জীবন শুধুই অসততা? অনান্তরিকতা?

জীবনে সৎ হ'লে বিপর্যয় ঘটে? তাই থাকতে হয় অসৎ?

শ্যামলীকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে, তার সাথে একটি দুপুরই তো আমার অনন্তকাল, সে-ই তো আমাকে জীবনের সম্পদ দিয়েছে, কিন্তু তার ডাকে আমি সাড়া দিচ্ছি না? কেনো? আমার ভেতর সাড়া জাগছে না কেনো? এক সময় তো আমি সাড়া দিতাম যেমন ঘাস সাড়া দেয় বৃষ্টির ছোঁয়ায়, নদী সাড়া দেয় জোয়ারে; আজ কি আমি ঘাস নই, নদী নই? শ্যামলীর সাথে কি আমি ছিন্ন হ'তে চাই? ছিন্ন হ'লে আমার কী থাকে? গুচ্ছগুচ্ছ কবিতা যে আমার ভেতরে জন্মেছে শ্যামলীর পায়ের শব্দে, জন্মেছে তার গালের আলোতে, সেগুলো কি ব্যথিত হবে না? আর আমার সেই আশ্চর্য ক্ষুধা, তার আশ্চর্য খাদ্য তো জুগিয়েছে সে-ই। তার থেকে ছিন্ন হ'লে কী থাকে আমার? থাকি আমি? কিন্তু সৎ যে আমাকে হ'তে হবে কবিতার প্রতি সৎ জীবনের প্রতি সৎ প্রেমের প্রতি সৎ।

কয়েক দিন ধ'রেই শ্যামলী একটি দুপুর চাচ্ছে, মাত্র একটি দুপুর।

হাসান বলছে, শুধু একটি দুপুর কেনো? সারাদিন নয় কেনো? সারারাত নয় কেনো? সারা বছর নয় কেনো? সারা জীবন নয় কেনো? সারা মৃত্যু নয় কেনো?

শ্যামলী বলছে, আমার সমস্যা তুমি জানো, তারপরও আমাকে বিব্রত করো। আমাকে বিব্রত ক'রে তুমি কী সুখ পাও?

হাসান বলছে তুমি তো মনে করো তুমি আমার স্ত্রী।

শ্যামলী বলছে, হ্যাঁ, তা তো মনে করিই।

হাসান বলছে, তাহলে তোমাকে সারাদিন, সারারাত, সারা জীবনের জন্যে ডাকবো না কেনো?

শ্যামলী বলছে, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো; আমি সত্যিই মনে করি আমি তোমার স্ত্রী তুমি আমার হাজব্যান্ড।

হাসান বলছে, আমি যে একটি স্ত্রীর জন্যে পাগল, তা নয়। হাজব্যান্ড হওয়ার জন্যে আমি যে ব্যগ্র, তাও নয়।

শ্যামলী বলছে, তাহলে তো সব ঠিক আছে, আমি তোমার আছি তুমি আমার আছো, কোনো সমস্যা নেই।

হাসান বলছে না, সব ঠিক নেই; আমার মনে হচ্ছে সব ঠিক নেই।

শ্যামলী বলছে, কেনো ঠিক থাকবে না? আমি তো তোমার প্রতি সৎ; তোমার প্রতি ফেইথফুল, আমি অনেস্ট।

হাসান বলছে, না, আমরা সৎ নই।

শ্যামলী বলছে, না, আমরা সৎ; আমরা দুজনেই সৎ।

হাসান বলছে, তাহলে আমরা সততা কাকে বলে জানি না।

শ্যামলী বলছে, দুপুরে আমি আসবো।

হাসান বলছে, আসার কোনো দরকার নেই।

শ্যামলী বলছে, তুমি থাকবে, তুমি না থাকলে আমি তোমার দরোজার সামনে কুকুরের মতো শুয়ে থাকবো।

হাসান বলছে, তা তুমি পারবে না।

দুপুরে কি হাসান থাকবে? থেকে কী হবে? এর চেয়ে অনেক ভালো অ্যাড ২০০০-এ গিয়ে স্পন্সরদের সাথে কথা বলা, অধস্তনদের পরামর্শ দেয়া, দু-একটি মাংসল মডেলের সাথে নিরর্থক দার্শনিক আলাপ করা। ওই মাংসল মেয়েগুলো দর্শন খুব পছন্দ করে; ওরা অবাক হয়, ওরাও মাংসে স্তনে ঠোঁটে ক্লান্ত; আত্মহত্যার দর্শন শুনতে ওদেরও ভালো লাগে। কিন্তু হাসান বেরোতে পারে না, বেরোনোর জন্যে পোশাকটোশাক প'রে আবার খুলে ফেলে; টেলিফোনে জানিয়ে দেয় দুপুরে সে আসবে না, আসবে সন্ধ্যায়।

দুপুরে শ্যামলী আসে; তারা এক সাথে খায় এবং ঘুমোয়। ঘুম শব্দটির অর্থ বদলে গেছে, অভিধানে একদিন নতুন অর্থটি মিলবে; প্রতিমুহূর্তে প্রতিটি রক্তকণিকার জেগে থাকার নাম হচ্ছে ঘুম। ঘুমের পর তাঁরা গড়াচ্ছে, শ্যামলীর একটি হাত প'ড়ে আছে হাসানের বুকের ওপর, হাসানের একটি পা প'ড়ে আছে শ্যামলীর দু-পায়ের ভেতরে।

শ্যামলী বলে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমার শরীর তোমার শরীরকে ভালোবাসে, আমার হৃদয় তোমার হৃদয়কে ভালোবাসে।

হাসান বলে, শরীর আর প্রেম আর হৃদয় আমাকে ক্লান্ত করছে।

শ্যামলী বলে, কেনো ক্লান্ত হবে? আমি কি সুখকর নই?

হাসান বলে, আমি সম্ভবত শরীর থেকে মুক্তি চাই প্রেম থেকে মুক্তি চাই।

শ্যামলী বলে, কিন্তু একটু আগে আমরা যে সুখে ছিলাম, তাতে তো মনে হয় না তুমি শরীর থেকে মুক্তি চাও প্রেম থেকে মুক্তি চাও।

হাসান বলে, শ্যামলী, আমি সৎ হ'তে চাই।

শ্যামলী বলে, তুমি তো সৎ আছোই, তোমার থেকে সৎ কে আছে?

হাসান বলে, আমার মনে হচ্ছে আমি সৎ নই।

শ্যামলী বলে, আমি জানি তুমি সৎ।

হাসান বলে, আমাদের সম্পর্ক সৎ নয়; আমরা পরস্পরের প্রতি সৎ নই।

শ্যামলী বলে, আমাদের সম্পর্ক সৎ, পরস্পরের প্রতি আমরা সৎ।

হাসান বলে, না, না, আমরা সৎ নই; পরস্পরের প্রতি আমরা সৎ নই।

হাসান একটি সিগারেট ধরায়, সিগারেটের ধুঁয়ো আটকে যেতে চায় তার গলায়, সিগারেট কি ছেড়ে দিতে হবে?– সে সিগারেটটি ছাইদানিতে চেপে রেখে টেলিফোন করতে শুরু করে, সিগারেট নেভে না।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করে, তুমি কাকে ফোন করছো?

হাসান বলে, মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন খান সাহেবকে।

শ্যামলী চমকে লাফিয়ে উঠে হাসানের হাত ধ'রে ফেলে, এবং বলে, না, না, তুমি এখন ফরহাদ সাহেবকে ফোন করতে পারো না, তুমি তাকে ফোন করতে পারো না, তুমি তাকে ফোন করো না।

হাসান বলে, আমি সৎ হ'তে চাই।

শ্যামলী হাসানের হাত থেকে রিসিভার টেনে নিতে চায়, পারে না, আবার চেষ্টা করে, পারে না; সে চিৎকার করে, তুমি তাকে ফোন কোরো না; একটা বড়ো বিপর্যয় ঘ'টে যাবে, তুমি তাকে ফোন কোরো না।

হাসান বলে, বিপর্যয়ের মধ্যেই তো আমরা আছি।

শ্যামলী বলে, না, তুমি ফোন করলে বিপর্যয় শুরু হবে, আমি ধ্বংস হয়ে যাবো, আমি শেষ হয়ে যাবো।

হাসান বলে, তুমি এতো ভয় পাচ্ছো কেনো? ভয়ের কিছু নেই, তার সাথে কথা ব'লে আমি সৎ হ'তে চাই; আমাদের সম্পর্ককে সৎ করতে চাই।

শ্যামলী বলে, তুমি জানো না, এতে আমার বিয়ে ভেঙে যাবে, আমার বিপদের শেষ থাকবে না।

হাসান বলে, অসৎ বিয়ের থেকে সৎ ভেঙে যাওয়া অনেক ভালো, শ্যামলী; এসো আমরা সৎ হই পরস্পরের প্রতি।

শ্যামলী বলে, আমি বিয়ে ভাঙতে চাই না, অসৎ হ'লেও আমি বিয়ে টিকিয়ে রাখতে চাই।

হাসান বলে, আমি অসততায় থাকতে চাই না, আমি ম'রে যাচ্ছি।

শ্যামলী কেঁদে ওঠে, চুলে মুখ ঢেকে নগ্ন সে মেঝেতে ব'সে পড়ে।

ওই দিকে কে যেনো টেলিফোন ধরেছে– কর্কশ কণ্ঠে হ্যালো, হ্যালো বলছে।

হাসান বলে, আমি হাসান রশিদ বলছি, আমি একটু মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন খানের সাথে কথা বলতে চাই।

শ্যামলী নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।

লোকটি বলে, বাস্টার্ড, তুই আমারে ফোন করছছ ক্যান?

হাসান বলে, আপনার সাথে আমার একটু কথা ছিলো।

ফরহাদ খান বলেন, তুই হারামজাদা আমার লাইফটারে হেল কইর্‌যা দিছ্ছ, বাস্টার্ড, আই সাফার্ড এ লট ফর ইউ।

হাঁটুর ওপর মাথা রেখে নগ্ন শ্যামলী নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।

হাসান বলে, আমি সৎ হ'তে চাই, তাই আপনাকে ফোন করেছি।

ফরহাদ খান বলেন, ইউ বাস্টার্ড, তুই চাছ সৎ হইতে; ইউ আর এ ডিজঅনেস্ট বাস্টার্ড, আই শ্যাল কিল ইউ।

হাসান বলে, আপনি জানেন আপনার স্ত্রী শ্যামলী আপনাকে ভালোবাসে না?

ফরহাদ হাসান বলেন, বাস্টার্ড, সেইটা তর লগে আমি আলাপ করুম ক্যান?

হাসান বলে, আপনি জানেন শ্যামলী আমাকে ভালোবাসে?

ফরহাদ খান বলেন, ইউ বাস্টার্ড, আই শ্যাল টিচ ইউ এ গুড লেসন।

শ্যামলী স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে; সে কিছু দেখছে না সে কিছু শুনছে না।

হাসান বলে, দশ বছর আগেই আমার উচিত ছিলো আপনার সাথে কথা বলা, কিন্তু তখন আমি সৎ ছিলাম না, এখন আমি সৎ হ'তে চাই।

ফরহাদ খান বলেন, তর সৎ হওয়া আমি তর পাছা দিয়ে ঢুকাই দিমু।

হাসান বলে, শ্যামলী আমার সাথেই থাকবে।

ফরহাদ খান বলেন, শ্যামলী আমার ওয়াইফ, সে তর লগে থাকবো ক্যানরে হারামজাদা?

ফরহাদ খান ফোন রেখে দেন; কিন্তু হাসান বলতে থাকে, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি সৎ হ'তে চাই, আমি সৎ হতে চাই; তাই আপনাকে ফোন করেছি, আপনাকে কষ্ট দিতে চাই নি।

শ্যামলী উঠে দাঁড়ায়, নিঃশব্দে কাপড় পরে।

হাসান বলে, এখন আমরা সৎ, আমাদের সম্পর্ক সৎ।

শ্যামলী বলে, তুমি একটা শয়তান।

হাসান বলে, আমি শয়তান ছিলাম, শ্যামলী, এখন আমি সৎ, দেবতাদের থেকেও সৎ। তুমি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে।

শ্যামলী বলে, তুমি আমার সংসারটা নষ্ট ক'রে দিলে।

হাসান বলে, তুমি এখানে থাকো, আমরা সৎভাবে ভালোবাসবো।

শ্যামলী বলে, তোমার সাথে আমি থাকতে পারি না, তোমার ভালোবাসা আমার লাগবে না।

হাসান জিজ্ঞেস করে কেনো?

শ্যামলী বলে, আমার সংসার আছে, ছেলেমেয়ে আছে।

হাসান বলে, আমরা আজ অসসতা থেকে মুক্ত হলাম। আমার ভালো লাগছে আমি আর অসৎ নই, আমি সৎ হ'তে পেরেছি।

শ্যামলী একদলা থুতু ছুঁড়ে দেয় হাসানের দিকে; হাসান বিস্মিত হয়।

শ্যামলী বলে, তোমার এই প্রাপ্য।

হাসান বলে, সততার জন্যে আমি যে-কোনো দণ্ড মেনে নিতে পারি, শ্যামলী; সততার জন্যে শাস্তি অবধারিত।

শ্যামলী একটি চায়ের কাপ তুলে ছুঁড়ে মারে হাসানের দিকে, লাগে না; কাপটি দেয়ালে লেগে চুরমার হয়ে যায়। শ্যামলী টেলিফোন সেটটি তুলে ছুঁড়ে মারে, শেল্ফ থেকে কয়েকটি কবিতার বই নিয়ে টেনে টেনে ছেঁড়ে, ঠেলে টেলিভিশনটি ফেলে দেয়, এবং ক্লান্ত হয়ে মেঝেতে ব'সে পড়ে।

হাসান বলে, এই ফরাশি কাপ আর টেলিভিশন ভাঙা কিছু নয়, আমরা এসবের থেকে আরো বড়ো কিছু ভাঙছি।

শ্যামলী উঠে হাসানের দিকে না তাকিয়ে ধীরেধীরে বের হয়ে যায়।

হাসান কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে; তার নিজেকে শূন্য লাগে না পূর্ণ লাগে না, সুখী লাগে না, অসুখী লাগে না, জীবিত মনে হয় না মৃত মনে হয় না।

আমি কি সত্যিই সৎ হলাম? না কি আরো অসৎ হয়ে উঠলাম আমি?

মানুষের পক্ষে কি সৎ হওয়া সম্ভব? সততা কাকে বলে?

মোহাম্মদ ফরহাদ খানকে আমাদের সম্পর্ক জানিয়ে দেয়া কি সততা?

তিনি কি জানতেন না আমাদের সম্পর্ক? তিনি জানতেন, কিন্তু কোনোদিন আমাকে জানতে দেন নি তিনি জানতেন। তিনি তাঁর ধরনে সৎ ছিলেন।

তাঁর সততা আর আমার সততা বিপরীত; আজ আমাদের বিপরীত সততার মধ্যে সংঘর্ষ ঘ'টে গেলো, ভেঙে পড়লো সব কিছু।

প্রত্যেককে তার নিজের ধরনের সততা নিয়ে বাঁচা উচিত? একজনের সততা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয় আরেকজনের সততার ওপর?

আমি অপরাধ করেছি? শ্যামলীর কাছে? ফরহাদ হোসেনের কাছে?

আমি কি অপরাধ করেছি আমার কাছে?

আমি কি সৎ হয়েছি? আমি কি সুখী হয়েছি? আমি কি শান্তি পাচ্ছি?

হাসান, এর পরও কি তুমি কবিতা লিখতে পারবে?

কবিতা আমাকে লিখতে হবে। সব ধ্বংস হয়ে গেলেও কবিতা লিখতে হবে; কবিতা লেখার জন্যে আমি দণ্ডিত।

সততার দণ্ডও তোমাকে পেতে হবে, হাসান।

গভীর রাতে হাসানের টেলিফোন বেজে ওঠে, হাসান ধ'রেই শোনে, এই শালা বাস্টার্ড, খানকির পো, তরে সাবধান কইর‍্যা দিতেছি, আমার ওয়াইফের লগে তুই মিশবি না; তর মার লগে গিয়া শো।

হাসান কিছু বলার আগেই ওপাশে একটি প্রচণ্ড চিৎকার ওঠে, মনে হয় লাথি মেরে ফরহাদ হোসেন শ্যামলীকে মেঝেতে বা খাটের কোনায় ফেলে দিয়েছেন।

হাসান বলে, আপনি শ্যামলীকে মারবেন না।

ফরহাদ খান বলেন, ওই খানকিরে আমি মারুম তর কি? পাইলে তরও হাড্ডি গুরা কইর‍্যা ফেলুম।

হাসান বলে, শ্যামলীকে দিন, আমি তার সাথে কথা বলবো।

ফরহাদ খান বলেন, তুই আর শ্যামলীর লগে মিশবি না। দুইটারেই খুন কইর‍্যা ফেলুম।

হাসান বলে, শ্যামলী চাইলে তাকে আমি নিয়ে আসবো, খুনকে ভয় করবো না।

ফরহাদ খান বলেন, ওই খানকি আর তর লগে মিশবো না।

হাসান ওই পাশে শ্যামলীর চিৎকার শুনতে পায়। ফরহাদ খান টেলিফোন রেখে দেন; হাসান বারবার ফোন করে, ফোন বাজে না।

কবিতা কি ছেড়ে যাচ্ছে তাকে? বেশ কয়েক মাস হাসান কবিতা লিখতে গিয়ে শুধুই কাটাকুটি করে, ভেতরে কিছুই রূপায়িত হয় না, সেগুলো বাস্তবায়িত করতে গেলে দেখে শুধুই জীর্ণতা; সে পাতার পর পাতা ছিঁড়ে ফেলতে থাকে, ছেঁড়ার শব্দটা বিস্ফোরণের মতো মনে হয়, যেনো সব কিছু কেঁপে উঠছে, শেষে ছিঁড়ে না ফেলে রেখে দেয়–এই আক্রান্ত পাতাগুলো আমার এ-সময়ের ইতিহাস আমার জীবনী; কবিতা লিখতে না পেরে বাঙলা কবিতার সীমাবদ্ধতা পদ্যতা গদ্যতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের খসড়া তৈরি করে সে, কিন্তু প্রবন্ধটি কখনো লিখে ওঠে না; তার ক্ষুধা জাগে এমন একটি বই পড়তে, যা সমাজ নয় জীবন নয় রাজনীতি নয় নৈতিকতা নয় দুঃখ নয় সুখ নয়, যা শুধুই সাহিত্য শুধুই শিল্পকলা; এমন একটি বইয়ের জন্যে সে বইয়ের দোকানে দোকানে যেতে থাকে, কোনো ভাষায়ই এমন কোনো বই নেই, যা বিশুদ্ধ এবং যা সে পড়তে পারে। ভাষার মধ্যেই কি রয়েছে কোনো অবিশুদ্ধতা, ভাষাই কি বিশুদ্ধতার বিরোধী? অনির্বচন নিঃশব্দতাই শুধু বিশুদ্ধ? বাস্তবায়ন অবিশুদ্ধ? সে কি পড়বে নিঃশব্দতাকে? না কি জীবনই অবিশুদ্ধ? জীবনের কোনো উপস্থাপনের পক্ষে বিশুদ্ধ হওয়া অসম্ভব? মুদ্রিত কিছুই পড়ার যোগ্য নয়, কিছুই বিশুদ্ধ নয়– সবই জীবনের রক্তে মাংসে পুঁজে ক্লেদে বোঝাই; তাকে এসব থেকে দূরে থাকতে হবে, সে এমন কিছু চায় যা বিশুদ্ধ শিল্পকলা। তার ইচ্ছে হয় বিশুদ্ধ গণিত পড়তে, কিন্তু হায়, গণিত তার জগতের বাইরে, সে ওই বিশুদ্ধতার বাইরে।

তার মনে দিনের পর দিন উড়তে ভাসতে কাঁপতে জ্বলতে থাকে ছেঁড়াছেঁড়া ভাবনা। এগুলো কী উড়ছে? কী ভাসছে? কী কাঁপছে? কী জ্বলছে? কী দেখা দিচ্ছে তার ভেতর থেকে? কখনো তার মনে হয় চমৎকার, কখনো মনে হয় দুঃস্বপ্নের উড়ন্ত এলোমেলো তন্তুজাল, যা আকাশ ভ'রে উড়ছে। তার ভেতরটা কি সুস্থ নেই? তার ভেতরে একটি ন্যাংটো পাগল মনের সুখে গান গাইছে? বাইরে তো সে বেশ আছে; প্রচুর অ্যাড সংগ্রহ ক'রে ফেলছে অ্যাড ২০০০-এর জন্যে, তার ফোনে এখন কাজ হয়, সে এখন দায়িত্বশীল প্রাজ্ঞ ব্যবস্থাপক, পরামর্শ দিচ্ছে সে বিজ্ঞের মতো; কিন্তু তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এ কী দুঃস্বপ্নগ্রস্ত অসহ্য ঝরনাধারা বিষাক্ত অমৃতস্রোত? না, সে আয়নায় নিজের সুখ চিনতে পারে, অচেনা মনে হয় না; আয়নায় নিজের মুখ দেখে সালাম দেয় না; না, তার মগজটি এলোমেলো হয়ে যায় নি; নিজের নাম তার মনে আছে, এমন কি পিতার নামটিও সে মনে করতে পারে। সে কি এগুলো লিখে ফেলবে? যখন কবিতা আসছে না, এগুলো কি তখনকার কবিতা? এগুলো লিখে ফেলা কি ঠিক হবে? বাঙলার কৃষকসমাজ কি এগুলো মেনে নেবে? কৃষকরা তো সব সময় পবিত্র জিনিশ চায়, মহৎ জিনিশ চায়, এগুলো তো তেমন পবিত্র নয় মহৎ নয়।

তার মনে যা আসে তাই একটি দুটি বাক্যে লিখে রাখতে শুরু করে সে।

এক সুন্দর পাগলামো তাকে পেয়ে বসে। টুকরো টুকরো বাক্য, ছেঁড়াছেঁড়া কথা তাকে না জানিয়েই ভেতর থেকে উঠে আসছে, না ভেবেই সে লিখে ফেলছে, প'ড়ে দেখছে না কী লিখছে। এগুলোর কী নাম দেয়া যায়? 'ছেঁড়াছেঁড়া দুঃস্বপ্ন'? 'শিল্পকলার

পরাদর্শন'? 'কবির মত্ত নন্দনতত্ত্ব'? 'হাসান রশিদের উন্মত্ততাসমগ্র'? কী নাম দেয়া যায়?

সে এগুলোর নাম দেয় 'স্বতঃস্ফূর্ত ঝরনাধারা'।

এগুলোর জন্যে একদিন সে নিন্দিত হবে নিশ্চয়ই; আদিগন্ত মূর্খ পিউবিক হেয়ার ড্রেসারগুলো– তিন অক্ষরের পিএইচডিগুলো একদিন বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখতে থাকবে হাসান রশিদ জীবনবিরোধী ছিলেন, কব্বি আব্বদ্দুল আল্লির মতো তিনি জীবনমুখি ছিলেন না; হাসান রশিদ তাই নিন্দারযোগ্য।

শিল্পকলা হচ্ছে রক্তমাংসের বিপরীত; রক্তমাংস অশুদ্ধ শিল্পকলা বিশুদ্ধ।

তারাই প্রকৃত শহিদ, মৃত্যুবরণ করে যারা শিল্পকলার জন্যে, তারাই শুধু সৎ কারণে শহিদ হয় এবং বুঝতে পারে কেনো শহিদ হলো; অন্য শহিদেরা বুঝতে পারে না তারা কেনো মৃত্যুকে বেছে নিলো।

যা রক্তমাংস থেকে যতো দূরবর্তী তা ততো বেশি শিল্পকলা।

রক্তমাংস ও শিল্পকলার সহাবস্থান অসম্ভব, শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা একসাথে থাকতে পারে না। শিল্পকলা শুদ্ধ, রক্তমাংস অশুদ্ধ।

মানুষের পক্ষে শিল্পসৃষ্টি অসম্ভব, মানুষ শিল্পকলার নামে সৃষ্টি করে ভিন্ন ধরনের রক্তমাংস।

রক্তমাংসের পর আবার রক্তমাংস হাস্যকর।

সঙ্গম ও শিল্পসৃষ্টি সম্পূর্ণ বিপরীত; সঙ্গম সৃষ্টি করে নশ্বরতা, শিল্পকলা সৃষ্টি করে অবিনশ্বরতা।

শিল্পীকে হ'তে হবে নপুংসক, মাংসের শত্রু।

জনগণ শিল্পকলার বিপরীত; জনগণ হচ্ছে মাংস, লিঙ্গ, ক্ষুধা।

জনগণ এক টুকরো বাসি মাংস চায়, 'অর্কেস্ট্রা' চায়না, 'অবসরের গান' চায় না; তাই 'অর্কেস্ট্রা' আর 'অবসরের গান' কবিতা বা শিল্পকলা।

মানুষের উৎপত্তি কদর্য ক্রীড়া থেকে, শিল্পকলার উৎপত্তি শুদ্ধতা থেকে।

সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে কাম, পবিত্র হচ্ছে কবিতা, যাতে কোনো রক্তমাংস নেই।

কাম কদর্য, শিল্পকলা শুদ্ধ।

লিঙ্গহীন পুরুষ আর লিঙ্গহীন নারী শিল্পকলার কাছাকাছি।

কবিকে হ'তে হবে ব্যাকরণবিদ, ব্যাকরণবিদ নয় ব'লে বাঙলার কবিরা কবি নয়, কবিয়াল।

উপন্যাস রক্তমাংস, তাই উপন্যাস শিল্পকলা নয়।

চিত্রকলা, চলচ্চিত্র শিল্পকলা নয়; ওগুলো জনগণ চোখ দিয়ে দেখে কামে লিপ্ত হয়, ওগুলোতে কোনো কল্পনা নেই।

সঙ্গীত স্থূলদের শিল্পকলা।

মানুষ আজো কোনো বিশুদ্ধ বই লিখতে পারে নি; কোনোদিন পারবে না, যেহেতু মানুষ রক্তমাংস, অর্থাৎ অশুদ্ধ।

এমন কয়েক শো উক্তি সে লেখে কয়েক মাসে।

স্বতঃস্ফূর্ত ঝরনাধারাও শুকিয়ে আসছে; তার ইচ্ছে হয় একটি বিশুদ্ধ উপন্যাস লিখতে– বিশুদ্ধ উপন্যাস, উপন্যাসের ইতিহাসে প্রথম ও শেষ বিশুদ্ধ উপন্যাস। বাঙলা উপন্যাস হচ্ছে শিশুদের জন্যে লেখা রূপকথা, পচা রক্ত পচা মাংসে ভরপুর; তাই এগুলো শিল্পকলা নয়; বঙ্কিম, শরৎ, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতি শিল্পকলা নয়, স্থূলতা। কিন্তু বিশুদ্ধ উপন্যাস কী হ'তে পারে? যে-উপন্যাস বাস্তবতা থেকে যতো দূরবর্তী সেটি ততো বিশুদ্ধ উপন্যাস? বাস্তবতা হচ্ছে অবিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধ উপন্যাসের কাজ বাস্তবতাকে ভেঙেচুরে নতুন শৈল্পিক বাস্তবতা সৃষ্টি করা, যা উঠে আসবে লেখকের মনোলোক থেকে। বিশুদ্ধ উপন্যাস দাঁড়িয়ে থাকবে কার ওপর? কাহিনীর ওপর নয়, চরিত্রের ওপর নয়, সমাজের ওপর নয়, নৈতিকতার ওপর নয়, সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষার ওপর নয়; বিশুদ্ধ উপন্যাস দাঁড়িয়ে থাকবে শুধু নিজের শিল্পশুদ্ধতার ওপর। বিশুদ্ধ উপন্যাস পাঠকের জন্যে নয়, লেখকের জন্যে। পাঠক আফিম চায়, বিশুদ্ধ উপন্যাস আফিমের বিপরীত। হাসান আবার কয়েকটি তথাকথিত প্রধান বাঙলা উপন্যাস পড়ে, হো হো ক'রে হাসে। তাঁরা বাস্তবতার পুজো করতে গিয়ে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন বাস্তবতাকে; কী ক'রে তাঁরা ভাঙবেন বাস্তবতাকে, যেখানে বাস্তবতা তাঁদের পিতার মতো দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের সামনে? পিতার সামনে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা, কাঁপছেন পাঠশালার ছাত্রের মতো। বিশুদ্ধ উপন্যাস হবে বাস্তবতার বিপরীত, কবিতারই ভিন্নরূপ। হাসান একটি বিশুদ্ধ উপন্যাস লেখা শুরু করে; প্রথম পঁচিশ পাতা জুড়ে সে যা লেখে তাতে কোনো চরিত্র নেই, কোনো ঘটনা নেই, সংলাপ নেই; কিন্তু তারপরই সে দেখে উপন্যাসে তার অগোচরে রক্তমাংস ঢুকে গেছে, উপন্যাস অশুদ্ধ হয়ে গেছে; সে পাতাগুলো ছিঁড়ে বাস্কেটে ফেলে দেয়; এবং আবার লেখা শুরু করে, একটা সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে জোয়ারের জল বয়ে চলছে, বৃষ্টি হচ্ছে, কয়েকটি কইমাছ গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে ঘাসের ওপর দিয়ে, একটি বালক ওই দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টির মধ্যে– এ-বর্ণনা লিখতে লিখতে সে দেখে দুশো পাতা, আর কয়েক মাস, পেরিয়ে গেছে সে। তখন কবিতা এসে কড়া নাড়ে; সে উপন্যাসের কথা ভুলে যায়, কবিতা লিখতে শুরু করে।

কবিতা এবং কাব্যগ্রন্থ, নিঃসঙ্গতা এবং আশ্চর্য সুখ ও অসুখের ভেতর দিয়ে কেটে যায় তার জীবনের দুটি বছর– অতিশয় দীর্ঘ, চল্লিশ হয়ে ওঠে হাসান। বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন, একলা, একলা, নিঃসঙ্গ, নিঃসঙ্গতম থাকতে হবে আমাকে; কেঁপে উঠলে চলবে না কোনো মানবিক কাতরতায়; কাম নয় প্রেম নয়, শুধু অপূর্ব অন্তরঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও কবিতা, আর তুচ্ছ জীবিকার মধ্যে অতিবাহিত হবো; কাউকে ডাকবো না, কারো জন্যে ভেতর থেকে ডাক উঠবে না, সাড়া দেবো না কারো ডাকে, ভেতর থেকে সাড়া জাগবে না, শুধু কবিতার ভেতর দিয়ে সৃষ্টি আর ধ্বংস ক'রে চলবো নিজেকে, শুধু সৃষ্টি আর ধ্বংসের শিল্পকলা– এ-বোধের ভেতর দিয়ে কাটিয়ে দেয় সে নিজেকে। তার কল্পলোকে, বাল্যকাল থেকেই, স্থির হয়ে আছে একটি বিশাল নিবিড় আকাশছোঁয়া বৃক্ষ,

হয়তো বট হয়তো তমাল হয়তো এমন বৃক্ষ যা সে কখনো দেখে নি শুধু সেটির স্বপ্ন দেখেছে, যার মূলে যার ছায়ায় চোখ বন্ধ ক'রে অন্ধ হয়ে নগ্ন লক্ষ লক্ষ বছর ব'সে থাকার সাধ জাগতো তার, এ দু-বছর কল্পনায় সে দিনের পর দিন রাতের পর রাত নগ্ন ব'সে থেকেছে সেই নিবিড় বৃক্ষের মূলে। অ্যাড ২০০০-এ সে কারো সাথে টেলিফোনে কথা বলেছে, বা কোনো তরুণ স্ক্রিপ্ট লেখককে পরামর্শ দিয়েছে, বারে কোনো বন্ধুর সাথে বিয়ার খেয়েছে আট দশ ক্যান, ফরাশি মদ খেয়েছে, তখনও তার মনে হয়েছে সে নগ্ন ব'সে আছে কোনো আকাশঢাকা বোধিবৃক্ষের মূলদেশে, তার কোনো চোখ নেই, অন্ধ সে, কিন্তু দেখছে সব কিছু। প্রচুর মাংসের মধ্যে থেকেছি আমি, আর রক্তমাংসের মধ্যে থাকবো না, মাংসে ঘেন্না ধ'রে গেছে, মাংস নোংরা, মাংস ক্লান্তিকর, মাংস গলিত, লালাক্ত– যখনই কোনো সুন্দর মাংসের অবয়ব তাকে ডেকেছে, মনে মনে সে আবৃত্তি করেছে এ-শ্লোক, দূরে থেকেছে মাংস থেকে। কিন্তু চল্লিশ পেরিয়ে একচল্লিশে পড়ার পর একটি অপূর্ব অবয়ব তাকে আলোড়িত ক'রে তোলে।

আলোড়ন, সমগ্র সমুদ্রের উদ্বেলন, সূর্যের ভেঙে ভেঙে পড়া।

এ-তরুণী কি আলোড়িত করছে আমাকে? হাসান নিজেকে জিজ্ঞেস করে।

না, আলোড়িত হচ্ছি না, আলোড়িত হওয়ার মতো শক্তি নেই আমার, তরুণী আমার রক্তের ভেতর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে যেন মেঘ আকাশে; যেমন আঠারো তলায় হঠাৎ ঢুকে পড়ে প্রজাপতি।

তরুণী ধীর বাতাস, বয়ে যাচ্ছে আমার ত্বকের ভেতর দিয়ে।

তরুণী ঝরনাধারার মতো ঝ'রে পড়ছে আমার নগ্ন দেহের ওপর।

তরুণী অনেকটা আমার জলবায়ু, নিশ্বাস নিতে পারছি সহজে।

প্রেম? আবার প্রেম? আবার সেই গরল? না, না, না।

অমৃত? আবার অমৃত? আবার সেই বিষকরবী? না, না, না।

আমি একচল্লিশ। আমি বয়স্ক। আমার থেকে একুশ বছর ছোটো।

ওই তরুণী? বিশ। আবার অমৃত? আবার গরল?

একটি বিজ্ঞাপনের মডেল হ'তে এসে তরুণীটি একদিন ঢুকে পড়ে তার কক্ষে, ভুলে নয়, খুব সচেতনভাবে, যেনো তার ভেতরে ঢোকার জন্যে। বহু দিন পর বাতাস বয়, পাথরে গজিয়ে ওঠে ঘাস; সে আর চোখ বন্ধ ক'রে অন্ধ হয়ে কোনো আদিম বৃক্ষের মূলে ব'সে থাকতে পারে না।

তরুণীটিকে বসতে বলতে না বলতেই ফোন বেজে ওঠে আলাউদ্দিনের; সে বলে, দোস্ত, খবর শোনছি না, জবর খবর?

হাসান বলে, না, কোনো জবর খবর তো শুনি নি।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, রাকিব সুলতাইনাটা বউরে ডিভোর্স করছে, আবার বিয়া করছে।

হাসান বলে, রহিমা বানু না হালিমা বানু নামের মেয়েটির জন্যে?

আলাউদ্দিন বলে, হ, দোস্ত, রাকিব নিজের কাগজে রহিমার বুক আর মাজার খিধার কবিতা ছাপাইয়া তারে কবি বানাইতে আছিল আর প্রেম করতে আছিল; গতকাইল তারা বিয়া কইর‍্যা ফালাইছে।

হাসান বলে, রাকিবের না পাঁচ ছটি ছেলেমেয়ে আছে?

আলাউদ্দিন বলে, হ, রাকিবের কামই ত বউর প্যাট বছর ভইর‍্যা ফুলাই রাখন, রহিমা বানুর প্যাটও তিনি চাইর মাস ধইর‍্যা ফোলছে, বছর বছর ফোলবো।

হাসান জিজ্ঞেস করে, রাকিবের স্ত্রীর কী অবস্থা এখন?

আলাউদ্দিন বলে, তার স্ত্রী পোলাপান লইয়া বাপের বাড়ি চইল্যা গ্যাছে, বহুত মারামারি হইছে।

হাসান বলে, মানুষ যে কেনো বিয়ে করে!

আলাউদ্দিন বলে, আমিও সেইটাই ভাবি, দোস্ত তুমিই ভাল আছো, বিয়াটিয়া করো নাই, তোমার প্রব্লেম নাই।

প্রব্লেম! কাকে বলে? হ্যাঁ, আমার প্রব্লেম নেই, আহা, প্রব্লেম।

হাসান বলে, তুমি তো বিয়ে ক'রে ভালো আছো।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, আমিও ভাল নাই।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কেনো?

আলাউদ্দিন বলে, আমার বউটার লগেও আমার ভাল চলতেছে না কয় বছর ধইর‍্যাই, সেইজন্যেই ত তিনি মাঝেমইধ্যে দিল্লি দার্জিলিং চইল্যা যান, ভাইগ্যা ভাল কবিতা ছাইর‍্যা ট্যাকা করছিলাম। আমি গার্মেন্টসের মাইয়াগুলি লইয়া থাকি, এইটাই আমি বেশি এনজয় করি। বউরে এনজয় করার আর কিছু নাই।

হাসান বলে, মানুষের পক্ষে সম্ভবত ভালো থাকা সম্ভব নয়।

আলাউদ্দিন বলে, মানুষ কোনো কালে ভাল আছিল না, আমিও ভাল নাই, আমিও ভাল থাকুম না।

হাসান জিজ্ঞেস করে, তুমিও কি ডিভোর্সে যাবে?

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, ডিভোর্সটা আমি করতে চাই না। পোলাপানগুলির অসুবিধা হইবো, আর আমার বউটা চাকরানির কামও পাইবো না, তিনি আবার এসি ছারা ঘুমাইতে পারেন না, এসি ছারা গাড়িতে উঠতে পারেন না। বউটারে চিৎ করতে আমার ভাল্লাগে না, তয় ডিভোর্সও করতে পারুম না।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কেনো পারবে না?

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, বউটা চাকরানির মতো রাস্তায় হাটবো, ব্যাজার হইয়া থাকবো, মাইনষে কইবো এইটা আলাউদ্দিনের বউ আছিলো, এইটা আমার ভাল্লাগবো না।

হাসান বলে, তুমি তোমার বউকে ভালোবাসো।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, ভালোবাসাটাসা কিছু না, তার প্যাট থিকা আমার পোলাপানগুলি বাইর হইছে, ত, এইটা আর কি।

হাসান টেলিফোন রেখে দিলে তরুণীটি হেসে বলে, আমি খুব চমৎকার সময়ে এসেছি আপনার সাথে দেখা করতে।

হাসান বলে, হ্যাঁ, খুবই চমৎকার সময়; যখন ভূমিকম্প হচ্ছে তখন দরোজায় প্রিয় কলিংবেলের শব্দের মতো।

তরুণী বলে, আমার নাম মেঘা, আমি মাঝেমাঝে মডেলিং করি।

হাসান বলে, চুল আর মুখ আর ঠোঁট দেখেই বুঝেছি।

মেঘা বলে, আজ এসেছি আপনার সাথে দেখা করতে, আপনার কবিতা আমার ভালো লাগে, আপনাকেও ভালো লাগছে।

হাসান বলে, অনুরাগিণীদের থেকে আমি আজকাল দূরে থাকি, অনুরাগে আমি ভয় পাই; চুল আর মুখ আর ঠোঁট থেকে আমি দূরে থাকতে চাই।

মেঘা বলে, আমাকে দেখে কি আপনার ভয় লাগছে?

হাসান বলে, কেমন লাগছে সেটা কি আমি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবো?

মেঘা বলে, আমি স্পষ্টভাবেই শুনতে চাই।

হাসান বলে, অনেক দিন পর আমার অন্য রকম অনুভূতি হচ্ছে।

মেঘা বলে, সেটা কী?

হাসান বলে, তোমাকে আমার জড়িয়ে ধ'রে চুমো খেতে ইচ্ছে করছে।

মেঘা বলে, এই আমি, আমাকে জড়িয়ে ধরুন, চুমো খান।

হাসান উঠে মেঘাকে জড়িয়ে ধরে, দীর্ঘ সময় ধ'রে চুমো খায়; মেঘাও জড়িয়ে ধরে হাসানকে, চুমো খায়।

হাসান বলে, মেঘা, তোমাকে আমি জড়িয়ে ধরেছি, চুমো খেয়েছি, কিন্তু আমি তোমার প্রেমে পড়ি নি, আর হয়তো আমি প্রেমে পড়বো না।

মেঘা বলে, আমি আপনার প্রেমে পড়েছি; চুমো খেতে খেতে আমি প্রেমে পড়েছি, আমি গ'লে গেছি, আমি এমন স্বপ্নেই ছিলাম।

হাসান বলে, তোমার জীবনে আজ বিপর্যয়ের সূত্রপাত হলো; তোমার জীবন আর আগের মতো থাকবে না।

মেঘা বলে, বিপর্যয় কেনো?

হাসান বলে, আমাকে নিয়ে তুমি সুখ পাবে না।

মেঘা বলে, তা কেউ জানে না।

হাসান জিজ্ঞেস করে, তোমার বয়স কতো?

মেঘা বলে, বিশ।

হাসান বলে, আমার একচল্লিশ।

মেঘা বলে, আমার থেকে আপনি একুশ বছরের ছোটো, এটাই আমার পছন্দ।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কেনো?

মেঘা বলে, কোলে নিতে পারবো, আবার পায়ের নিচে বসতে পারবো; পিতা বলতে পারবো আবার পুত্র বলতে পারবো।

হাসান বলে, একটি নারীর সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো, দশ বছর ধ'রে।

মেঘা বলে, তাতে কিছু আসে যায় না।

হাসান বলে, তুমি নিশ্চয়ই এমন একটি পুরুষ চাও, যার কামের অভিজ্ঞতা নেই, যে সচ্চরিত্র, তুমিই যার প্রথম নারী। একদিন সে হবে তোমার পবিত্র কাবিনে সইকরা কবুল কবুল হাজব্যান্ড, যে তোমার জন্যে শাড়ি কিনে আনবে, ধনেপাতা আর কইমাছ কিনে আনবে।

মেঘা বলে, কী ক'রে জানলেন আমি অমন পুরুষ চাই, ধনেপাতা আর কইমাছ চাই?

হাসান বলে, এটাই তো চায় মেয়েরা; তাদের শরীর এই চায়।

মেঘা হেসে বলে, অভিজ্ঞতাহীন পুরুষ এখন পাওয়া যায়? শুনেছি নপুংসকেরাই শুধু অনভিজ্ঞ; আর হাজব্যান্ড নিয়ে আমি ভাবি না।

হাসান বলে, কয়েক দিন পরই ভাবতে শুরু করবে– হাজব্যান্ড, হাজব্যান্ড– এটার বাঙলাটা যেনো কী?

মেঘা বলে, এটা আপনার ভুল ধারণা; হাজব্যান্ড আর স্বামী একটাকে নিয়েও আমি ভাবি না।

হাসান বলে, আমাদের পতিতারাও খদ্দেরকে ওপরে চড়িয়ে মনে করতে থাকে ভদ্রলোকটি তার হাজব্যান্ড;– সে সতী, সে পবিত্র ধর্মকর্ম করছে।

মেঘা বলে, আমি পতিতা নই, সতীও হ'তে চাই না।

হাসান জিজ্ঞেস করে, তোমার কি অভিজ্ঞতা আছে?

মেঘা বলে, একটু আগে অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমার ভালো লেগেছে।

হাসান জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আরো অভিজ্ঞতা চাও?

মেঘা বলে, আপনার সাথে যে-কোনো অভিজ্ঞতায়ই আমি সুখ পাবো, আপনার সাথে সব অভিজ্ঞতার জন্যেই আমি এখন থেকে প্রস্তুত; আমার মন আমার শরীর প্রস্তুত, সব অভিজ্ঞতা আমার ভালো লাগবে।

হাসান জিজ্ঞেস করে, এখনই যদি আমি তোমাকে আমার শয্যাকক্ষে নিয়ে যেতে চাই, তুমি যাবে?

মেঘা হাসানের মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলে, যাবো।

হাসান একটি কবিতার বই বের ক'রে উপহার দেয় মেঘাকে– 'মেঘাকে, ভালোবাসা নয়, বিপর্যয়, দুর্ঘটনা, অপার অভিজ্ঞতা'।

মেঘা বলে, এটা আমার পাওয়া মধুরতম উপহার, চিরকাল থাকবে।

হাসান বলে, চিরকাল ব'লে কিছু নেই, চিরকাল ভুল ধারণা।

মেঘা বলে, আছে, আমি জানি আছে।

হাসান বলে, আজ থেকে আমাদের দুর্ঘটনার সূচনা হলো।

মেঘা বলে, আমাদের দুর্ঘটনা যেনো দীর্ঘ হয়।

হাসান বলে, আমি এক দশক দুর্ঘটনায় ছিলাম, হয়তো আরেক দশক দুর্ঘটনায় থাকবো, তারপর হয়তো আমি থাকবো না।

মেঘা বলে, আমাদের বাসার সবাই আপনার অনুরাগী, আমার ভাইবোনেরা, এমনকি আব্বাও। বিকেলে আপনি আমাদের বাসায় আসবেন, আমার নিমন্ত্রণ।

একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অংশ নেয়ার জন্যে তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে কেউ, বলছে তুমি লাফিয়ে পড়ো অগ্নিগিরিতে, গভীর গর্তে, সেখান থেকে তুমি আর উঠে আসতে পারবে না, এমন মনে হয় হাসানের। ভাইবোন, বাসা, আব্বা এসব হচ্ছে দাউদাউ আগুন; এসব থেকে সে দূরে আছে, অনেক দিন তার মনে পড়ে নি যে তার ভাইবোন আছে, একটি মা ও বাবা আছে– বাবাটির যেনো কী নাম?– মেঘার কথা শুনে তার তীব্র ভয় লাগে। এসব কি তার আছে? এসব তার থাকা দরকার? তার তো আছে শুধু শিল্পকলা। মা, বাবা, ভাইবোন তার কে? মা, বাবা, ভাইবোন শিল্পকলা নয়, তার কেউ নয়; সে তাদের কেউ নয়।

হাসান বলে, ভাইবোন, আব্বা, বাসা এসব শব্দের অর্থ আমি জানি না, মেঘা। এসব শব্দের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই; এগুলোকে আমার খুবই অচেনা মনে হয়, যেনো এই আমি প্রথম শুনলাম।

মেঘা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনার কি ভাইবোন, আম্মা, আব্বা নেই?

হাসান বলে, একটি নারীর কথা আমার মনে পড়ে, তাঁর মুখ আমি মনে করতে পারি না, তাঁর জরায়ুতে আমি বিকশিত হয়েছিলাম, তিনি প্রসব করেছিলেন আমাকে, তিনি আদর করতেন আমাকে, আমার জন্যে হয়তো তাঁর বুক ভেঙে আছে, তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করে, তাঁর মুখটি আমি মনে করতে পারি না।

মেঘা ভয় পেয়ে বলে, কী যে বলেন আপনি, কী যে বলেন।

হাসান জিজ্ঞেস করে, তুমি কি জানো তাঁর মুখটি কেমন?

মেঘা বিব্রত হয়, কিন্তু একটু সময় নিয়ে বলে, আমি জানি আপনার মায়ের মুখটি কেমন।

হাসান জিজ্ঞেস করে, আমার মায়ের মুখটি কেমন?

মেঘা বলে, তাঁর মুখটি দিঘির মতো, সারাক্ষণ টলমল করছে, যার চারপাশে অনেক গাছ, অনেক ছায়া, গভীর ছায়া, রাতে চাঁদের আলোতে ভ'রে যায়, যখন চাঁদ থাকে না তখন জোনাকি জ্বলে।

হাসান বলে, দিঘি কাকে বলে, গাছ কাকে বলে, ছায়া কাকে বলে, চাঁদের আলো কাকে বলে, জোনাকি কাকে বলে?

মেঘা বলে, এসবই আমি আপনাকে ধীরেধীরে চিনিয়ে দেবো।

হাসান বলে, এসব আমার চিনতে ইচ্ছে করে না।

মেঘা বলে, আপনাকে অবশ্যই চিনতে হবে এসব।

হাসান বলে, তুমি আর এসো না; এসব আমি চিনতে চাই না।

মেঘা বলে, তাহলে আমি আজ যাবো না, আপনার সাথে থাকবো, যাতে আর আসতে না হয়।

হাসান বলে, একটি নারীর সাথে আমি দশ বছর সঙ্গম করেছি, জানি না তাকে প্রেম বলে কি না।

মেঘা বলে, তাতে কিছু যায় আসে না।

হাসান জিজ্ঞেস করে, আমাকে তোমার নষ্ট মানুষ মনে হয় না?

মেঘা বলে, না; সৎ মানুষ মনে হয়।

হাসান বলে, আমি আর সঙ্গম করতে চাই না, আমি আর প্রেমে পড়তে চাই না; আমি নপুংসক হয়ে যেতে চাই, অপ্রেমিক হয়ে যেতে চাই। তিন বছর ধ'রে তাই আমি নারী থেকে, ঠোঁট থেকে, স্তন থেকে দূরে আছি; কবিতা ছাড়া আমার আর কিছু নেই।

মেঘা বলে, আপনি আমার থেকে দূরে থাকতে পারবেন না।

হাসান বলে, মেঘা, তুমি যাও, আর এসো না।

মেঘা বলে, আমি এসেছি।

হাসান বলে, মেঘা, আমি জানি তোমার অপূর্ব স্তন রয়েছে ঠোঁট রয়েছে নদী রয়েছে, কিন্তু আমি ওই অপূর্বদের কাছে যেতে পারবো না।

মেঘা বলে, আমি এসেছি, আমি অপূর্ব।

হাসান একটি সিগারেট ধরায়, টয়লেটে যায়, টয়লেটে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখটি দেখে; সে স্বস্তি পায় যে নিজের মুখটি সে চিনতে পারছে, মুখটিকে তার ভালো লাগছে, টয়লেটে ঢোকার আগে আর মনে হচ্ছিলো নিজের মুখ সে চিনতে পারবে না, কুৎসিত দেখাবে, সে চিনতে পারছে, মুখটিকে ভালো লাগছে; তার একটি শিশ্ন রয়েছে, সেটি সে ধ'রে দেখে, তারও প্রাণ রয়েছে। হাসানের বসতে ইচ্ছে করে; একটি চেয়ার থাকলে বেশ হতো, তার মনে হয়, জীবন থেকে সব ধরনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসার জন্যে টয়লেট শ্রেষ্ঠস্থান; সে কমোডের ওপর ব'সে এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলে সিগারেটে টান দিতে দিতে নিজেকে জিজ্ঞেস করে, হাসান, তুমি কি সত্যিই চাও এ-মেয়ে এ-বিশ বছর আর না আসুক? তুমি কি তার দীর্ঘ কালো চুল দেখতে চাও না? তুমি কি ওই মসৃণতায় ডুবে যেতে চাও না? তুমি কি তাকে জড়িয়ে ধ'রে চুমো খেতে চাও না? তুমি কি তার নিশ্বাসে সুস্থ হ'তে চাও না?

সে কি চিরকাল ব'সে থাকবে টয়লেটে? বেরোবে না? সে বেরিয়ে আসে।

মেঘা জিজ্ঞেস করে, টয়লেটে ব'সে কি আপনি কবিতা লেখেন?

হাসান বলে, হ্যাঁ, লিখি।

মেঘা জিজ্ঞেস করে, আজ কী কবিতা লিখলেন?

হাসান বলে, আমার পরিণামের কবিতা।

মেঘা বলে, আমি আজ যাচ্ছি, কিন্তু আমি এসেছি, আপনাকে দেখে মনে হয় আমার আসার জন্যে আপনি জন্মজন্ম ধ'রে অপেক্ষা করছিলেন, আপনি আমার অভাবে ছিলেন। আমি এসেছি, আপনার আর কোনো অভাব নেই।

হেসে বেরিয়ে যায় মেঘা; হাসানের মনে হয় জন্মজন্মান্তর ধ'রে সে শূন্যতার মধ্যে আছে, অতল অনন্ত অগাধ অন্ধকার শূন্যতার মধ্যে সে অনন্ত শূন্যতা হয়ে আছে। এটাই বেশ, সে এভাবেই থাকতে চায়; সে কোনো মানবিক পূর্ণতা চায় না, শুধু চায় শিল্পকলার পূর্ণতা। একটি শ্যামলী কী? একটি মেঘা কী? তারা কবিতা নয়, শব্দের অপূর্ব বিন্যাস নয়, ছন্দ নয়, অভাবিত চিত্রকল্প নয়; তারা স্তন, ওষ্ঠ, যোনি, জরায়ু, সংসার, কচুশাখ, ইলশে মাছ, কাঁচামরিচ, ধনেপাতা, রাবার, পিল, রাবারহীনতা, ঋতু, বারো দিনের পর উর্বরতা, শিশু, আবার শিশু, এবং শিশু। আমি কি এই চাই? আমি এটা চাই না, জীবন চাই না, শিল্পকলা চাই।

বেশ রাতে বাসায় ফিরে হাসানের ইচ্ছে হয় স্নান করতে; সে বাথরুম ঢুকে শাওয়ার খুলে ঝরনাধারার নিচে নগ্ন নাচতে থাকে, শিশুর মতো, যেনো জোয়ার এসেছে খালেবিলে, সে লাফিয়ে পড়ছে জোয়ারের জলে, নিজেকে সে জিজ্ঞেস করতে থাকে তার আজ এই রাত বারোটায় স্নান করতে ইচ্ছে হলো কেনো? আমি জানি না, আমি জানি না; হাসান নিজেকে বলতে থাকে, হাসান, তুমি আমাকে আজেবাজে প্রশ্ন কোরো না, আমি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না, আমি উত্তর জানি না, আমার শাওয়ারের নিচে নগ্ন নাচতে ভালো লাগছে, এই জানি আমি, ভালো লাগলে সারারাত আমি শাওয়ারের নিচে নাচবো।

বেডরুমে কি টেলিফোন বেজে চলছে? না কি জলের শব্দ? জলপ্রপাতের শব্দ? টেলিফোন বাজছে? হ্যাঁ, বাজছে; বাজুক, আমি জোয়ারে ভাসছি, টেলিফোনের কোনো সংবাদ আমি জানি না, জোয়ারের জলে কোনো টেলিফোন নেই, আমি শুধু জলের স্বর শুনতে চাই, জলের ছোঁয়া পেতে চাই। থামছে? আবার বাজছে? বেজে চলছে? অনন্তকাল বেজে চলবে? মধ্যরাতে অ্যাড? বোতলে ভরা হয়ে গেছে নতুন শ্যাম্পু? উৎপাদিত হয়ে গেছে কোনো ২০০% হালাল সাবান? কাল ভোরেই বাজারে আসবে নতুন পিল? ব্যবসা, ব্যবসা, ব্যবসা; ব্যবসায়ী গ্রহটির বেশি সময় নেই; উৎপন্ন হয়ে গেছে, ফেলে রাখা চলে না, এখন বেচতে হবে, দিনরাত বেচতে হবে; তাকে বেশি বাজতে দেয়া ঠিক হবে না।

হাসান ভেজা শরীরে, চুল থেকে ঝরঝর ক'রে জোয়ার ঝরছে, বেরিয়ে আসে; টেলিফোন ধ'রে বলে, হ্যালো, হাসান বলছি।

মেঘা বলে, আমি সন্ধ্যে থেকে ফোন ক'রে চলছি, পাগল হয়ে আছি।

হাসান বলে, ফিরতে দেরি হয়েছে, ফেরার ইচ্ছে ছিলো না; আমি হয়তো পাগল হয়ে গেছি।

মেঘা জিজ্ঞেস করে, কেনো দেরি করলেন?

হাসান বলে, পাগল হয়ে গিয়েছিলাম ব'লে পথ চিনতে পারি নি।

মেঘা বলে, পাগল হয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

হাসান বলে, পান করতে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম সেখানেই ঘুমিয়ে পড়বো।

মেঘা জিজ্ঞেস করে, এখন কী করছিলেন?

হাসান বলে, বাথরুমে শাওয়ারের নিচে নাচছিলাম– পাগল হয়ে।

মেঘা বলে, আপনি নাচতে জানেন?

হাসান বলে, পাগল হ'লে নাচতে জানি।

হাসান মেঝেতে বসে, তার মনে হয় তার ওপর ঝ'রে পড়ছে ঝরনাধারা, আকাশ থেকে, মেঘমণ্ডল থেকে।

মেঘা বলে, আপনাকে না পেলে আমি সারারাত ফোন ক'রে চলতাম।

হাসান বলে, তুমি কি এখন আসতে পারো?

মেঘা বলে, এই রাত সাড়ে বারোটায়?

হাসান বলে, হ্যাঁ।

মেঘা বলে, আমার আসতে ইচ্ছে করছে, বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে, কিন্তু এখন কি আমি আসতে পারি?

হাসান বলে, তাহলে কাল আসবে, আমার সাথে সারারাত থাকবে।

মেঘা বলে, থাকবো।

হাসান জিজ্ঞেস করে, বাসায় অসুবিধা হবে না?

মেঘা বলে, তুচ্ছ বাসাটাসার কথাও আপনি ভাবেন?

হাসান বলে, হঠাৎ মনে হলো, অসুবিধা হ'তে পারে।

মেঘা বলে, আমি সেটা দেখবো, হলে থাকার কথা বলবো।

হাসান বলে, তোমার সাথে সারারাত কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

মেঘা বলে, আমারও ইচ্ছে করছে।

হাসান বলে, বলো, অনন্তকাল ধ'রে বলো।

মেঘা বলে, কিন্তু লুকিয়ে আর বেশি কথা বলতে পারছি না।

হাসান বলে, কাল বিকেলে অফিসে এসো।

মেঘা বলে, আমি এসেছি।

মেঘা ফোন রেখে দিয়েছে, এখন আমি কী করতে পারি? কী করার আছে আর? পৃথিবীতে সব কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে, এখন যা আজ আছে সবই পুনরাবৃত্তি, করার অযোগ্য। আমার জীবনপাত্র কি ভ'রে গেছে কানায় কানায়, উপচে পড়ছে? এর পর আছে শুধু ক্লান্তি, আছে শুধু জোয়ারের পর নদী জুড়ে পোড়া কাঠের ছড়াছড়ি? এখন একমাত্র সুখকর কাজ হচ্ছে আত্মহত্যা, ভবিষ্যতের সমস্ত তুচ্ছতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া? সমগ্র জীবনযাপন করা হয়ে গেছে আমার? কিন্তু আত্মহত্যা নয়, আত্মহত্যা নয়, এখনি আত্মহত্যা নয়। ঘুমোবো? একটি কবিতা চোখের সামনে উড়ছে কয়েক দিন ধ'রে, না কি সাঁতার কাটছে, সেটিকে ধ'রে ফেলতে চেষ্টা করবো অক্ষরের খাঁচায়? আরো কয়েক দিন উড়তে দেবো এলোমেলো? উড়ুক, কবিতাটি উড়ুক, জ্যোৎস্নায়, অন্ধকারে উড়ুক; সাঁতার কাটুক, জলে, গভীর জলের ভেতরে; কিন্তু ঘুম? কোথায়? কেনো? কখন? কতো শতাব্দী? অনন্তকাল? হাসানের চোখ পড়ে একটি সংস্কৃত ব্যাকরণের ওপর, ইংরেজিতে লেখা, লিখেছেন এক এডিনবরি অধ্যাপক,–

মহান বৈদিক ভারতীয়দের, আহা, আজকাল সংস্কৃত শিখতে হচ্ছে পাষণ্ড বেকনভোজি শাদাদের কাছে; অনেক দিন আগে কিনেছিলো, আজ রাতে– কবিতা নয়, কাব্যতত্ত্ব নয়, তার পড়তে ইচ্ছে করছে সংস্কৃত ব্যাকরণ। হাসান সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়তে থাকে, চমৎকার ভাষা সংস্কৃত– মেঘার মতোই। মেঘার মতোই? না, মেঘা এতো সূত্র দিয়ে বাঁধা নয়, মেঘা সংস্কৃতকে ছাড়িয়ে গেছে আড়াই হাজার বছর আগেই। মেঘা কি প্রাকৃত? কোনটি? আটত্রিশটির কোনটি? মহারাষ্ট্রী? শৌরসেনী? মাগধী? পৈশাচী? কোনটি? মেঘা কি অবহট্‌ঠ? মেঘা কি অবহট্‌ঠ ভেঙে হয়ে উঠছে বাঙলা? কায়া তরুবর পাঞ্চ কি ডাল? প্রাচীন ব্যাকরণ জানা দরকার কবিকে, সব মৃত ভাষার ব্যাকরণ– যদি সে আউল বাউল ঝাউল না হয়, আধুনিক কবি হয়। লাতিন ব্যাকরণ পড়লে কেমন হয়? প্রিস্কিআনের ব্যাকরণ? গ্রিক ব্যাকরণ? থ্রাক্সের ব্যাকরণ? পাণিনির ব্যাকরণ কি পড়ার চেষ্টা করবো একবার? কাত্যায়ন? পতঞ্জলির মহাভাষ্য?

বিকেলে, হাসানের যেটাকে ঠিক সময় মনে হয়েছিলো, তার আগেই মেঘা আসে; মেঘাকে দেখে হাসানের মনে হয় তার কবিতা আজো এতো শিল্পময় হয়ে উঠতে পারে নি; শুধু তার নয়, কোনো কবিতাই এতো শিল্পিত সুন্দর নয়।

মেঘা কি কবিতার থেকে উৎকৃষ্ট? কবিতা কি মেঘারই নিকৃষ্ট অনুকরণ?

মেঘা শিল্পকলার থেকেও স্মিত হেসে বলে, আমি এসেছি।

হাসান বলে, কিন্তু আর কেউ আমার কাছে এমনভাবে কখনো আসে নি।

মেঘা বলে, একমাত্র আমিই জন্মেছি আপনার কাছে আসার জন্যে।

হাসান বলে, তোমার পিতা ও মাতাকে ধন্যবাদ।

মেঘা বলে, আপনার কাছে আসবো ব'লে আমার পিতাকে কোনো কষ্ট করতে হয় নি, তবে মাকে দশটি শেলাই নিতে হয়েছিলো।

হাসান বলে, কবিতাও কখনো এভাবে আসে নি। আসা শব্দটির অর্থ আজ আমি প্রথম অনুভব করছি, আসা শব্দটির অর্থ যেনো কী?

মেঘা বলে, একদিন আমি আপনার কাছে আসবো এজন্যেই আমার আপনার জন্ম হয়েছিলো, আসা শব্দের অর্থ হচ্ছে মেঘার জন্ম।

হাসান বলে, তুমি একটু দেরিতে জন্ম নিয়েছো।

মেঘা বলে, না, ঠিক সময়েই জন্ম নিয়েছি; ঠিক একুশ বছর পরে। আপনি আমার একুশ বছর ছোটো।

হাসান বলে, কাল সারারাত আমি সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়েছি, আর আজ দুপুর থেকে একটি পিলের অ্যাডের স্ক্রিপ্ট সংশোধন করছি।

মেঘা হেসে বলে, কোনোটিই আমি খাই নি।

হাসান জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এক ঠোঙা পিল খেয়ে দেখবে? চমৎকার সুস্বাদু পিল, আমেরিকায় তৈরি।

মেঘা হেসে বলে, দিন, মরিচ আর লবণ আছে তো?

হাসান বলে, ভেজে খাবে না, না ভর্তা ক'রে খাবে?

মেঘা বলে, ভর্তা ক'রে খেতেই ভালো লাগবে।

হাসান বলে, সারাজীবনে তোমাকে কয়েক কেজি পিলের ভর্তা খেতে হবে।

মেঘা বলে, আপনি বললে খাবো।

হাসান বলে, তুমি কি পিলটার মডেল হবে?

মেঘা বলে, আজ তো আমি মডেল হ'তে আসি নি; আজ আমি প্রিয়তমা।

হাসান একটু বিব্রত হয়, এবং বলে, মেঘা, পুঁজিবাদ প্রিয়তমাকেও বিক্রি করে, প্রিয়তমার গ্রীবার তিল, গালের টোল, স্তনের উচ্চতা, পাছার প্রশস্ততাও বিক্রি ক'রে; সবই পণ্য; তবে তোমাকে আমি বেচতে চাই নি।

মেঘা বলে, তা আমি জনি।

সন্ধ্যার একটু পর তারা একটি পাঁচতারা হোটেলে যায়।

মেঘা বলে, এ-হোটেলে কখনো ঢুকবো ভাবি নি, এতো ঝলমলে, এতো সুন্দর, এতো অপূর্ব, এতো অচেনা, এটা কি তাজমহল?

হাসান বলে, আমিও কখনো ঢুকবো ভাবি নি, এটাকে এক সময় বিদেশ মনে হতো আমার, পাসপোর্ট ছিলো না।

মেঘা জিজ্ঞেস করে, কখন ভাবলেন?

হাসান বলেন, ভাবি নি; অই স্বাধীনতাটা আমাকে এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ধন্যবাদ গরিব স্বাধীনতা, আমি কৃতজ্ঞ, হে গরিব স্বাধীনতা।

মেঘা বলে, এখানে গরিব কই? ছেঁড়া লুঙ্গিপরা ভাইরা কই? এই কার্পেটে তারা হাঁটলে কী সুন্দর দেখাতো।

হাসান বলে, তাদের আমরা দেশ জুড়ে স্বাধীনতা দিয়েছি, এই নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত; গরিবরা বস্তিতে সুন্দর, ধনীরা হোটেলে।

মেঘা বলে, তাহলে এখানে আমাকে খুব কুৎসিত দেখাচ্ছে।

হাসান বলে, যেমন পঙ্কে পদ্মকে কুৎসিত দেখায়।

তারা গিয়ে বসে বুফেই রেস্তোরাঁয়।

মেঘা বলে, এমন সুন্দর রেস্তোরাঁ কখনো দেখি নি।

হাসান বলে, এখানে হয়তো ১০১টি বা ৫০০৫টা খাবার আছে, যতো পারো খাও, দাম ৪০০ টাকা, এক টুকরো মাছও ৪০০ আর সব খেলেও ৪০০।

মেঘা বলে, তাহলে আমি সব খাবো।

হাসান জিজ্ঞেস করে, তুমি কি খেতে খুব পছন্দ করো?

মেঘা বলে, না; তবে এতো খাবার দেখে আমি পাগল হয়ে গেছি।

হাসান বলে, প্রকৃত পাগল?

মেঘা বলে, আমাদের রাস্তার পাগলটার মতো পাগল, রেলস্টেশনের পাগলীটার মতো পাগল, আমি আজ পাগলের মতো খাবো, খেয়ে খেয়ে ১০০০ কেজি হয়ে যাবো, যাতে আর খেতে না হয়।

হাসান বলে, খাও, ১০০,০০০ কেজি হও, আদিম ভেনাস হও। আদিম ভেনাসকে আমি ভালোবাসি।

মেঘা চঞ্চল বালিকার মতো প্লেট ভ'রে খাবার আনতে থাকে, কিছুটা খেয়ে আর খেতে পারে না; কিন্তু আরো খাবার প'ড়ে আছে সারিসারি, চেনা আর অচেনা, সেগুলো সে আনে নি, সেগুলো খেয়ে দেখতে হবে, নতুন প্লেট নিয়ে আবার সেগুলো আনতে যায়, আপ্যায়নকারীরা প্লেটের পর প্লেট নিয়ে যেতে থাকে, মেঘার প্লেটে খাবারের পাহাড় প'ড়ে থাকে, আনে, এক টুকরো খায়; হাসান একমুঠো ভাত, মাছ, শজি, ফল নেয়, আর নেয় ফরাশি মদ।

হাসান জিজ্ঞেস করে, তুমি কি একটু পান করবে?

মেঘা হাসানের পাত্র থেকে একটু পান ক'রে বলে, খুবই মধুর লাগছে, এমন কিছু আগে কখনো খাই নি।

হাসান বলে, তোমার জন্যে এক পাত্রের কথা বলবো?

মেঘা বলে, না, না; আমি আপনার পাত্রেই মাঝেমাঝে চুমুক দেবো।

হাসান বলে, এই পাত্রটি তো আমার ওষ্ঠ।

মেঘা বলে, আপনার ওষ্ঠ আমার আঙুর।

তারা যখন হাসানের ঘরে গিয়ে ঢোকে তখন বেশ রাত; আলো জ্বালিয়েই হাসান বিস্মিত হয় যে ঘরটিকে আজ বিস্ময়করভাবে সুন্দর দেখাচ্ছে, তার ঘরটি এতো সুন্দর হলো কী ক'রে? এটা তো এতো সুন্দর ছিলো না। মেঝের ধূসর সোনালি ম্যাটে ঘাস গজিয়ে উঠছে সবুজ হয়ে, ঘাসফুল ফুটছে এদিকে সেদিকে, দেয়ালে দেয়ালে শিমুল, দিকে দিকে টলমল পুকুরে দুলছে লালপদ্ম নীলপদ্ম শ্বেতপদ্ম, ওই কোনায় উড়ছে বসছে ডাকছে একটি দোয়েল।

মেঘা বলে, আপনার ঘরটি এতো সুন্দর!

হাসান হেসে বলে, তুমি হয়তো ভেবেছিলে এটা লালন ফকিরের আখড়ার মতো অলৌকিক দেখাবে।

মেঘা বলে, না, না, অমন ভাবি নি।

হাসান বলে, তবে আগে এটা এমন ছিলো না, আখড়ার মতোই ছিলো, কিছুক্ষণ আগে সুন্দর হয়ে উঠলো।

মেঘা বলে, কিছুক্ষণ আগে?

হাসান বলে, তুমি যেই পা রাখলে অমনি এটি হয়ে উঠলো সুন্দর।

মেঘা বলে, আমার পায়ে এমন যাদু নেই।

হাসান বলে, তুমি যখন আর পা রাখবে না, তখন এটা হয়ে উঠবে মেথরপট্টির থেকেও নোংরা।

মেঘা বলে, শুধু পা নয়, নিজেকেই আমি রাখবো।

হাসান বলে, কোথায়?

মেঘা বলে, এই স্বর্গে।

হাসান নিজের বুকটি দেখিয়ে বলে, তুচ্ছ স্বর্গে নয়, তুমি তোমাকে রেখো এইখানে, এই প্রচণ্ড অপবিত্র নরকে, যেখানে আগুন জ্বলছে জিহোভার ক্রোধের থেকেও তীব্রভাবে।

মেঘা বলে, ওখানেই থাকতে চাই আমি।

হাসান জিজ্ঞেস করে, চা খাবে?

মেঘা বলে, চার কাপ পাঁচ কাপ দশ কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে।

হাসান বলে, খুব অস্থির লাগছে?

মেঘা বলে, প্রথম স্বর্গে গেলে যেমন অস্থির লাগবে।

হাসান বলে, তুমি স্বর্গের স্বপ্নে আছো, আমি আছি নরকের।

মেঘা বলে, আজ থেকে স্বর্গকে ছেড়ে দিলাম, নরককে নিলাম।

হাসান বৈদ্যুতিক কেটলিতে পানি গরম করে, মেঘা তার হাত থেকে কেটলি নিয়ে বলে, আমি বানাই।

হাসান বলে, পারো?

মেঘা বলে, একটি কাজই আমি ভালো পারি– চা বানাতে।

হাসান চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, এটা তো চা নয়।

মেঘা চমকে উঠে বলে, খুব তেতো হয়েছে, খুব বাজে?

হাসান বলে, এক কাপ তরল রঙিন কবিতা, পড়ার জন্যে নয়, পানের জন্যে।

চা খেতে খেতে হাসানের ডান হাতের আঙুলগুলো নিঃশব্দ ঝরনাধারার মতো বয়ে চলে মেঘার বাঁ হাতের আঙুলগুলোর দিকে, গিয়ে পড়ে আরেক ঝরনাগুচ্ছে– স্নিগ্ধ উষ্ণ অমল কোমল শীতল নির্মল, নিঃশব্দ কলকল ধ্বনি উঠতে থাকে চারপাশের পাহাড় উপত্যকা বনভূমিকে সঙ্গীতে মুখর ক'রে; হাসান উঠে দাঁড়ায়, তার ওষ্ঠ দোয়েলের মতো গিয়ে বসে মেঘার ওষ্ঠে, ভোরের আগের নিঃশব্দ সুরে ভ'রে যেতে থাকে সমস্ত চরাচর; হাসানের মনে হয় হাজার হাজার বছর পর সে ঢুকছে নিসর্গের ভেতর, সমস্ত নগর রাজধানি দুর্গ বিমানবন্দর চারতারা পাঁচতারা নিওন আলো অ্যাড পেছনে ফেলে ঢুকছে গভীর অরণ্যে, যেখানে পাতার সবুজ ফুলের সুগন্ধ, অরণ্যে, যেখানে গভীরতম ছায়া আর জ্যোৎস্না, অরণ্যে, যেখানে আকাশ ছড়ানো ময়ূরের পেখমের মতো; হাসান তার শরীর থেকে খুলে ফেলে সভ্যতার নোংরা ছেঁড়াফাড়া আবরণ, দাঁড়ায় আদিম পুরুষের মতো নগ্ন পর্বতচূড়োর মতো নগ্ন স্বপ্নের মতো নগ্ন, মেঘা তার দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে ফেলে, যেনো ঘুমিয়ে পড়ছে, আর জাগবে না; ধীরেধীরে সে মেঘার শরীর থেকে সরিয়ে দিতে থাকে সভ্যতার ছেঁড়া সিল্ক, হাসান দেখতে পায় তার চোখের সামনে আশ্বিনের নদীর মাঝখানে জেগে উঠছে একটি নতুন নগ্ন চর, আদিম সুন্দর অমল পলিময়; আমি এমন সুন্দর কিছু আগে দেখি নি, এমন নদী আগে দেখি নি, আগে দেখি নি এমন সুন্দর বাঁক, হয়তো চিরকাল অন্ধ ছিলাম, কখনো চাঁদ দেখি নি, এই প্রথম দেখলাম; সরোবর দেখি নি, দেখলাম এই প্রথম, এমন জলে আগে সাঁতার কাটি নি কখনো, এই প্রথম সাঁতার কাটলাম; আমি ভ'রে যাচ্ছি বাঘের গায়ের গন্ধে

ভ'রে যাচ্ছি হরিণীর মাংসের সুগন্ধে, অজস্র জেব্রার রঙে ভ'রে উঠছে জ্যোৎস্নায় মাতাল অরণ্য, দূরে শুনতে পাচ্ছি মত্তহস্তীর মহান ডাক; হাতি ডেকে চলছে, হাতি ডেকে চলছে, হাতি ডেকে চলছে। বেরিয়ে পড়েছে অরণ্যের সব হাতিরা, সব বাঘেরা, সব হরিণেরা, সব জেব্রারা; সকলের শরীরে আজ তীব্রতম প্রেম, সকলের হৃদয়ে আজ অনির্বচনীয় আবেগ।

যখন ঘুম ভাঙে তখন অনেক বেলা;– নগ্ন নদী আর নগ্ন চর জড়িয়ে আছে পরস্পরকে।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কেমন আছো?

মেঘা বলে, মনে হচ্ছে আমি নেই, আমি নেই, আমার জন্ম হয় নি।

হাসান জিজ্ঞেস করে, উঠবে?

মেঘা বলে, এরপর যে আর উঠতে হবে সেকথা মনে পড়ে নি।

হাসান বলে, জড়িয়ে থাকবো?

মেঘা বলে, যতো দিন বেঁচে আছি যতো দিন ম'রে আছি।

হাসান বলে, আজ অ্যাডে যাবো না।

মেঘা বলে, আজ আমি রৌদ্রেও যাবো না।

হাসান বলে, এই প্রথম আমার জীবনে একটি সম্পূর্ণ রাত্রি এলো, এই রাত্রির স্বপ্ন দেখেছি সারাজীবন। তুমি আমাকে রাত্রি দিলে।

মেঘা হেসে বলে, রাত্রি দেয়ার জন্যে আমাকে ধন্যবাদ?

হাসান বিব্রত হয়ে বলে, না, না, ধন্যবাদ নয়, ধন্যবাদ নয়, অন্য কিছু।

মেঘা বলে, স্বপ্ন দেখার আগেই আমার জীবনে এলো অপূর্ব রাত্রি; আপনি আমাকে রাত্রি দিলেন।

হাসান বলে, তার জন্যে আমাকে ধন্যবাদ?

মেঘা বলে, না, আমার জীবন।

হাসান বলে, এ-রাত আর কখনো আসবে না।

মেঘা বলে, আসবে, ফিরে ফিরে আসবে; আমরা হয়তো বুঝতে পারবো না ফিরে ফিরে আসছে এই রাতই।

হাসান উঠে কেটলি চালু করে; মেঘা লাফিয়ে উঠে শাড়ি জড়িয়ে বলে, আমি চা বানাই, এটাই তো আমি ভালো করি।

হাসান বলে, এই অরণ্যে আর শাড়ি কেনো?

মেঘা জিজ্ঞেস করে, পরবো না?

হাসান বলে, যখন আমরা এই অরণ্যে তখন কোনো অশ্লীল পোশাক নয়, বস্ত্র হচ্ছে অসভ্যতা অশ্লীলতা।

মেঘা বলে, তাহলে তাই।

হাসান মেঘার স্তন ছুঁয়ে বলে, এখানে এই চাকচাক লাল দাগ কেনো?

মেঘা বলে, সারারাত এক চিতাবাঘের মুখে ছিলাম।

হাসান বলে, চিৎকার করো নি কেনো? উদ্ধার করতাম।

মেঘা বলে, উদ্ধার চাই নি, চেয়েছি চিতাবাঘ আমাকে খেয়ে ফেলুক।

হাসান বলে, খেয়ে ফেলে নি ব'লে দুঃখ হচ্ছে?

মেঘা বলে, চিরকাল তার দাঁতে গাঁথা থাকবো, সে খাবে, আবার খাবে, আমি ফুরোবো না; চাকচাক দাগের অলঙ্কার প'রে থাকবো।

একটি সম্পূর্ণ রাতের পর একটি সম্পূর্ণ দিনও আসে, শুধু তাদের জন্যে, আর কারো নয়, শুধু তাদের জন্যে– একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত করতলগত দিন; যদিও দিনরাত্রির পার্থক্য বুঝতে পারে না তারা, বোঝার কোনো দরকার হয় না, বোঝার কথা মনে পড়ে না; দিন ও রাত একই জিনিশের দুই রকম উৎসারণ মনে হয় তাদের, একই আলো কখনো অন্ধকার হয়ে দেখা দেয়, একই অন্ধকার কখনো দেখা দেয় আলো হয়ে। ওই সম্পূর্ণ দিনটিও তারা কাটিয়ে দেয় বা অধিকার ক'রে রাখে হাসানের ঘরের গভীর বিজন ছায়াঘন ঝরনামুখর আদিম অরণ্যে; সারাদিন ধ'রে হাতিরা ডাকে– ডাকে, বাঘেরা ডাকে– ডাকে, হরিণেরা ডাকে– ডাকে; সুন্দর জ্বলজ্ব'লে চিতার দাঁতে ঝুলতে ঝুলতে একজন হরিণী হাহাকার করতে থাকে পরম সুখে, ঘাইহরিণীর রক্তের আবেদনে সাড়া দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে জেগে থাকে এক পুরুষহরিণ, ভাসতে থাকে সুখ ও অবসাদের মধ্যে, আনন্দ ও যন্ত্রণার মধ্যে; সম্পূর্ণ দিন ভ'রে আদিম অন্ধকার, সম্পূর্ণ দিন ভ'রে আদিম উজ্জ্বল জ্যোৎস্না; সম্পূর্ণ দিন ভ'রে শরীর, সম্পূর্ণ দিন ভ'রে হৃদয়। পাহাড় বেয়ে বেয়ে উঠতে উঠতে পুরুষ এক সময় গড়িয়ে পড়ে প্রবালখচিত উপত্যকায়, ঢুকতে থাকে আদিম গুহায়, বল্লমে সুসজ্জিত, অপরাজেয় অক্লান্ত, এবং মহাক্লান্তিতে বিধ্বস্ত; নারী খুঁজে পায় এক অদ্ভুত আশ্রয়, যা উঠে গেছে আকাশের দিকে, দৃঢ় বলিষ্ঠ উদ্ধত, যার ভীতিকর সৌন্দর্যে তার চিৎকার আনন্দ হয়ে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে।

সারাদিন ভ'রে মাংসের, সারাদিন ভ'রে হৃদয়ের উৎসব।

সন্ধ্যায় মেঘা বলে, এবার যেতে হবে।

হাসান বলে, যাওয়ার দরকার নেই, টেলিফোন ক'রে জানিয়ে দাও তুমি এখানে আছো, এখানে থাকবে।

মেঘা বলে, এখানেই তো থাকবো, তবে আজ যেতে হবে।

হাসান বলে, কেনো?

মেঘা বলে, পুরোপুরি আসার জন্যে।

সন্ধ্যার পর হাসান মেঘাকে এগিয়ে দিয়ে আসে মেঘাদের বাড়ির সামনের পথ পর্যন্ত, রিকশা থেকে নেমে সে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফেরে।

একরাশ কবিতা এসেছে মাথার ভেতরে, বহু দিন পর প্রেমের কবিতা; বহু দিন পর কম্পিত কবিতা।

রাতেই খসড়া লেখা হয়ে যায় তিনটি কবিতার।

কবিতা, তুমি এসেছো, এসো।

মধ্যরাতে মেঘা ফোন করে, আমি এখানে ঘুমোতে পারছি না, মনে হয় দোজখে প'ড়ে আছি।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কোথায় ঘুমোতে চাও?

মেঘা বলে, ওই বিজন অরণ্যে, যেখানে আছেন উজ্জ্বল চিতাবাঘ।

হাসান বলে, এর থেকেও বিজন অরণ্যে যাওয়ার কথা ভাবছি আমি। কয়েকদিনের মধ্যেই মধুপুর জঙ্গলে যেতে চাই– অরণ্য, অরণ্য, পৃথিবী জুড়ে শুধুই অরণ্য, আর কিছু নেই অরণ্য ছাড়া, বাঘ ও হরিণ ছাড়া।

মেঘা বলে, আগামীকালই।

হাসান বলে, ইচ্ছে করছে এখনই, কিন্তু ব্যবস্থা করতে হবে, সেখানে আছে একটি অপরূপ কুটির।

মেঘা বলে, আমি তার স্বপ্ন দেখা শুরু করছি।

কয়েক দিন পর মধুপুর অরণ্যে বেড়াতে যায় তারা, তিন দিনের জন্যে। মেঘা বাসায় ব'লে আসে বান্ধবীদের সাথে বেড়াতে যাচ্ছে সিলেট।

কুটিরে উঠেই হাসান মালিটিকে বলে, আপনি কি সন্ধ্যায় ফুলপাতা এনে দিতে পারবেন?

মালিটি বলে, পারুম ছার, কি ফুল আনুম?

হাসান বলে, এ-বনে যতো সুগন্ধি পাতা আছে ফুল আছে, সব আনবেন, সবুজ পাতা আর রঙিন ফুল।

মালিটি জিজ্ঞেস করে, কতগুলি লাগবো ছার?

হাসান বলে, পাঁচ ঝুড়ি দশ ঝুড়ি, যা পারেন।

লোকটি বলে, সন্ধ্যার আগেই দিয়া যামু ছার।

লোকটি চ'লে গেলে মেঘা জিজ্ঞেস করে, এতো ফুলপাতা দিয়ে কী হবে?

হাসান বলে, শয্যা।

মেঘা বলে, পাতা আর ফুলের শয্যা?

হাসান বলে, পুরোনো ভারতে ফিরে যাবো আজ রাতে।

মেঘা বলে, আমি আরো অতীতে ফিরে যেতে চাই।

সন্ধ্যার পর যখন আকাশে চাঁদ উঠেছে, বনের প্রতিটি পাতায় যখন আটকে আছে ডজন ডজন চাঁদ, পাতার ফুলের শয্যায় তখন খেলা শুরু হয় চিতাবাঘ ও হরিণীর। পাতা আর ফুলের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে তাদের শরীর, পাতার ফুলের গন্ধে ভ'রে ওঠে তাদের হৃদয়। তারা ক্লান্ত ও অক্লান্ত, তারা অবসাদগ্রস্ত ও চিরসজীব, তারা জীবিত ও তারা মৃত।

যখন রাত শেষ হয়ে এসেছে হাসান জিজ্ঞেস করে, তোমার এই বুকে কি কখনো অন্য কেউ ঘুমোবে, মেঘা?

মেঘা বলে, যেখানে একদিন হরিণ ঘুমিয়েছে সেখানে কখনো কোনো শুয়োরের স্থান হবে না।

হাসান বলে, আমি ওখানে চিরকাল ঘুমোতে চাই।

মেঘা বলে, আমি চিরকাল বুকে নিয়ে জেগে থাকতে চাই।

তিনটি দিন তিন মিনিটের মতো কেটে যায় রোগ, জ্যোৎস্না, ছায়া, অন্ধকারে; নখের দাঁতের রক্তিম ক্রিয়াকলাপে; চুম্বনে, চুম্বনে, সঙ্গমে, সঙ্গমে। শরীর সমস্ত মধু ঢেলে দেয় জঙ্গলের প্রতিটি পাতায়, প্রতিটি লোমকূপ চুইয়ে নিরন্তর ঝরতে থাকে চাকভাঙা মধু; তাদের শরীর গ'লে মধু হয়ে ভোরবেলায় টলমল করতে থাকে সবুজ ঘাসের শিখায়, কচুপাতার মসৃণ করতলে; তাদের আলিঙ্গন, চুম্বন, সঙ্গমের দাগ লেগে থাকে গাছের ওপরের গোলগাল চাঁদের শুভ্র শয্যায়; জ্যোৎস্নাবিহ্বল হয়ে সেটি গ'লে পড়তে থাকে শালের পাতায় পাতায়। মধু ঝরতে থাকে শালের পাতা থেকে, পাখিরা মধু পান ক'রে মুখর ক'রে রাখে বনভূমি; গুঞ্জনে মেতে ওঠে মৌমাছিরা, ফুলে ফুলে এতো মধু তারা আগে কখনো পায় নি।

কেটে গেছে কতো দিন? এক মাস? দেড় মাস? না কি মহাকাল?

একদিন বিকেলে মেঘা অফিসে এসে বলে, একটি চমৎকার সংবাদ আছে।

হাসান হেসে বলে, শুধু চমৎকার তার বেশি নয়?

মেঘা বলে, শ্রেষ্ঠতম সংবাদ।

হাসান জিজ্ঞেস করে, পৃথিবীতে কি নতুন কোনো পণ্য আসছে?

মেঘা বলে, পণ্যের থেকে অনেক বড়ো, স্বপ্ন।

হাসান জিজ্ঞেস করে, কী সেই স্বপ্ন?

মেঘা বলে, আমার ভেতরে এক নতুন কবি জন্ম নিচ্ছেন, কবিতা লিখছেন।

হাসান বলে, কবিগুরু এসে গেছেন? নোবেল প্রাইজের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন?

মেঘা বলে, হ্যাঁ, গীতাঞ্জলি অনুবাদ করছেন মনে হয়।

হাসান বলে, চলো, আজ প্রচুর খাবো, কবিকে এখন থেকেই প্রচুর খাওয়ানো দরকার, দেশে সুস্থ কবি চাই।

মেঘা বলে, তারপর?

হাসান বলে, তারপর আমাদের বাসায় ফিরবো।

মেঘা বলে, আমাদের?

হাসান বলে, হ্যাঁ।

বাসায় ফিরে তারা অরণ্যে আদিম হয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে মেঝেতে বসে, রক্তিম চা টলমল করতে থাকে তাদের শরীরের মতো।

হাসান মেঘাকে বলে, বাসায় ফোন ক'রে দাও তুমি এখানে থাকবে।

মেঝেতে গড়াতে গড়াতে মেঘা জিজ্ঞেস করে, কী বলবো?

হাসান তার ওপরে গড়িয়ে প'ড়ে বলে, বলবে তুমি এখানে আছো, এখানে থাকবে।

মেঘা বলে, বাসায় একটা হৈচৈ প'ড়ে যাবে না?

হাসান বলে, সব মহৎ ঘটনা শুরু হয় হৈচৈ দিয়ে, সব ঐতিহাসিক ঘটনা মূলত হৈচৈ, আজো তা হবে।

মেঘা বাসায় ফোন ক'রে বলে, আম্মা।

মেঘার আম্মা বলেন, রাইত বারোটা বাজে, তুই যে এখনও আসলি না, চিন্তায় চিন্তায় আমরা পাগল হইয়া আছি।

মেঘা বলে, আম্মা, আমি আজ আসবো না।

আম্মা বলেন, ক্যান আসবি না?

মেঘা বলে, আমি এখানেই থাকবো, আম্মা।

আম্মা জিজ্ঞেস করেন, কই থাকবি তুই?

মেঘা বলে, আমার বাসায়, আম্মা।

আম্মা বলেন, তর বাসা কই? তর বাসা ত এইটা।

মেঘা বলে, না, আমি যেখানে আছি সেটা আমার বাসা, আম্মা।

আম্মা রেগে ওঠেন, তুই কি আমাগো না জানাইয়া বিয়া করছস?

মেঘা বলে, না, আম্মা।

আম্মা বলেন, তুই কোনখানে আছস, ঠিকানা দে।

মেঘা বলে, কাল সকালে এসে আমি সব বলবো, আম্মা।

পরদিন মেঘার সাথে তাদের বাসার সামনের সড়ক পর্যন্ত যায় হাসান; সে নেমে অ্যাডে যায়, মেঘা চ'লে যায় তাদের বাসায়।

দুপুরেই মেঘার আব্বা ফোন করেন অফিসে, আমি মেঘার আব্বা।

হাসান বলে, আপনার সাথে দেখা করতে যাবো ব'লে আমি ভাবছিলাম।

মেঘার আব্বা বলেন, আমরাই আজ আপনার সাথে দেখা করতে আসতে চাইতেছি।

হাসান বলে, কখন আসবেন?

মেঘার আব্বা বলেন, আপনেই সময় দেন।

হাসান বলে, সন্ধ্যার পর আমার বাসায় আসুন।

সন্ধ্যার পর মেঘা, তার আব্বা, একটি ছোটো বোন, এবং শক্তিশালী একটি পুরুষ আসে হাসানের বাসায়।

মেঘা হাসানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় সবাইকে।

মেঘার ছোটো বোনটি বলে, আপনার ঘরটি এতো সুন্দর!

হাসান বলে, তোমার ভালো লাগছে?

শক্তিশালী পুরুষটি, মেঘার মেজো চাচা, বলে, আমরা আসছি মেঘার লগে তোমার বিয়ার তারিক ঠিক করতে।

হাসান বলে, বেশ ভালো করেছেন।

শক্তিশালী পুরুষটি বলে, তারিখটা ঠিক করন দরকার।

হাসান বলে, আমি তো বিয়েতে বিশ্বাস করি না।

শক্তিশালী পুরুষটি বলে, বিয়াতে তুমি বিশ্বাস কর না, কিন্তু মাইয়াটারে ত প্র্যাগন্যান্ট কইর‍্যা ছারছো।

মেঘা চিৎকার ক'রে ওঠে, চাচা।

হাসান বলে, মেঘা আমার সাথে থাকবে।

মেঘার আব্বা বলেন, বিয়ে ছাড়া কি ক'রে থাকবো?

হাসান বলে, আমরা ভালোবাসি, মেঘা এখানেই থাকবে।

মেঘা বলে, আমরা ভালোবাসি, বিয়ে ছাড়াই তো আমরা ছিলাম, বিয়ে ছাড়াই থাকতে পারবো।

শক্তিশালী পুরুষটি বলে, বিয়া ছারা পুরুষমাইয়ালোক এক লগে শুইতে পারে না, জিনা অয়, তোমরা জিনা করছো।

মেঘা চিৎকার ক'রে বলে, চাচা।

হাসান বলে, আপনি উত্তেজিত হবেন না।

শক্তিশালী পুরুষটি বলে, তোমাগো দুইটারে পাথর মাইর‍্যা খুন কইর‍্যা ফ্যালন দরকার। তোমরা জিনা করছো।

মেঘার আব্বা বলেন, আপনারে আমরা পছন্দ করি, মেঘা যারে চায় তারে পছন্দ না ক'রে পারি না। আপনারে ভাল মানুষই মনে হচ্ছে, মেঘা আপনের সঙ্গে সুখেই থাকবো, এখনই কাজি ডেকে আনি, বিয়াটা পড়াই দেই।

হাসান বলে, বিয়েতে আমার বিশ্বাস নেই, কাজিরও দরকার নেই।

মেঘা বলে, আব্বু, বিয়ে লাগবে না, আমরা ভালোবাসি; আমাদের সন্তান হবে ভালোবাসার, আমি এখানেই থাকবো।

শক্তিশালী পুরুষটি বলে, বিয়া ছারা তুই থাকতে পারবি না, জিনা করতে আমি দিমু না; দুনিয়ায় ইসলাম শ্যাশ হইয়া যায় নাই; আমি দুইটারেই খুন কইর‍্যা ফেলুম।

মেঘা বলে, আব্বু, তোমরা যাও, আমি এখানেই থাকবো, সুখে থাকবো; আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।

শক্তিশালী পুরুষটি বলে, তোমাগো সুখে থাকন আমি বাইর কইর‍্যা দিমু, জিনা করতে আমি দিমু না।

হাসান বলে, আপনি বেশি ক্ষেপে গেছেন।

চাচা বলে, আগেই ভাইরে কইছিলাম মাইয়াগুলিরে ল্যাখাপরা শিখানের কাম নাই, নাচগান শিখানের কাম নাই, মডেল বানানের কাম নাই। তাই ত মাইয়া আইজ জিনা কইর‍্যা বেরায়, প্যাট বানায়।

মেঘা বলে, চাচা, আপনি চুপ করুন।

শক্তিশালী পুরুষটি বলে, আমি চুপ করুম না, জিনা করতে আমি দিমু না।

হাসান বলে, আপনি আমাদের নিয়ে ভাববেন না, আমাদের জীবন আমাদের।

শক্তিশালী পুরুষটি বলে, ভাবতে আমারে হইবোই, ইসলাম আছে।

তারা বেরিয়ে যায়, মেঘা থেকে যায় হাসানের সাথে; তার বাসায়, তাদের বাসায়। যাওয়ার সময় মেঘার চাচা, শক্তিশালী পুরুষটি, হাসানের ও মেঘার দিকে এমনভাবে

তাকায় যেনো সে একটি পবিত্র জরুরি কাজ অসম্পন্ন রেখে যাচ্ছে, ওই কাজটি তাকে সম্পন্ন করতে হবে অচিরে।

হাসান বলে, মেঘা, আমাদের জীবনে বিপর্যয় শুরু হলো।

মেঘা বলে, তোমাকে আমি ভালোবাসি, আমাকে তুমি ভালোবাসো, এর পাশে কোনো বিপর্যয়ই বড়ো নয়।

হাসান বলে, তোমার চাচাকে বেশ ভয়ঙ্কর মানুষ মনে হলো।

মেঘা বলে, হ্যাঁ, দরকার হ'লে সে খুন করতে পারে।

হাসান বলে, আমি হয়তো খুন হয়ে যাবো।

মেঘা বলে, তাহলে আগে আমি খুন হবো।

ছুরিকার ছায়ার নিচে একটি দীর্ঘ নগ্ন পরস্পরভেদী আলিঙ্গনে তাদের রাত কেটে যায়।

পরদিন সন্ধ্যায় মেঘার আম্মা আসেন মেঘার দুটি বোনকে নিয়ে। একটি বোন আগের দিনও এসেছিলো, সে মুগ্ধ; নতুন বোনটিও যে এসেই মুগ্ধ হয়ে গেছে, তা বোঝা যায় তার চোখ দেখলেই; এমনকি মেঘার আম্মার চোখেও মুগ্ধতা।

মেঘা বলে, আম্মা, সব দেখে বুঝতে পারছো না আমি ভালো আছি?

আম্মা বলেন, তুই ভালো আছস তা ত দেখতেই পাইতেছি, কিন্তু নিয়ম মতো বিয়াটা হওন দরকার।

মেঘা বলে, তার কোনো দরকার নেই।

আম্মা বলেন, জামাইরেও আমার পছন্দ হইছে, তরা খালি কাজি ডাইক্যা বিয়াটা কইর‍্যা নে।

মেঘা বলে, তোমার পছন্দ হয়েছে এতেই আমি সুখী; কাজি ডাকার দরকার নেই, আম্মা।

আম্মা বলেন, দরকার আছে। দ্যাশে সমাজ আছে, ধর্ম আছে, নিয়ম আছে; তা ছাড়া আমার আরো তিনটা মাইয়া আছে, তাগো বিয়া দিতে লাগবো।

মেঘা হাসানের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি কী বলো, বিয়ে কি করতেই হবে; কাজিকে কি ডেকেই ফেলবো?

হাসান বলে, কোনো দরকার নেই।

মেঘার আম্মা বলেন, বিয়া যদি না করো, কাবিন যদি না করো, তারপর তুমি যদি আমার মেয়েটারে ছাইর‍্যা দেও, তখন কে দেখবো?

হাসান বলে, ছেড়ে দেয়ার কথা ওঠে না; আর ছেড়ে দিলে ওই কাবিন আমাদের ধ'রে রাখতে পারবে না।

মেঘা বলে, আম্মা, কাবিনের দরকার নেই আমার।

আম্মা বলেন, বিয়া ছাড়া পোলাপান হইলে লোকে জাউর‍্যা বলবো, সমাজে তার জায়গা হইবো না।

হাসান বলে, সমাজ বদলে যাচ্ছে, আপনি ভাববেন না।

আম্মা বলেন, মেঘা, তুই আমার সঙ্গে ল, হাসান তরে বিয়া কইর‍্যা উঠাই লইয়া আসবো।

মেঘা বলে, না, আম্মা, আমি আজ যাবো না, পরে যাবো।

কয়েকটি দিন তারা বৈষ্ণব পদাবলির মতো রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো যাপন করে, যেখানে আছে শুধু হৃদয় যেখানে শুধু শরীর, সমাজসংসার মুছে গেছে যেখান থেকে, যেখানে শুধু থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে অজস্র অমরাবতী। মেঘা মাঝে মাঝে ফোনে কথা বলে বোনদের সাথে, বোনরা বিকেলে অল্প সময়ের জন্যে এসে বেড়িয়ে যায়; হাসানের মনে হয় পৃথিবীতে অবসান ঘটেছে সব বিপর্যয়ের।

কিন্তু এক সন্ধ্যায় আসেন মেঘার আব্বা ও শক্তিশালী চাচা।

আব্বা বলেন, আমরা আবার আসলাম, কাজি ডেকে আইজ বিয়েটা পড়াই যাইতে চাই।

হাসান বলে, তার তো কোনো দরকার নেই।

মেঘা বলে, আব্বা, আমরা এভাবেই ভালো আছি।

শক্তিশালী চাচা বলে, বিয়া ছারা তরে এইখানে থাকতে দিমু না; তাইলে দুইটারেই সাজা পাইতে হইবো।

মেঘা বলে, চাচা, আপনি গুণ্ডামি করতে আসবেন না।

শক্তিশালী চাচা বলে, ভাইজান, আপনের এই ব্যাশ্যা মাইয়াটার কথা শোনেন, আমার মাইয়া হইলে এখনই খুন কইর‍্যা ফেলতাম। দুইটারে এক লগে খুন কইর‍্যা ফেলতাম।

হাসান বলে, আপনি খুব হিংস্র মানুষ।

শক্তিশালী চাচা বলে, তা তুমি সময় আসলে টের পাইবা। সেই জন্যেই বলতেছি কাজি ডেকে আইজই বিয়াটা পরাই যাই।

হাসান বলে, না।

আব্বা বলেন, মেঘা, তুই আজ আমার সঙ্গে ল, কয়দিন পর চইল্যা আসিস।

মেঘা বলে, আজ না, আব্বা, দু-এক দিন পর যাবো; আমার বইপত্রগুলো আনতে হবে।

আব্বা বলেন, তরে বাসায় না দেখলে আমার ভাল লাগে না।

মেঘা বলে, আমি যাবো, আব্বা।

শক্তিশালী চাচা বলে, আইজই তরে যাইতে হইবো, আমি আর জিনা সহ্য করুম না।

মেঘা বলে, চাচা, আপনি গুণ্ডামি করবেন না।

শক্তিশালী চাচা বলে, ভাই মনে হইতেছে মুসলমান না, ভাই জিনা মানলেও আমি মানুম না; দুইটারেই সাজা পাইতে হইবো।

মেঘা বলে, চাচা, আপনি দুটি বউ তালাক দিয়েছেন, এখনো আপনার তিনটি বউ আছে।

শক্তিশালী চাচা বলে, আমি শরিয়ত মোতাবেক তালাক দিছি, বিয়া করছি, জিনা করি নাই।

মেঘার আব্বা বলেন, আমার সঙ্গে ল, মেঘা।

মেঘা বলে, আমি আগামীকাল আসবো, আব্বা।

পরদিন বিকেলে মেঘা তাদের বাসায় যায়; হাসান তাকে বাসার সামনের পথ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে নিজের ঘরে এসে অপেক্ষা করতে থাকে মেঘার ফোনের, কিন্তু মেঘা ফোন করে না; হাসান নিজেই ফোনের পর ফোন করতে থাকে, কিন্তু ওই দিকে ফোন নিস্তব্ধ, হয়তো নষ্ট। হাসান আর ফোন না ক'রে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে ফোনের ও মেঘার। একবার বাথরুমে গেলে হঠাৎ ফোন বেজে ওঠার শব্দ পায় সে, দৌড়ে বেরিয়ে এসে সে বুঝতে পারে ওটা ফোনের শব্দ ছিলো না, নিজের ভেতরেই বেজে উঠেছিলো ওই শব্দ; কয়েকবার তার মনে হয় কলিংবেল বেজে উঠলো, গিয়ে দেখে কেউ নেই। সে কি বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে মেঘার জন্যে? না কি গিয়ে উঠবে মেঘাদের বাড়ি? একবার নিচে নেমে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে; তখন তার মনে হয় হয়তো ফোন করেছে মেঘা, সে ঘরে ফিরে আসে, এসেই পড়ে অসীম নিস্তব্ধ শূন্যতার মধ্যে। কটা বাজে? সাড়ে দশটা বেজে গেছে। তাহলে কি মেঘা আসবে না? আসবে না, মানে হচ্ছে তাকে আটকে রাখা হয়েছে, সে না এসেই পারে না, আটকে রাখা হয়েছে মেঘাকে; সে কি মেঘাকে আনতে চ'লে যাবে মেঘাদের বাসায়? যাবে, তবে আরো কিছুক্ষণ দেখা যাক, হয়তো এখন মেঘা পথে; সে যাবে, সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত দেখবে, তারপরই বেরিয়ে পড়বে। হাসান বোধ করে সে কাঁপছে।

একটু পরেই কলিংবেল বেজে ওঠে; দৌড়ে গিয়ে দরোজা খোলে হাসান।

মেঘা নয়, চারটি মুখোশপরা, লোক তাকে নিয়ে ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে, দরোজা বন্ধ ক'রে দেয়।

হাসান জিজ্ঞেস করে, আপনারা কারা?

তারা কোনো কথা বলে না। একজন ঘুষি দিয়ে ফেলে দেয় তাকে, এবং মুখ চেপে ধ'রে টেনে হাসানকে তার ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়।

হাসান চিৎকার করার চেষ্টা করে, পারে না; নড়ার চেষ্টা করে, পারে না।

টেনে তারা হাসানের জিন্স খুলে ফেলে, হাসান বাধা দিতে পারে না।

তিনজন হাসানকে জোরে মেঝেতে চেপে রাখে, এবং একজন একটি ধারালো ছুরিকা দিয়ে গোড়া থেকে কেটে ফেলে হাসানের শিশ্নটি।

হাসান প্রথম বুঝতে পারে না, একবার চিৎকার ক'রে ওঠে; তারা হাসানকে মেঝেতে ফেলে রেখে শিশ্নটি নিয়ে চ'লে যায়।

হাসানের একটি হাত গিয়ে পড়ে তার শিশ্নের গোড়ায়, সে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করে; তাকিয়ে দেখে তার শিশ্নটি নেই– সে কোনো যন্ত্রণা বোধ করে না।

এটা নেই? হাসি পায় হাসানের। এটা নেই?

আমি আছি?

মেঘা? মেঘা আছে?

রক্ত ঝরছে; হাসান উঠে টলতে টলতে ডেটলের শিশিটা নেয়, বড়ো এক মুঠো তুলো নেয়; পুরো শিশিটা ঢেলে দেয় তুলোয়, এবং শিশ্নের গোড়ায় চেপে ধ'রে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে প'ড়ে যায়।

কিন্তু তার হাত যেনো চেপে ধ'রে থাকে শিশ্নমূল।

মেঘাদের বাসায় মেঘার ঘরে তখন মেঘাকে ঘিরে আছে মেঘার শক্তিশালী চাচা ও মেঘার আব্বা; বেরোনোর চেষ্টা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে সে বিছানার ওপর ব'সে আছে– ছিন্নভিন্ন, ভবিষ্যৎহীন, মহাজগতে একলা, অন্ধ। অন্ধ, তবু সে দেখতে পায় একটি লোক ঘরে ঢুকলো, মেঘার শক্তিশালী চাচার হাতে কাপড়ে মোড়ানো একটি বস্তু দিলো, বেরিয়ে গেলো।

শক্তিশালী চাচা বলে, কাম ঠিক মতো হইছে?

লোকটি বলে, হইছে।

শক্তিশালী চাচা মেঘার আব্বাকে বলে, ভাইজান, আপনে বাইরে যান; আমি অর লগে কয়টা কথা কই।

মেঘার আব্বা বেরিয়ে গেলে শক্তিশালী চাচা বলে, ওই শয়তানটারে সাজা দেওয়া হইয়া গেছে, বাকি আছে তর সাজা।

মেঘা কোনো কথা বলে না।

শক্তিশালী চাচা বলে, আগামীকাইল তর গর্ভপাত করতে হইবো।

মেঘা চিৎকার করে, না, না, না।

শক্তিশালী চাচা বলে, তরেও খুন করা শরিয়তের নিয়ম, তয় তরে খুন করুম না। গর্ভপাতই হইবো তর সাজা।

মেঘা চিৎকার করে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি হাসানের কাছে যাবো।

শক্তিশালী চাচা বলে, সেইটা আর নাই।

মেঘা ভয়ে কেঁপে তাকায় শক্তিশালী চাচার দিকে।

শক্তিশালী চাচা হাসানের শিশ্নটা মেঘার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, দ্যাখ, যেইটা দিয়া শয়তানটা জিনা করছে, সেইটা কাইট্যা লইয়া আসছি। শয়তানটা আর নাই।

মেঘা চিৎকার ক'রে বলে, না।

সে অজ্ঞান হয়ে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ে।

শক্তিশালী চাচা ঘর থেকে বেরোয়, বেরিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়।

সকালে মেঘার ঘর খুলে প্রথম ঢোকেন মেঘার আম্মা; ঢুকেই চিৎকার ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সবাই দৌড়ে এসে দেখে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে ঘরের একপাশে ম'রে প'ড়ে আছে মেঘা।

হাসান যখন আধো আধো চোখ খুলে পৃথিবীটাকে ঘোলাটে দেখতে পায়, তখন বিকেল হয়েছে; কিন্তু সময় কী, সে কী দেখছে, কিছু দেখছে কি না সে বুঝতে পারে না; সে কি আছে, সে কি নেই, সে কি ছিলো এমন ভাবনারাশি এলোমেলো তার মাথায়

ঢুকে তাকে অসহ্য সুখে বিবশ ক'রে দেয়, সে আবার রেশমি অন্ধকারে হারিয়ে যায়। অন্ধকারে হারাতে তার ভালো লাগে, মনে হয় কোমল মসৃণ গভীর অতল ছায়ার ভেতরে ডুবে যাচ্ছে সে, তার শরীর ভ'রে ছড়িয়ে পড়ছে ছায়া, দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিকেল আর সন্ধ্যা নামছে, রাত্রি নামছে। অন্ধকারে আরো একটি রাত কেটে যায়; ভোর হয়, ভোরের আলো ঢোকে তার ঘরে, তার ভেতরেও। আমি কী দেখছি, জিজ্ঞেস করে সে নিজেকে; আমি কি দেখছি, না কি শুনতে পাচ্ছি আমি? কোথায় আছি আমি? আমি কি আছি? কেনো আমি ছিলাম না অজস্র বর্ষ, অনন্তকাল; এখন আমি কেনো আছি? তার মনে হয় সে জন্ম নিচ্ছে, অপার অন্ধকার তাকে প্রসব করছে ক্ষীণ আলোর মধ্যে; সে ভেঙেচুরে যাচ্ছে আলোর আক্রমণে। অন্ধকারেই তো ভালো ছিলাম; আবার কেনো, আবার কেনো? আমি কে? আমার একটি নাম ছিলো; নামটি কি এখন নেই? নামটি আমি মনে করতে পারছি না কেনো? হাসান, হাসান, হাসান; তারপর যেনো কী? রশিদ, রশিদ, রশিদ– আমি মনে করতে পারছি। নাম, তুমি মনে পড়ছো কেনো? আমি প'ড়ে আছি কেনো? আমি শূন্যতা বোধ করছি কেনো? কী যেনো নেই, কী যেনো নেই, কী যেনো নেই? আমার কী যেনো নেই? আমার আমিই নেই।

বেশ আলো ঢুকছে তার চোখে, তার মগজে; সে তার ঘরটি দেখতে পায়। এটা আমার ঘর, আমি এখানে ঘুমোই, আমি এখানে ঘুমিয়ে ছিলাম, এখানে আমি ঘুমিয়ে থাকবো। আমাকে উঠতে হবে। হাসান ওঠার চেষ্টা করে, দেখে তার ডান হাতটি দুই উরুর মাঝখানে কী যেনো চেপে ধ'রে আছে। হাত, আমার হাত, তুমি কী চেপে ধ'রে আছো? তোমার মুঠোয় কী অপূর্ব সম্পদ? হাসান হাতটি সরিয়ে নেয়; দেখতে পায় সেখানে ফুটে আছে লাল টকটকে একটা রক্তগোলাপ। রক্তগোলাপ আমার দুই উরুর মাঝখানে? আমি কি গান গেয়ে গেয়ে ফুটিয়েছি এই গোলাপ? একটু নড়তেই রক্তগোলাপ খ'সে পড়ে; হাসানের চোখে পড়ে শূন্যতা সে একবার হেসে উঠতে চায়। ওহ্ তুমি নেই, ওহ্ তুমি নেই? তোমাকে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে দানবেরা? হো হো ক'রে হাসার চেষ্টা করে হাসান; কিন্তু সে হাসতে পারে না, তার কান্না পায়; গভীর গভীর থেকে বিপুল কান্না জলধারার মতো বেরিয়ে আসে তার চোখ দিয়ে। আমি কাঁদছি কেনো? জানি না আমি কাঁদছি কেনো। অনেক বছর আমি কাঁদি নি, এখন আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে কেনো? নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে হাসান; কান্নার থেকে আর কোনো সুখ নেই।

এখানে কী ছিলো? এখানে কে ছিলো? মনে পড়তে চায় না হাসানের, তারপরই মহাস্মৃতির মতো মনে পড়ে; যে-মহান অধীশ্বর ছিলো এখানে, যে এখন নেই, তার মুখ দেখতে পায় হাসান– তুমি নেই, আমার শিশ্ন, হে অধীশ্বর, আমার সত্তা, তুমি নিহত, তুমি শহিদ? তুমি নেই, সম্রাট, রাজাধিরাজ, মহাবীর, হে প্রতিভাবান মহাকবি, তুমি নেই; আমার গৌরব, আমার প্রেরণা, তুমি নেই, তুমি অন্যায় সমরে নিহত। দেখতে পাচ্ছি আমি তোমার রাজাধিরাজ মুখমণ্ডল; তুমি সেই ছোট্ট কুমার স্বপ্নটি ছিলে, তারপর তুমি হয়ে উঠেছিলো যে-কোনো রাজার থেকে মহিমান্বিত, তোমার মস্তকে জ্বলজ্বল

করতো সূর্য, সূর্যের মুকুট প'রে তুমি আমাকে দিয়েছো সাম্রাজ্য জয়ের আস্বাদ, তুমি নেই, সত্তা আমার। তোমার বলবান অশেষ দৃঢ়তায় কতোবার মুগ্ধ হয়েছি, তোমার সঙ্গীতে মুখর হয়েছে অরণ্য, নেচে উঠেছে অজস্র ঝরনাধারা; তোমাকে মুঠোতে নিয়ে খেলেছে আমার প্রেম, মুখগহ্বরে গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়েছে আমার সাম্রাজ্য, তুমি গভীর গভীর অনন্ত আলোতে অনন্ত অন্ধকারে প্রবেশ করেছো, মধুতে প্লাবিত করেছো বিশ্ব, আমার রাজাধিরাজ; তুমি বজ্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছো গ'লে গেছো বসন্তের বনভূমি হয়ে, তোমার স্পর্শে মুকুলিত হতো নানা তরুবর গগনে গগনে লাগতো ডালপালা। তুমি নেই, আমি কি আছি? তুমি ছিলে আমার সর্বস্বের উৎস, কবিতার জীবনের স্বপ্নের, তোমার প্রেরণায় শব্দ হয়ে উঠতো কবিতা, বেঁচে থাকা হয়ে উঠতো জীবন, জীবন হয়ে উঠতো স্বপ্ন; তোমাকে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে দানবেরা, ছিঁড়ে নিয়ে গেছে আমাকেই।

রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে? কী ক'রে বন্ধ হলো? আমার শরীরে রক্ত এতো কম? সব রক্ত কেনো প্রবল বেগে বেরিয়ে শূন্য করলো না আমার হৃৎপিণ্ডকে? হৃৎপিণ্ড, তুমি আর কেনো সঞ্চালন ক'রে চলছো রক্ত? তুমি নিঃশেষ ক'রে দাও সব রক্ত, সব রক্ত ঝ'রে পড়ুক এই ছিন্ন শিশ্নমূল দিয়ে; ভাসিয়ে দিক নগরের পর নগর রাজধানির পর রাজধানি; প্লাবিত ক'রে দিকে গ্রহনক্ষত্রমণ্ডল।

হাসান ওঠার চেষ্টা করে, উঠতে কষ্ট হয়; কিন্তু ধীরেধীরে উঠে দাঁড়ায়।

আমি কী এখন? দণ্ডিত? অপুরুষ? আমি আর পুরুষ নই? আমি নারী নই? আমি কবি? হ্যাঁ, আমি কবি, আমি কবি; কবির পুরুষ হওয়ার দরকার নেই, নারী হওয়ার দরকার নেই। কবিকে হ'তে হবে অপুরুষ: আমি অপুরুষ, আমি কবি।

কে যেনো আমার অন্তরতম ছিলো? ছিলো কেউ? হ্যাঁ, ছিলো। মেঘা? মেঘা কোথায়? সে কি এখনো ফেরে নি? বাসায় গিয়েছিলো মেঘা, শিগগির ফিরবে ব'লে, এখনো ফেরে নি? কেনো ফেরে নি? না ফিরেই পারে না। তাহলে সে কই? মেঘা ফেরে নি; টেলিফোন করেছে সে? করেছিলো? করে নি?

হাসান ডাকে, মেঘা, মেঘা, মেঘা।

মেঘা নেই; থাকলে এমন শূন্যতা থাকতো না।

মেঘাকে কি আমি টেলিফোনে পেতে পারি? কতো নম্বর? কতো নম্বর যেনো? আমার মগজে ছিলো, সেটি মুছে গেছে মনে হচ্ছে।

হাসান ফোন করতে বসে, বলে, মগজ আমাকে সাহায্য কোরো, যা মুছে গেছে তাকে আবার সোনার অক্ষরে লেখো; মগজ, তুমি শেষবারের মতো দয়া করো।

ওই দিকে ঘণ্টা বাজছে, বাজছে, বাজছে।

এক সময় একটি ম্রিয়মাণ কণ্ঠ বলে, হ্যালো।

হাসান বলে, হাসান বলছি, আমি মেঘাকে চাই।

ওইপাশে কণ্ঠ কান্নায় ভেঙে পড়ে, মেঘাদি নেই, মেঘাদি নেই, মেঘাদি নেই।

হাসান বলে, না, মেঘা আছে।

কণ্ঠ বলে, মেঘাদি নেই, আপনি আছেন?

হাসান বলে, আছি, না থাকলেই ভালো হতো।

কণ্ঠ হাহাকার ক'রে ওঠে, মেঘাদি নেই, আপনিও নেই, কেউ নেই, কেউ নেই, কেউ নেই।

স্তব্ধতা নামে মহাজগতে; হাসানের মনে হয় এই স্তব্ধতাই চেয়েছিলো সে। এই স্তব্ধতা মেঘা নেই তার স্তব্ধতা, এই স্তব্ধতা আমি নেই তার স্তব্ধতা, এই স্তব্ধতা রাজাধিরাজ নেই তার স্তব্ধতা।

এই স্তব্ধতা চেয়েছিলাম আমি?

মেঘা নেই, এতে কি সুখ পাচ্ছি আমি?

পাচ্ছি, মনে হয় পাচ্ছি।

মেঘা থাকলেই অসুখ আমাকে আক্রমণ করতো। সুখ পাচ্ছি– মেঘা নেই।

আমরা, মেঘা আর আমি, জড়িয়ে ছিলাম কার বাঁধনে? কে বেঁধে রেখেছিলো আমাদের অচ্ছেদ্য বন্ধনে? আমাদের মধুময়, অমৃতের উৎস, ঠোঁট বাঁধতে পারতো আমাদের? ঠোঁটের এতোটা শক্তি আছে? বাঁধতে পারতো আমাদের চুল, চোখ, আঙুল? চুল, চোখ, আঙুলের এতোটা প্রতিভা আছে? বাহু দিয়ে আমরা জড়িয়ে ধরেছি নিজেদের, জড়িয়ে থাকতে চেয়েছি অনন্তকাল,কিন্তু বাহু কি বাঁধতে পারতো আমাদের? বাহুর সেই শক্তি কই? প্রতিভা কই? আর হৃদয়, সেই মহান কিংবদন্তি, বাঁধতে পারতো আমাদের? যদি না থাকতো উদ্ধত অপরাজেয় অক্লান্ত রাজাধিরাজ, যদি না থাকতো প্রতিভাবান মহাকবি, তাহলে মেঘা কি এসে উঠতো এই ঘরে, তাহলে মেঘা কি ছুটে আসতো আমার ডাকে, মেঘা কি ফুটতো ফুলের মতো বইতো নদীর মতো ঝরতো বৃষ্টির মতো গলতো এঁটেল কাদার মতো? কে আমাদের গলিত সুগন্ধি কাদার ভেতরে গড়িয়েছে সূর্যের পর সূর্য চাঁদের পর চাঁদ? কে মেঘার অলিখিত শরীরে লিখতে পারতো অনির্বচনীয় কাব্য– শব্দের পর শব্দ, উপমার পর উপমা, রূপকের পর রূপক, চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্প, বাক্যের পর বাক্য? ঠোঁট আমাদের বাঁধে নি, বাহু আমাদের বাঁধে নি, মহান কিংবদন্তির পূজনীয় হৃদয় আমাদের বাঁধে নি, তাদের সেই প্রতিভা নেই; আমাদের বেঁধেছিলো অজর রাজাধিরাজ আর বিগলিত সম্রাজ্ঞী; এখন রাজাধিরাজ নেই, তাই মেঘা নেই।

মেঘা নেই, আমি সুখ পাচ্ছি।

মেঘা নেই, আমি বেঁচে উঠছি।

মেঘা নেই, আমি দণ্ডিত, আমি অপুরুষ, আমি কবি।

কিন্তু আমার থাকার কি অর্থ আছে?

আছে, আমি দণ্ডিত, আমি অপুরুষ, আমি কবি।

ফোন বেজে ওঠে, হাসান বলে, হ্যালো।

তার সহকারীটি বলে, স্যার, আজ কি আপনি অফিসে আসবেন?

হাসান বলে, না।

সহকারীটি বলে, স্যার, গতকালও ফোন করেছিলাম, ধরেন কি ব'লে মনে করেছিলাম আপনি ঢাকায় নেই।

হাসান বলে, হ্যাঁ, সম্ভবত ছিলাম না।

সহকারীটি বিস্মিত হয়, স্যার, সম্ভবত কেনো?

হাসান বলে, হ্যাঁ, সম্ভবত।

সহকারী বলে, আগামীকাল আসবেন?

হাসান বলে, আমি একটু বাইরে যাবো, কয়েক দিন আসবো না।

হাসান টেলিফোন বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে।

মেঝেতে ব'সে হাসান দুই উরু ফাঁক করে তার ছিন্ন শিশ্নমূলের দিকে তাকায়। শূন্যতা, তুমি মহাজাগতিক শূন্যতা; আমার দুই উরুর মাঝখানে শূন্য মহাজগত। শূন্য মহাশূন্যতাকে আমি ধ'রে আছি দুই উরুর মধ্যস্থলে, হাসি পায় হাসানের, আমার কি এরপরও জাগবে কাম? জাগবে? এখন কী করবো আমি? আর কাম নয়, আর প্রেম নয়; আর শরীর নয়। তাহলে কী? আধ্যাত্মিকতা? প্রভু, প্রভু? আমার মাথা নত ক'রে দাও? হো হো হেসে ওঠে হাসান। আমার অপুরুষতা কি ঢেকে রাখতে হবে আলখাল্লায়? হো হো হো হো। আচ্ছা, ওই লোকটি এতোবড়ো একটি আলখাল্লায় কেনো ঢেকেছিলেন নিজেকে? অপুরুষতা লুকিয়ে রাখার জন্যে? তাঁকেও ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিলো দানবেরা? হো হো হো হো। এর পর কী? কী এর পর? এই মহাধ্বংসের পর কী? শূন্যতা? শূন্যতা? শূন্যতা? শূন্যতা? শূন্যতা? এরপর শুধুই কবিতা। কবি আমি, দণ্ডিত, আমি অপুরুষ; কবির কোনো লিঙ্গ নেই, কবিতার লিঙ্গ নেই; কবিতা অপুরুষ, লিঙ্গহীন, অনারী, অক্লীব। হাসান ছিন্ন শিশ্নমূলের দিকে তাকিয়ে থাকে– শূন্যতা। একবার মনে হয় কে যেনো জেগে উঠছে শূন্যতার ভেতর থেকে, রাজাধিরাজ, প্রতিভাবান কবি, তার শীর্ষে জ্বলজ্বল করছে মুকুট, সিংহাসনে বসছে সে, অলিখিত অপূর্ব গ্রন্থে লিখছে কবিতা; পরমুহূর্তেই শূন্যতা। আমাকে নিয়ে এখন আমি কী করবো? কিছুই করার নেই; আমার জন্যে আর সাফল্য নেই, ব্যর্থতা নেই; আমার জন্যে কামনা নেই, নিষ্কামনা নেই। আমি কবি, অপুরুষ, আমি আছি সত্য শুধু এটুকু।

কয়েক দিন পর যখন হাসান পৃথিবীতে বেরোয় আলোর আক্রমণে সে ধর্ষিতা বালিকার মতো লজ্জা বোধ করে; তার মনে হয় পথের প্রতিটি মানুষ, ওই পেঁপেঅলা, কুষ্ঠরোগীটা, মুদিগুলো, রিকশাঅলাগুলো, হোমিওপ্যাথ ডাক্তারটা, এবং সবাই জানে তার শিশ্ন নেই; তাদের সবার আছে, এমনকি কুষ্ঠরোগীটারও একটি শিশ্ন আছে, ওর বউ ঠেলছে ওর কাঠের গাড়িটা, ওর শিশ্ন আছে ব'লেই ঠেলছে, কিন্তু তার নেই। তারা যদি সবাই খলখল ক'রে হেসে ওঠে? যদি মসজিদের মাইক্রোফোনে জানিয়ে দেয়া হয় যে আমাদের পাড়ার কবি হাসান রশিদের শিশ্ন নেই, শিশ্ন ছাড়া কাউকে আমরা আমাদের পাড়ায় থাকতে দেবো না? একটি মেয়ে কলেজে যাচ্ছে হয়তো, হাসানকে দেখে একটু হাসে; হাসানের মনে হয় মেয়েটি জানে তার শিশ্ন নেই, কুষ্ঠরোগীটার শিশ্ন আছে, তাই কুষ্ঠরোগীটার গাড়িও সে একদিন ঠেলতে পারে, কিন্তু হাসানের সাথে চাও

খেতে সে রাজি নয়। হাসান দুই উরুর মাঝখানে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা বোধ করে, শিশ্নমূল চেপে তার ব'সে পড়তে ইচ্ছে হয়; তার মনে হয় রক্তের প্রবল স্রোত বেরিয়ে আসছে তার ছিন্নমূল দিয়ে; কিন্তু সে ব'সে পড়ে না; সে একটি ইস্কুটার ডাকে।

অফিসে গিয়ে শূন্যতার মধ্যে পড়ে হাসান, তার মনে হয় অফিস হচ্ছে শূন্যতা; এই সমস্ত অ্যাড, রঙিন আবেদন, চমকপ্রদ বাক্য, উদ্দীপ্ত প্রতিযোগিতা, সবই শূন্যতা। কেউ কেউ দেখা করতে পরামর্শ করতে আসে, তার মনে হয় এককেটি শূন্যতা দেখা করছে তার সাথে, শূন্যতার সাথে দেখা করছে শূন্যতা।

না, ওরা কেউ শূন্যতা নয়; আমিই শূন্যতা; ওদের শিশ্ন আছে, কারো কারোটি হয়তো উত্তেজিত।

আমি শূন্যতা; গভীর নিরর্থকতা; অপার অশেষ তাৎপর্যহীনতা।

কারো কথা শুনতে ইচ্ছে করে না হাসানের; ভাষা যে এতো নিরর্থক ধ্বনির সমষ্টি, আগে তার মনে হয় নি, এখন মনে হচ্ছে ভাষা তারই মতো শূন্যতা।

আর এই শূন্যতাকে নিয়ে খেলা ক'রে যেতে হবে আরেক শূন্যতাকে।

শূন্যতাই সঙ্গ দেবে যতো দিন বেঁচে আছো,
শূন্যতাই পূর্ণ ক'রে রাখবে তোমাকে;
অরণ্যে সবুজ হয়ে বেড়ে উঠবে শূন্যতা, শূন্যতার
অরণ্যে তুমি ঘুরবে একাকী : প্রত্যেক নিশ্বাস
ফুসফুস ভ'রে দেবে শূন্যতায়; শূন্যতাই পড়বে তুমি
গ্রন্থে গ্রন্থে, যা কিছু লিখবে তার প্রতটি অক্ষরে
লেখা হবে শূন্যতা।

এর থেকে উৎকৃষ্ট নয় কি আত্মহত্যা?

আলাউদ্দিন রেহমান ফোন করে, দোস্ত, তোমারে খুব খুঁজতে আছিলাম, শোনলাম তুমি বাইরে গেছো।

হাসান বলে, হ্যাঁ।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, তুমি আছো মজায়, ডবকা প্রেমিকারে লইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ব্যারাইতে আছো, আমি আছি দোজখে।

হাসান জিজ্ঞেস করে, দোজখে কেনো?

আলাউদ্দিন বলে, গার্মেন্টসের একটা মাইয়ারে লইয়া শুইতাম, তুমি দ্যাখছো, মাল ভাল, এখন গোলমালে পইর‍্যা গেছি।

হাসান জিজ্ঞেস করে, গোলমাল কেনো?

আলাউদ্দিন বলে, প্যাট হইয়া গ্যাছে, এখন কইতাছে বিয়া করতে হইবো।

হাসান বলে, করো।

আলাউদ্দিন বলে, করুম ক্যামনে, একটা বউ আছে না?

হাসান বলে, ডিভোর্স করো।

আলাউদ্দিন বলে, না, না, ডিভোর্স করতে আমি পারুম না, পোলাপান আছে। বউটার লগে শুই না, তয় ডিভোর্সও করতে পারুম না।

হাসান বলে, আলাউদ্দিন, আমি চাকুরিটা ছেড়ে দিতে চাই।

আলাউদ্দিন বলে, না, দোস্ত, এইটা করবা না; তোমার লিগাই অ্যাডটা ভাল চলতাছে। তোমার ব্যাতন বারাই দিমু, পায়ে ধরতাছি তুমি আমারে ছারবা না।

হাসান বলে, আর অ্যাড ভালো লাগে না।

আলাউদ্দিন বলে, তাইলে করবা কি?

হাসান বলে, কবিতা লিখবো, কবিতা লিখেই জীবনটা কাটিয়ে দেবো।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, কবিতা লেইখ্যা কি হুইস্কি খাইতে পারবা, গাড়ি চরতে পারবা, আর ওই পদ্মফুলের মতন সুন্দরীটারে পালতে পারবা?

হাসান বলে, এর কিছুই আমার লাগবে না।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, মনে হইতাছে তুমি আমার থিকাও গোলমালে আছো, চাকরি ছারার তোমার দরকার নাই।

হাসান বলে, ভেবে দেখি।

আলাউদ্দিন বলে, দোস্ত, অফিসে থাইক্যো, সন্ধ্যার পর আসতাছি। অনেক দিন এক লগে ড্রিংক করি নাই।

সন্ধ্যার পর আলাউদ্দিন আসে; তাকে দেখেই চিৎকার ক'রে ওঠে, দোস্ত, হইছে কি তোমার, শুখাই গ্যাছো।

হাসান বলে, বেশ তো আছি।

আলাউদ্দিন প্রচুর খাচ্ছে আর পান করছে, আর কথা বলছে; হাসানের সবই নিরর্থক মনে হয়। প্যাট, বউ, পোলাপান, ডিভোর্স, সমাজ, এমআর মানসম্মান, শোয়া প্রভৃতি শব্দ, যা আলাউদ্দিন উচ্চারণ ক'রে চলছে অনবরত, এবং সেগুলোকে জড়িয়ে দিচ্ছে যে-সব শব্দের সাথে, তার কোনোটিকেই অর্থপূর্ণ মনে হয় না হাসানের; সে শুধু মনে মনে বলতে থাকে– নিরর্থক, সবই তাৎপর্যহীন, এসব আমার কাছে কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। নিরর্থকতা মানুষ কতোক্ষণ সহ্য করতে পারে? যে-মেয়েটি ওই দিকে দাঁড়িয়ে আছে, সে নিরর্থক; যে-পানপাত্র ঝলমল করছে তার সামনে, সেটি নিরর্থক; ওইদিকে সারিসারি খাবার, নিরর্থক। কতোক্ষণ আমি সহ্য করতে পারি এই নিরর্থকতা? নিরর্থকতা আমাকে আক্রমণ ক'রে চলছে চারদিক থেকে, এই পানপাত্র আক্রমণ করছে আমাকে, খাদ্যরাশি আক্রমণ করছে আমাকে, এইসব মানুষেরা আক্রমণ করছে আমাকে; আমাকে মুক্তি পেতে হবে এর থেকে। হাসান টয়লেটে যাবে ব'লে বেরোয়, বেরিয়ে বারান্দার দিকে যায়; একটি লিফ্‌ট্‌ ওপরে উঠবে ব'লে হা ক'রে অপেক্ষা করছে, হাসান লিফ্‌টে উঠে পড়ে। উচ্চতম তলায় এসে লিফ্‌ট্‌ থেকে সে নামে; বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে ছাদে ওঠার সিঁড়িটি দেখতে পায়, ধীরে ধীরে সে ছাদে ওঠে। ছাদে উঠে চারদিকে আলোকিত নিরর্থকতা দেখে সে অনুপ্রাণিত বোধ করে;–

এটাই শ্রেষ্ঠ সময়, আমি নিরর্থকতা থেকে মুক্তি পেতে পারি শুধু ছাদ থেকে লাফ দিয়ে। মেঘা, মেঘা, আমার আত্মা; শিশ্ন, শিশ্ন, আমার সম্রাট।

লাফ দিতে গিয়ে হাসান নিজেকে টেনে ধরে।

আমি কবি, আমি দণ্ডিত, আমি অপুরুষ। লাফ দেয়া কোনো সমাধান নয়।

আমাকে বইতে হবে মানুষের সমস্ত দুর্ভাগ্য।

হাসান বলে, মেঘা, আমি নামছি।

টেবিলে গিয়ে দেখে আলাউদ্দিন কাৎ হয়ে আছে, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আলাউদ্দিনও হয়তো আক্রান্ত হয়েছে কোনো নিরর্থকতা দিয়ে।

মধ্যরাতে হাসান নিজের ঘরে ফিরে মেঘার দেয়া ডায়রির প্রথম পাতায় লিখতে থাকে একচল্লিশ, অপুরুষ, দণ্ডিত, কবি; কবিতা ছাড়া আর কিছু নেই; যা কিছু লিখেছি আর আমি কখনো খুলে দেখবো না, সেগুলো নিশ্চয়ই তুচ্ছ, জরাগ্রস্ত, যতো দিন আছি লিখতে চেষ্টা করবো অজর কবিতা, হয়তো দশটি কি বিশটির বেশি লিখতে পারবো না, অজস্র জরাগ্রস্ত কবিতা নয় দশটি কি বিশটি অজর কবিতা। কবিতা ছাড়া আর কারো সাথে সম্পর্ক নয়; অপুরুষের একটিই সম্পর্ক সকলের সাথে– সম্পর্কহীনতা; থাকতে হবে সম্পর্কহীনতার সম্পর্কে, কামনাহীন কামনায়, বিমানবিক মানবিকতায়; দেয়াল থাকবে চারদিকে, দেয়াল ভেদ ক'রে ঢুকবে না কোনো কাতরতা কোনো মানুষ। লিখতে লিখতে, আশ্চর্য, একরাশ পংক্তি, একরাশ চিত্রকল্প জড়ো হ'তে থাকে তার মাথার ভেতরে, জমাট হয় রক্তের মতো; পংক্তিগুলোকে চিত্রগুলোকে হাসান ছন্দে দুলিয়ে দেয়, একটি কবিতা তার সামনে পুকুরে রক্তপদ্মের মতো স্থির হয়ে ভাসতে থাকে।

চারটি বছর কেটে যায় : কবিতায়, নিঃসঙ্গতায়, সম্পর্কহীনতায়।

এই যে আমি আছি একলা, সাড়া দিচ্ছি না কারো ডাকে, ডাকছি না কাউকে, ফিরিয়ে দিচ্ছি সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে, বই দিয়ে ঘিরে ফেলছি আমাকে– একেই কি বলে ধ্যান? হো হো হো হো হাসে হাসান। ধ্যান কাকে বলে? এটা ধ্যান নয়, এটা হচ্ছে বিশ্বকে নিজের ভেতরে ছোট্ট সোনার বলের মতো সংহত করা; কবিতায় আমি তাই করছি, করতে চাই। আমি গৃহীত হচ্ছি? আমার কবিতা আকৃষ্ট করছে অনুরাগীদের? পুরস্কার পুরস্কার পাচ্ছি? সবই তুচ্ছ, নিরর্থক; কিছুই মূল্যবান নয়।

কিছু কিছু তরুণ কবি মাঝেমাঝে দেখা করতে আসে।

বলে, আপনাকে দেখতে এলাম।

হাসান বলে, কেনো?

তারা বলে, আপনি আমাদের প্রিয় কবি, আপনার কবিতা অন্য রকম, আমাদের নাড়া দিচ্ছে, আপনাকে দেখতে ইচ্ছে হলো, তাই এলাম।

হাসান বলে, প্রিয় কবিকে যারা দেখতে আসে, তারা কখনো কবি হবে না।

তারা বলে, আমরা কবি হবো না?

হাসান বলে, না।

তারা বলে, কামর আবদিন ভাইয়ের কাছে গেলে তিনি খুব খুশি হন, আমাদের চাবিস্কুট খাওয়ান, বলেন, আপনারা আবার আসবেন।

হাসান বলে, আমি ভাই নই।

তারা বলে, কামরভাই তো ভাই বললে খুশি হন, তিনি বয়সে আপনার থেকেও বড়ো।

হাসান বলে, তার নামে আপনারা জয়ধ্বনি দিয়ে ধন্য হ'তে থাকুন।

তারা বলে, তিনি তাঁর কবিতার বই উপহার দেন আমাদের, তাঁর কবিতা সম্পর্কে লিখতে বলেন; কি চমৎকার মানুষ তিনি।

হাসান বলে, গৌণ কবিদের এসব করতেই হয়; আর চমৎকার কেনো, আমি তো মানুষই নই।

তারা বলে, আপনি বিস্ময়কর।

তরুণরা আর আসে না। কষ্ট লাগে হাসানের তরুণদের ও নিজের জন্যে; একটি গভীর চিৎকার সে অশ্রুর মতো বুকের ভেতরে জমিয়ে রাখে। তরুণদের তবু সহ্য হয়, ঘেন্না হয় ওই বুড়োগুলোকে। তারা আসে না, ফোন করে; হাসান ফোন রেখে দেয়, তারা আর ফোন করে না; হাসান সুখী বোধ করে।

আর আছে নারীরা, তরুণীরা।

এক নারী, ঘন নিবিড়, তার সাথে দেখা করতে আসে, বলে, আপনাকে দেখতে চ'লে এলাম, আপনার কবিতা এতো ভালো লাগে, আমার প্রিয়কবি আপনি।

হাসান তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অ্যাড সংশোধন করতে থাকে।

নারী বলে, আমার দিকে আপনার তাকাতে ইচ্ছে করছে না?

হাসান বলে, না।

নারী বলে, আমি কি এতোই অসুন্দর?

হাসান বলে, আসার কোনো দরকার ছিলো না।

নারী স্তম্ভিত হয়ে বলে, শুনেছি কবিরা অনুরাগিণী পছন্দ করেন, রবীন্দ্রনাথ করতেন।

হাসান বলে, আমি করি না।

নারী বলে, আপনি বেশ অভদ্র মনে হচ্ছে।

হাসান বলে, বেশ নয়, অতিশয়; আমার কবিতাও অভদ্র।

নারী বলে, আমি আপনার কবিতায় মুগ্ধ, আপনার অনুরাগিণী; আপনার কবিতা আপনার মতো অভদ্র নয়।

হাসান বলে, আপনি সম্ভবত কামঅতৃপ্ত।

নারী চমকে ওঠে, বলে, আপনি কী ক'রে বুঝলেন?

হাসান বলে, অনুরাগ জন্মে কামঅতৃপ্তি থেকে।

নারী বলে, হ্যাঁ, আমি অতৃপ্ত।

হাসান বলে, আমি পরিতৃপ্ত করতে পারবো না; দয়া ক'রে আপনি যান।

নারী বলে, আপনাকে দেহ দিতে আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম, কিন্তু এখন আমি শুয়োরকেও দেহ দিতে পারি, আপনাকে না।

হাসান বলে, আমি শুয়োরেরও অধম।

ঘরে ফিরে এসে হাসান সারারাত ক্ষমা চাইতে থাকে ঘন নিবিড় নারীর কাছে; তার প্রতিটি অঙ্গের কাছে। আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও নারী, ক্ষমা চাই আমি; তোমার যে স্তন আছে, ঠোঁট আছে, আছে এক অবর্ণনীয় স্বর্ণখনি, তাই ক্রুদ্ধ করেছে আমাকে; ওসব অপূর্ব হীরকখণ্ড আমার জন্যে নয়। স্তন, আমাকে ক্ষমা কোরো; ঠোঁট, আমাকে ক্ষমা কোরো; সোনার খনি, ক্ষমা কোরো আমাকে। কিন্তু এখনো নারী আছে কেনো? আমি চাই নারী না থাকুক পৃথিবীতে। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো, নারী, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই;– শুয়োরও তোমাকে সুখী করতে পারে; আমি, কবি, পারি না।

দু-তিনটি পুরস্কার পেয়েছে এর মাঝে হাসান, পথে পথে আজকাল পুরস্কার ছড়িয়ে পড়ছে, না চাইলেও পাখির মলের মতো মাথায় জামায় এসে পড়ে। না, না, না, ক'রে ক্লান্ত হয়ে শেষে সে একটি নিতে সম্মত হয়, এবং পুরস্কার নিতে যায়।

তার ভাষণে সে বলে, এসব পুরস্কার নিরর্থক, গৌণ কবিদেরই পুরস্কার প্রাপ্য, তাঁদের পুরস্কার দরকার, এসব পুরস্কার সারাক্ষণ বলে তুমি যে কবিতা লিখতে ব্যর্থ হয়েছো তার সান্ত্বনা হিশেবে পাচ্ছো পুরস্কার। তোমার কবিতা হয় নি, পুরস্কারও যদি না পাও, তাহলে তুমি বাঁচবে কী নিয়ে? আজ পুরস্কার নিয়ে বুঝতে পারছি আজো আমি গৌণ কবিই রয়ে গেছি।

চারদিকে একটা হাহাকার ওঠে, সে শুনতে পায়।

প্রশ্নোত্তরপর্বে একজন জিজ্ঞেস করে, আপনি কবি কামর আবদিনের মতো জনগণের কথা বলেন না কেনো?

হাসান বলে, ভেতরে কবিতা না থাকলে জনগণের কথাই বেশি বলতে হয়, জনগণ সাধারণত নির্বোধ, রাজনীতিবিদেরা তাদের প্রতারণা করে, এ-কবিরাও প্রতারণা করে তাদের; জনগণের কথা বলা কবিতা নয়, কবিতা হচ্ছে কবিতা।

আরেকজন প্রশ্ন করে, আপনি কি মানুষকে ভালোবাসেন?

হাসান দ্বিধাহীনভাবে বলে, না।

সে জিজ্ঞেস করে, ঘৃণা করেন?

হাসান দ্বিধাহীনভাবে বলে, হ্যাঁ।

আরেকজন জিজ্ঞেস করে, আপনি নারী ভালোবাসেন?

হাসান দ্বিধাহীনভাবে বলে, না।

একজন প্রশ্ন করে, তাহলে আপনি কবিতা লেখেন কেনো?

হাসান বলে, নিরর্থকতাকে তাৎপর্যপূর্ণ করার এটা আমার ব্যর্থ চেষ্টা।

একজন প্রশ্ন করে, মনে হচ্ছে আপনি রেগে আছেন, কিন্তু আপনার কবিতা তো এমন রাগের কবিতা নয়, তা তো গভীর যন্ত্রণার।

হাসান চুপ ক'রে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে– দীর্ঘ সময় ধ'রে, নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে চারদিক; তার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে মাটির ভেতর দিয়ে প্রবল রোদনের স্রোত বয়ে আসছে, ঢুকছে তার ভেতরে; তার চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে।

সে শুধু বলে, আমি আর কথা বলতে চাই না, আমার কোনো কথা নেই।

হাসান মাইক্রোফোন থেকে আর তার আসনে ফিরে যায় না।

সে মঞ্চ থেকে নামে, চারদিকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, তাকে ঘিরে অনুরাগীরা দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, স্বাক্ষরের জন্যে খাতা বাড়িয়ে ধরে; সে এই সব পেরিয়ে রাস্তায় এসে পৌছে, অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকে।

রাতে ঘরে ফিরে এসে হাসান মেঝের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে। হাসান, নিজের সাথে কথা বলতে থাকে সে, তুমি কেনো এতো ঘৃণা করছো নিজেকে, এবং ঘৃণায় ঢেকে ফেলছো গাছপালা মেঘ সমুদ্র মাটি শিশির পাখি পুষ্প মানুষ? শুধু সম্পর্ক পাতাতে পারছো না ব'লে, শুধু তোমার শরীরটিকে ব্যবহার ক'রে সুখ সৃষ্টি করতে পারছো না ব'লে? হ্যাঁ, তাই, হ্যাঁ, তাই; মানুষ আমাকে ছিন্ন করেছে, প্রকৃতি যদি অন্ধ বধির বিকলাঙ্গ বৃক্কহীন ভগ্নহৃৎপিণ্ড অপুরুষ করতো আমাকে মেনে নিতাম; কিন্তু মানুষ, হিংস্র মানুষ আমাকে ছিন্ন করেছে, ভয়াবহ মানুষ ছিন্ন করেছে আমাকে মানুষের সাথে সম্পর্ক থেকেই, তাকে ঘৃণা ক'রে যেতে হবে ঘৃণা ক'রে যেতে হবে। প্রেমে নয়, ঘৃণায়ই বেঁচে থাকতে হবে; সুখে নয় বাঁচতে হবে অনন্ত যন্ত্রণায়। শিল্পকলা আর সুখ নয় আমার জন্যে, শিল্পকলা এক অপার যন্ত্রণা, কিন্তু তাকে নিয়ে আমি বাঁচবো। শিল্পকলা যার দয়িতা, সে কবে সুখ পেয়েছে? আমিও পাবো না; কিন্তু থাকতে হবে সৃষ্টিশীল। হাসান তার ছিন্ন শিশ্নমূলের দিকে তাকায়, হো হো হাসে, বলে, আমি ভেবেছিলাম তুমিই শিল্পের সম্রাট, তোমার থেকেই উৎসারিত হয় কবিতা; কিন্তু তোমাকে ছাড়াও আমি লিখছি কবিতা। হো হো হো, প্রিয়, তোমাকে ছাড়াই যদি পারি, তাহলে কেনো পারবো না ওই হিংস্র মানুষ ছাড়া?

কয়েক সপ্তাহ ধ'রে খুবই যন্ত্রণা দিচ্ছে বালিকাটি।

প্রথম দিনই হাসান বালিকাটিকে বলেছে, তুমি আর এসো না।

আঠারো বছরের ওই তীব্র সৌন্দর্য বলেছে, আমি আসবো।

হাসান বলেছে, জানো, আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ? তোমার পিতার সমান।

বালিকা বলেছে, কবিদের কোনো বয়স নেই।

হাসান বলেছে, আমি কবিগুরু নই যে আমার বয়স নেই, আমার বয়স আছে। তুমি আসবে না, তোমাকে আমি পছন্দ করি না।

সৌন্দর্য বলেছে, আমি আসবো, আপনাকে আমি পছন্দ করি।

বালিকা আসছে, দিনের পর দিন, হাসান তাকে তাড়িয়ে দিতে পারছে না।

আমি কি সত্যিই চাই বালিকা না আসুক? তাহলে আমি ওকে বাসার টেলিফোন

নম্বরটিও কেনো দিলাম? যদি সত্যিই ওকে এড়াতে চাই, ও এলে ধমক দিয়ে কেনো বিদায় করি না, এটা তো আমি পারি, অভদ্র তো আমি হ'তে পারি অবলীলায়, কিন্তু কেনো পারি না; আর বাসায় ফিরে কেনো টেলিফোনের অসহ্য অমৃত ঝংকারের জন্যে ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত নিশ্বাসার্ত হয়ে থাকি? ওকে দেখলে কি ভেতরে কোনো গভীর স্মৃতি যন্ত্রণা হয়ে দেখা দেয়, ওর মুখে কি দেখতে পাই আমি অন্য কোনো মুখ? ওর ওই বস্ত্রের ভেতরে কি আছে আমার চেনা এক অনির্বচনীয় অবিনশ্বর শরীর? কিন্তু না, ওকে বিদায় ক'রে দিতেই হবে; ওকে দেখে আমি সুখ পেতে চাই না।

বিকেলে অফিসে আসে ইয়াসমিন; দিগদিগন্তে, পশুকবলিত বাঙলার আকাশে আকাশে রঙ আলো সোনালি মেঘ ছড়িয়ে পড়ে।

হাসান শুরুতেই বলে, তোমাকে বলেছি তুমি আসবে না।

ইয়াসমিন বলে, সে তো পুরোনো কথা, নতুন কিছু বলুন।

হাসান বলে, তুমি জানো না কি ভয়ঙ্কর বিপদ তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে, তুমি জানো না বালিকা।

ইয়াসমিন বলে, আত্মহত্যা করতে হবে আমাকে?

হাসান বলে, তার থেকেও ভয়াবহ।

ইয়াসমিন বলে, সেটা হবে খুব সুন্দর।

হাসান বলে, সুন্দর দেখে দেখে তুমি অসুন্দর কাকে বলে জানো না।

ইয়াসমিন বলে, আপনার সাথে আমার কোনো নদীর পারে বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে।

হাসান বলে, আমি নদী চিনি না।

ইয়াসমিন বলে, তাহলে চলুন আমি চিনিয়ে দেবো।

হাসান বলে, নদী আমি চিনতে চাই না।

ইয়াসমিন তার একগুচ্ছ সোনার আঙুল হাসানের দিকে বাড়িয়ে বলে, এগুলো একবার ছুঁয়ে দেখবেন? দেখুন তো এগুলো নদী কি না?

সোনার আঙুল ছোঁয়ার সুখ তার জন্যে নয়, তার জন্যে তীব্র বিষ; হাসান উঠে টয়লেটে গিয়ে ব'সে থাকে, কমোডের ভেতরে তার লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

বেরিয়ে বলে, তুমি যাও, তুমি আর আসবে না।

ইয়াসমিন আবার সোনার ঝিলিকগুলো তার দিকে ছড়িয়ে দেয়, বলে, ছুঁয়ে দেখুন, নদী ছুঁয়ে দেখুন।

হাসান বলে, নদী আমার জন্যে নয়। তুমি যাও।

কিন্তু ইয়াসমিন আসে, এবং টেলিফোন করে; হাসান সুখ পায়, এবং গভীরতম নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণা বোধ করে; না এলে বোধ করে অতল শূন্যতা, এলে তার ভেতর দাঁত বসায় যন্ত্রণা; টেলিফোন করলে নেকড়ে তার হৃৎপিণ্ড কামড়ে ছিড়ে নেয়, না করলে শূন্যতার শীতল তুষারপাতে সে লুপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু না; বিদায় ক'রে দিতে হবে ইয়াসমিনকে।

সেদিন সে বাসায় ফেরে অনেক রাতে; ফিরেই শোনে টেলিফোন বাজছে। না, না, ধরবো না, হাসান কিছুক্ষণ ব'সে থাকে; তারপর ধরে।

ইয়াসমিন বলে, পৃথিবীর সব কাজ শেষ ক'রে অবশেষে ফিরলেন?

হাসান বলে, ফেরার ইচ্ছে ছিলো না।

ইয়াসমিন বলে, জানতেন আমি ফোন করবো, তবু দেরিতে ফিরলেন কেনো?

হাসান বলে, আমি কোনো শেকলে বাঁধা নই।

ইয়াসমিন বলে, আপনি এক গভীর অন্ধকার গর্তে প'ড়ে আছেন।

হাসান বলে, হ্যাঁ।

ইয়াসমিন বলে, আপনাকে আমি উদ্ধার করবো।

হাসান ব'লে ফেলে, কী দিয়ে?

ইয়াসমিন বলে, আমার হৃদয়, আমার প্রেম।

হাসান বলে, না, না, না।

হাসান টেলিফোন রেখে দেয়, টেলিফোন বাজতে থাকে অনন্ত যন্ত্রণার মতো।

হাসানের আর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না, সে বেরিয়ে পড়ে। রাতটা কাটিয়ে দেবো আমি অন্ধ আতুর কুষ্ঠরোগী চোর পকেটমার বেশ্যা হিজড়ে সমস্ত দণ্ডিতদের সাথে, আমিও দণ্ডিত, আমিও তো হিজড়ে, কুষ্ঠরোগীদের থেকেও ঘৃণ্য, অন্ধের থেকেও পতিত; হাসান হাঁটতে থাকে। পথের পাশে একবার বসে সে, ওই দিকে জটলা করছে অন্ধ আতুররা, তাদের পাশে গিয়ে বসবো, ঘুমিয়ে পড়বো? আমি তো কবি, অপুরুষ, সকলের সঙ্গী; ওদের সাথেই আমার সম্পর্ক, ওরাই আমার আত্মীয়, এই নরকবাসীরাই আমার বান্ধব। একবার সে ইটওঠা ময়লালাগা ফুটপাতে শুয়ে পড়ে; তার কষ্ট হয়, সে উঠে হাঁটতে থাকে, সারারাত হাঁটে। ভোরে তার ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হয়; ফিরেই শোনে ঝনঝন ক'রে বাজছে ইয়াসমিন।

ইয়াসমিন বলে, আজ উঠেই আপনাকে শুনতে ইচ্ছে হলো।

হাসান বলে, আমাকে শোনার কিছু নেই।

ইয়াসমিন বলে, আপনার স্বর থেকে মধু ঝরে, আমি পান করি।

হাসান বলে, তুমি বিষকে মধু মনে করো।

ইয়াসমিন বলে, বিষই আমার কাছে মধু।

হাসান বলে, তুমি আর ফোন করবে না।

ইয়াসমিন বলে, আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করছে, এখনি, এই ভোরবেলা।

হাসান বলে, তুমি বিকেলে আমার বাসায় এসো।

ইয়াসমিন উল্লাসে ফেটে পড়ে, বাসায় আসবো আমি? কখন? ঠিকানা কি?

হাসান ঠিকানা দেয়; কীভাবে আসতে হবে, কোন দোকানের উল্টো দিকে নামতে হবে, ক-তলায় উঠতে হবে, সব বর্ণনা করে বিস্তৃতভাবে।

বিকেলে চারপাশের সমস্ত আবর্জনাকে সোনায় পরিণত ক'রে ইয়াসমিন আসে।

ঘরে ঢুকেই ইয়াসমিন বলে, কী যে সুন্দর ঘর!

হাসান বলে, এ-ঘরটা আসলে ওই দূরের আবর্জনাস্তূপের থেকেও নোংরা; এ-নোংরায় তুমি আর কোনোদিন পা ফেলতে চাইবে না।

ইয়াসমিন বলে, চিরকাল আমি এই ঘরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে পারবো।

হাসান বলে, ইয়াসমিন, তোমার মুখ দেখে আমার কষ্ট হয়, তুমি যাও।

ইয়াসমিন বলে, আমি যাবো না, আমি থাকবো।

হাসান বলে, তুমি জানো না তুমি কোন নরকে এসেছো, ইয়াসমিন।

ইয়াসমিন বলে, আমি আপনাকে ভালোবাসি।

হাসান বলে, না, আমি ভালোবাসা চাই না।

ইয়াসমিন বলে, আমি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, আপনি আমার হাত ধরুন। আপনাকে আমি ভালোবাসি।

হাসান বলে, আমি কারো হাত ধরতে পারি না।

ইয়াসমিন বলে, আমার ঠোঁট দেখুন, সুন্দর, আপনি আমাকে চুমো খান। আপনাকে আমি ভালোবাসি।

হাসান বলে, আমি কাউকে চুমো খেতে পারি না।

ইয়াসমিন দাঁড়িয়ে বলে, আমার শরীরটি দেখুন, সুন্দর, আপনি আমাকে জড়িয়ে ধরুন। আপনাকে আমি ভালোবাসি।

হাসান বলে, আমি কাউকে জড়িয়ে ধরতে পারি না।

ইয়াসমিন চিৎকার ক'রে ওঠে, কেনো নয়, কেনো নয়?

হাসান দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে জিন্সের বেল্ট খোলে, বোতাম খোলে, জিপার খোলে, এবং জিন্সটি খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে বলে, দ্যাখো।

ইয়াসমিন হাসানের দুই উরুর মধ্যস্থলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে, না, না, না, এমন হ'তে পারে না, এমন হ'তে পারে না।

সে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

হাসান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেনো চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে।

হুমায়ুন আজাদ বাঙলাদেশের প্রধান প্রথাবিরোধী ও বহুমাত্রিক লেখক; তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমালোচক, যাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল। জন্ম ১৪ বৈশাখ ১৩৫৪ : ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭ বিক্রমপুরের রাড়িখালে। ডক্টর হুমায়ুন আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ও প্রাক্তন সভাপতি। তাঁর বইগুলোর মধ্যে রয়েছে– কবিতা : ১৯৭৩ অলৌকিক ইস্টিমার ১৯৮০ জ্বলো চিতাবাঘ ১৯৮৫ সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে ১৯৮৭ যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল ১৯৯০ আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে ১৯৯৩ হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৯৪ আধুনিক বাঙলা কবিতা ১৯৯৮ কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু ১৯৯৮ কাব্যসংগ্রহ কথাসাহিত্য: ১৯৯৪ ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল ১৯৯৫ সব কিছু ভেঙে পড়ে ১৯৯৬ মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ ১৯৯৬ যাদুকরের মৃত্যু ১৯৯৭ শুভব্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার ১৯৯৮ রাজনীতিবিদগণ ১৯৯৯ কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ ২০০০ নিজের সঙ্গে নিজের জীবনের মধু ২০০১ ফালি ফালি ক'রে কাটা চাঁদ ২০০১ উপন্যাসসংগ্রহ ১ ২০০২ শ্রাবণের বৃষ্টিতে রক্তজবা ২০০২ উপন্যাসসংগ্রহ ২ সমালোচনা : ১৯৭৩ রবীন্দ্রপ্রবন্ধ/ রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা ১৯৮৩ শামসুর রাহমান/ নিঃসঙ্গ শেরপা ১৯৮৮ শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ ১৯৯০ ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি ১৯৯২ নারী (নিষিদ্ধ ১৯ নভেম্বর ১৯৯৫ : মুক্ত ৭ মার্চ ২০০০) ১৯৯২ প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে ১৯৯২ নিবিড় নীলিমা ১৯৯২ মাতাল তরণী ১৯৯২ নরকে অনন্ত ঋতু ১৯৯২ জলপাইরঙের অন্ধকার ১৯৯৩ সীমাবদ্ধতার সূত্র ১৯৯৩ আধার ও আধেয় ১৯৯৭ আমার অবিশ্বাস ১৯৯৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা ১৯৯৯ নির্বাচিত প্রবন্ধ ২০০০ মহাবিশ্ব ২০০১ দ্বিতীয় লিঙ্গ (অনুবাদ, মূল : সিমোন দ্য বোভোয়ার) ভাষাবিজ্ঞান : ১৯৮৩ *Pronominalization in Bengali* ১৯৮৩ বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র ১৯৮৪ বাক্যতত্ত্ব ১৯৮৪ বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড) ১৯৮৫ বাঙলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৯৮৮ তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ১৯৯৯ অর্থবিজ্ঞান কিশোরসাহিত্য : ১৯৭৬ লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী ১৯৮৫ ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না ১৯৮৭ কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী ১৯৮৯ আব্বুকে মনে পড়ে ১৯৯৩ বুকপকেটে জোনাকিপোকা ১৯৯৬ আমাদের শহরে একদল দেবদূত অন্যান্য ১৯৯২ হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ ১৯৯৪ সাক্ষাৎকার ১৯৯৫ আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন ১৯৯৭ বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময় ১৯৯৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা।